শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

LIBRARY 3/329
No. ...
BANARAS

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৫৫ সাল।

PRESENTED

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায় ও স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত এবং শ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত, দিন ও তারিখ সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও ঘটনাদি আছে।

শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত।

মূল্য ২॥০ টাকা।

PRESENTED
LIBRARY 3/329
No. 7/222
BANARAS

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র
পূজ্যপাদ শ্রীরামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায় ও
স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত
দিন ও তারিখ সহ ঠাকুরের কথা ও ঘটনাদি ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত।

মহেশ লাইব্রেরী ঃ
পুস্তক-বিক্রেতা ।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ-স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।
২৪শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার,
দ্বিতীয়া, ১৩৫৫ সাল।

মূল্য ২॥০ টাকা।

All rights reserved.

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়। পোঃ আলমবাজার, ২৪ পরগণা।
দক্ষিণেশ্বর। মন্দির অথবা
ঠাকুরের ঘরে খোঁজ লউন।

শ্রীগুরুদাস লাইব্রেরী, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র।
৬৯, কাঁসারিপাড়া রোড,
পোঃ ভবানীপুর কলিকাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে-সমাধি

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৫ সাল।

মূল্য ৩৲ টাকা।

উক্ত পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সমস্ত গান, দিন, তারিখ, স্থান দিয়া এবং গানের মধ্যে ঠাকুর কোন কথাগুলি বলিয়াছিলেন তা দেওয়া আছে। ৩৮টী গানের স্বরলিপি করিয়া দেওয়া আছে। পরিশিষ্ট ঠাকুরের গাওয়া গানের এবং স্বামীজির রচিত গান, স্তোত্র, রামনাম ১০৮, স্বরলিপি সহ আছে।

উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীকানাইলাল দে
বি, জি, প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRESENTED
LIBRARY 3/329
No. 8/EEE
Shri Shri ... Kashi ...
BANARAS

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালা ১৩২৪, ইংরাজি ১৯১৭ সাল হইতে শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র (ওরফে বুনি), পূজ্যপাদ শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র), শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার), শ্রীমহাপুরুষজী (স্বামী শিবনন্দ মহারাজ), শ্রীরাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), এবং বেলুড় মঠে ও উদ্বোধনে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গগণের নিকট যাতায়াত করিতেন।

তারপর, উঁহাদের নিকট যে সমস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গান এবং লেখকের সহিত যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইত সেই গুলি লেখক নোট বইতে দিন ও তারিখ দিয়া লিখিয়া রাখিতেন।

পরে লেখক দেখিলেন, যে সমস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গান শ্রীরামলালদাদার নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেই গুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ অপ্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। যদ্যপি ইহা প্রকাশ করা যায় ত বহু ভক্তগণ পাঠে আনন্দ লাভ করিতে পারেন। এই মানসে, লেখক শ্রীরামলাল-দাদা ও শ্রীমহাপুরুষজীর নিকট পুস্তকাকারে বাহির করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট আদেশ ও অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশ পাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল।

শ্রীযুত রামলালদাদা, শ্রীমহাপুরুষজী, শ্রীম, ও শ্রীরাখাল মহারাজ ইঁহাদের সহিত যে সমস্ত কথা হইয়াছিল তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের নাম হইল **"শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ।"**

শ্রীশ্রীঠাকুর গানগুলি যেরূপ সুরে ও ভাবের সহিত গাহিতেন সেই রূপ সুর শ্রীরামলালদাদার নিকট হইতে বহুবার শুনিয়া গানগুলির স্বরলিপি করিয়া দেওয়া হইল এবং **"শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি"** নামক দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গান গুলির স্বরলিপি করিয়া প্রকাশ করিবার লেখকের ইচ্ছা রহিল।

পুস্তকের আয় হইতে কতক শ্রীশ্রীঠাকুরের ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যয় হইবে।

যদ্যপি এই পুস্তক ভক্ত লোকের কাহারও আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকাশক নিজকে ধন্য ও তাহার পরিশ্রম সফল মনে করিবেন।

বিনীত

শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র।

প্রথম সংস্করণ।

৺দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আলমবাজার ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রী৺ সরস্বতী পূজা
শ্রীপঞ্চমী, সোমবার
১৩৩৯ সাল।

All Rights Reserved.

PRESENTED
LIBRARY 3/329
No... ... 7/222
Sri Shri ... Ashram
BANARAS

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান লেখক শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র (ওরফে বুনি), বাঙলা ১৩২৪ সাল ইংরাজি ১২—৬—১৯১৭ হইতে শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (শ্রীম- মাষ্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার), ইহার নিকট ও স্বামীজিদের বাড়ী নং ৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট যাইয়া, স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত (লেখকের মামার বাড়ীর তরফ হইতে স্বামীজিদের সহিত আত্মীয়তা আছে, কিন্তু লেখক মহিম মহারাজ বলিয়া তাঁকে উল্লেখ করিয়াছেন), ইহার নিকট প্রত্যহ কখন মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহাদের দর্শনাদি করিতেন।

তারপর বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর ভবনে, উদ্বোধনে, বেলুড় মঠে, দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীরামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায়, শিবুদাদা (রামলাল দাদার মধ্যম ভ্রাতা), লক্ষ্মীদিদি (রামলালদাদার ভগ্নী), ইহাদের নিকট ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গগণের নিকট মধ্যে মধ্যে যাইয়া দর্শনাদি করিয়া আসিতেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরণ, রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গোলাপ মা, যোগীন মা, গৌরী মা, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ), কালি মহারাজ স্বামী অভেদানন্দ), খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ), তুলসী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানন্দ মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতিকে লেখক দর্শনাদি করিয়াছেন।

লেখকের সহিত রামলালদাদার, মহাপুরুষজী, রাখাল মহারাজ ও মাষ্টার মহাশয়ের সহিত যে সমস্ত ঠাকুরের কথা কি গান, ঘটনাদি হইত সেই গুলি লেখক নোট বইতে দিন ও তারিখ দিয়া

লিখিয়া রাখিতেন। পরে, দেখা গেল ভাল ভাল ঠাকুরেব কথা ও গান রামলালদাদার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। যে সমস্ত ঠাকুরের কথা ও গান শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মধ্যে নাই অথচ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যদ্যপি ঐ গুলি প্রকাশিত করিয়া বাহির করা হয় ত বহু ভক্তগণ, তৎ পাঠে আনন্দিত হইবেন। এই মানসে, লেখক রামলালদাদা ও মহাপুরুষজীর নিকট পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য অনুমতি বা আদেশ চান। যখন তাঁহারা আদেশ দিয়া পত্রে জানান তখন লেখক তাড়াতাড়ি করিয়া একাই প্রেসের প্রুফ দেখিয়া পুস্তক ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পরেও, লেখকের নোট বই‌তে আরও রামলালদাদা ও মাষ্টার মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে যে সব ঠাকুর ও স্বামীজির কথা, গান গুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মহিম মহারাজের নিকট যে সব ঠাকুর ও স্বামীজির কথা ও ঘটনাদি শুনিয়াছিলেন ও দেখিয়াছিলেন সেই গুলি কিছু দিন ও তারিখ দিয়া এইবার দ্বিতীয় সংস্করণে শুধু কথা গুলি 'সংযোগ' করিয়া প্রকাশিত করা হইল।

মহিমমহারাজ যখন ঠাকুর স্বামীজির কোন কথা বা ঘটনাদি বলিতেন, তখন প্রায়ই লেখককে বলিতেন, 'ওরে এটা লিখে রাখিস, ভাবগে যা'। সেই কারণ তাঁর শ্রীমুখ হইতে লেখক যা শুনিয়াছিল, দেখিয়াছিল, এবং যা ঘটনাদি হইয়াছিল এবং সেই সময় ভক্তগণ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কতক নাম, দিন ও তারিখ দিয়া এইবার প্রকাশিত করিলেন।

প্রথম সংস্করণে রামলালদাদা কথিত ঠাকুরের গাওয়া যে সমস্ত গান স্বরলিপি সহ প্রকাশিত করা হইয়াছিল, এইবার এই পুস্তকে দেওয়া হইল না। কারণ, মহাপুরুষজী লেখককে আদেশ পত্রে জানাইয়া-

ছিলেন যে, 'ঠাকুরের গাওয়া সমস্ত গান গুলি একসঙ্গে ছাপাইয়া বাহির করিও'। এই কারণ '**শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি**' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সমস্ত গান ও রামলালদাদা এবং শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের মুখে যে গানগুলি ঠাকুরের গাওয়া গান অপ্রকাশিত ছিল অর্থাৎ কথামৃত মধ্যে যে গানগুলি নাই সেইগুলি এইবার একসঙ্গে দিন, তারিখ, স্থান দিয়া প্রকাশিত করা হইল। ঠাকুর কোন গান গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, কাকে গানের ফরমাজ করিতেন এবং গানের মধ্যে কোন্ কথাগুলি বলিয়াছিলেন এইসব বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং গানের স্বরলিপি কতক দেওয়া আছে। স্বামীজির রচিত গান, স্তোত্র, রামনাম ১০৮, ইত্যাদি ঐ গুলির স্বরলিপি ভক্তগণের সুবিধার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

রামলাল দাদা ও মহাপুরুষজীর দুইটী আদেশ পত্র এই পুস্তকের মধ্যে দেওয়া হইল।

লেখক "**শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাশ্রম**" নামক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই পুস্তকের আয় হইতে উক্ত মন্দিরের জন্য ও কতক ঠাকুর ও দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় হইবে।

যদ্যপি উক্ত পুস্তক দুইটীর সাহায্যে কোন ধর্ম্ম পিপাসু ভক্ত সাধকের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয়, তবেই লেখক পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন। লেখক একাই সমস্ত কর্ম্ম সাধন জ্ঞানে করিলেন। ভ্রম-প্রমাদ মার্জ্জনীয়।

বিনীত

শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র।

শ্রীরামলাল দাদার আদেশ পত্র

ভাই কমল,

তুমি আমার নিকট হইতে যে সমস্ত শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের ও স্বামীজির কথা এবং গান ইত্যাদি শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ তৎ সকল, স্বীয় ও সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বাহিরে অবাধে প্রকাশ করিতে পার। ইহাতে আমি অত্যন্তই প্রীত ও প্রফুল্লিত হইব! তুমি আমার অনন্ত শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়
১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৩৯ সাল।
৺দক্ষিণেশ্বর।

শ্রীমহাপুরুষজীর আদেশ পত্র

শ্রীমান্ কমল,

আমি তোমায় অনুমতি আদেশ ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও গান গুলি বইতে ছাপাও। উহাতে ভক্তের অনেক কল্যাণ ও উপকার নিশ্চয়ই হইবে। একসঙ্গে সব গানগুলির স্বরলিপি করিয়া দিবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।

সতত শুভানুধ্যায়ী—
শিবানন্দ।

বেলুড় মঠ—২১—১০—১৯৩২

—০—

LIBRARY 3/329
No.... 7/ALL
BANARAS

সূচিপত্র

বিষয়	কথিতগণের নাম	পৃষ্ঠা
ঠাকুরের সাধনা ...	(ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলালদাদা) ...	১
ঠাকুরের সাধনার পর	" " " ...	৩
" হাবভাব ...	(স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহিম মহারাজ) ...	৬
চেনা ও শক্তি ...	" " " ...	৯
লেকচার দিতে বলা ...	(শ্রীরামলালদাদা) ...	১২
চিত্র ও রঙ্গরস ...	(রামলালদাদা, শ্রীম, মহিমমহারাজ)	১৪
ঠাকুরকে দেখা ...	(রামলালদাদা) ...	১৫
দেশে যাওয়া হল না ...	" ...	১৬
পাঁচালী ও পাঁচটি ছবির বর্ণনা ...	" ...	১৮
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম ভ্রমন, ধূম ধাম বর্ণনা ...	" ...	২২
সাইনবোর্ড	" ...	২৩
রসর্দ্দার দেখান	" ...	২৪
মিতব্যয়ীতে কাজ	" ...	২৬
দু' জনে ঝগড়া	" ...	২৯
ঠাকুরের পথে সমাধি ...	" ...	৩০
নীলপদ্মে দুর্গা দর্শন	" ...	৩২
দক্ষযজ্ঞ দেখা	" ...	৩৫
পাঁচালী শোনা	" ...	৩৮
দিগম্বর বাড়ুর্য্যেকে কৃপা করা ...	" ...	৪০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিবর্ত্তন ...	" ...	৪১

বিষয়	কথিতগণের নাম	পৃষ্ঠা
প্রণাম ও নাম দেওয়া ...	(শ্রীমহিম মহারাজ)	... ৪৩
স্বামীজির জন্য উতলা ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৪৪
লক্ষণ বিষয় বর্ণনা ...	(শ্রীমহিম মহারাজ)	... ৪৭
স্বামীজির সত্যরক্ষা ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৪৯
স্বামীজির বাল্য পরিচয়	(শ্রীমহিম মহারাজ)	... ৫১
তামুক সাজনারে ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৫১
কলকাতার ভক্তি ...	"	... ৫৩
লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা ...	(শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথামৃত)	... ৫৫
কালীর আহার ও বিশ্রাম	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৬২
দই ও কাঁচাগোল্লা ...	"	... ৬২
শনির দৃষ্টি ...	"	... ৬৩
আগে ভোজন কর ...	"	... ৬৪
উপবাসের কথা ...	(শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়)	... ৬৪
'টে' কথায় চটা ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৬৫
শ্রীরাম সাধনঅর্থে, সৃষ্টিরমধ্যে বড় ...	"	... ৬৬
মা বিন্দুবাসিনী ...	(রামবাবুর একটি শিষ্য)	... ৬৭
ঠাকুর নামকোরে নিত্য করেন ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৬৯
নামের শক্তি ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ৭০
মানুষের ইচ্ছা না ভগবানের	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৭৩
লীলাবোঝা ভার ...	"	... ৭৫
নাম মাহাত্ম্য ...	"	... ৭৬
আশা মিটিয়ে দেখা	"	... ৭৭
আগে দর্শন পরে অন্য কিছু ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ৭৮
খৃষ্টানি মত, পাপ ও মন ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ৮০

বিষয়	কথিতগণের নাম	পৃষ্ঠা
জ্ঞান, বিবেক বৈরাগ্য চাই ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ৮৫
ভক্ত ও ভক্তি ...	(শ্রীরামলালদাদ)	... ৮৮
ভক্তের কি করা কর্ত্তব্য ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ৯১
স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ ...	(শ্রীমহিমমহারাজ)	... ৯৪
যোগতত্ত্বাদি ...	(মহর্ষি পাতঞ্জল, স্বামীজি)	... ১০৫
পূজা ও ধ্যান জপাদি ...	(শ্রীরামলালদাদা, মহিম মহারাজ, স্বামীজি	... ১০৭
জপ ধ্যানাদিতে শ্রীশ্রীমায়ের অভয় বাণী	(শ্রীশ্রীমা)	... ১১৮
বর্ষা. যাপন, ক্যাম্‌থাট ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১২২
ঠাকুরের বায়ুবুদ্ধি, দৈবঔষধ ও কর্ম্মফল ...	,,	... ১২৩
ঠাকুর ভক্তাধীন ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ১২৮
ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১২৯
হাত পা জ্বলেগেল রে	,,	... ১৩০
পদছাপ ও খড়ম পূজায় নিষেধ ...	,,	... ১৩১
তিন জনকে কৃপা করা ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১৩১
Onder ও গুরুবাক্য ...	(শ্রীমাষ্টার মহাশয়)	... ১৩৪
আমিই সেই ...	,,	... ১৩৫
শেষ দিন ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১৩৭
ঠাকুরের পুনঃ আসা ...	(বড়দিদি, শ্রীশ্রীমা)	... ১৩৮
পূর্ব্বস্মৃতি ও মুক্ত পুরুষ ...	(শ্রীমহিম মহারাজ)	... ১৪৩
উপকার ও সেবাদি ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১৪৪
মানুষ ও গর্ভধারিণী মার পূজো	(শ্রীমহিম মহারাজ)	... ১৪৯
স্বদেশপ্রতি স্বামীজির বাণী···	(স্বামী বিবেকানন্দ)	... ১৬১, ১৬৩

বিষয়	কথিতগণের নাম	পৃষ্ঠা
অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ		
রামলালদাদার বাড়ী—দুঃখ জানান	(কমল)	... ১৭২, ১৭৩
শ্রীমহাপুরুষজি ও কমল ...	(শ্রীমহাপুরুষজী)	... ১৭৪
দীক্ষা ও ফুলপড়া ...	... (কমল)	... ১৭৭
শ্রীরামলালদাদার চরিত্র ...	... "	... ১৭৮
বুনির চিন্তা ...	... "	... ১৮১
ভক্তগণের আগমন ...	... "	... ১৮৭
মহাপুরুষজির পত্র ...	... ...	... ১৮৭
বিবাহ ও ভোগাদি ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ১৯১
শ্রীশ্রীমার পত্র, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন	... ...	... ১৯৮
শ্রীশ্রীমার জন্ম ...	... ...	... ১৯৯
কালীর মূর্ত্তিতে দুর্গা ও ঠাকুর	... (কমল)	... ২০১
অতিথি সেবা ...	(শ্রীরামলালদাদা)	... ২০৩
রামলালদাদাকে সেবা করা ...	"	... ২০৪
স্বামীজি ফুল নিয়ে সমাধি ...	"	... ২০৬
স্বামীজির কল্পনা ...	"	... ২০৮
চাওয়া ও দেওয়া	(শ্রীরামলালদাদা)	... ২০৮
পূজার দ্রব্য পাওনা ...	"	... ২১০
বুনির আশা পূর্ণ ...	(কমল)	... ২১২
শ্রীরামলালদাদার পত্র ...	...	... ২১৫
রামলালদাদার অসুখাদি ...	(কমল)	... ২২৩
শ্রীম ও কমল ...	...	... ২২৭
ভক্তগণের আগমন ...	.. (কমল)	... ২৩০

বিষয়	কথিতগণের নাম	পৃষ্ঠা
সাধু দর্শন করান	(কমল)	... ২৩১
শ্রীমহের শিক্ষা দেওয়া ...	„	... ২৩৩
শ্রীমকে শেষ দর্শন ...	„	... ২৩৭
শ্রীমহের অদর্শনের পূর্ব্ব দিনের ঘটনাদি	„	... ২৩৭
শ্রীমহের চরিত্র ...	„	... ২৪০
শ্রীরাখাল মহারাজের অসুখ ...	„	... ২৪১
শ্রীরাখাল মহারাজের চরিত্র ...	„	... ২৪২
স্বামীজির বাড়ী যাওয়া ...	„	... ২৪৫
ভক্তগণের আগমন ...	„	... ২৪৯
শ্রীমহিম মহারাজ ও কমল ...	„	... ২৫১
শ্রীমহিম মহারাজের পত্র ...	...	... ২৫৩
শিক্ষাগুরু ...	(শ্রীমহিম মহারাজ, স্বামীজি)	... ২৫৬
অর্জ্জন ও বর্জ্জন	(কমল)	... ২৫৭
শ্রীমহিম মহারাজের চরিত্র ...	„	... ২৬৭
দশ বছর সঙ্গ ছাড়া ...	„	... ২৬৯

ভ্রম সংশোধন

লেখক প্রুফ্ দেখেন এবং একজনকে প্রুফ্ দেখবার জন্য কিছু দেন। তিনি হাতের লেখা কপি বুঝতে না পারায় কতক বানান ভুল হইয়া গিয়াছে। ভ্রম প্রমাদ মার্জ্জনীয়। ভ্রম সংশোধন করিয়া আলাদা কাগজে ছাপিয়া সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		শুদ্ধ
৪	দেওয়াব	৭	জ...গ...	দেবনেত্র
৬	ষ্ট্রীট,	৯		ধীরেন্

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
১৩	অতি, লিখে	১৪০	শ্রীমার
১৪	মেসোমহাশয়	১৪৬	করো
২১	কাড়তে	১৫৩	Toilers Republic,
২৭	ভাত, ভাতের		বরেন
৩১	বৈকি	১৫৫	আখুন
৬২	মাখম	১৫৬	চাই
৬৮	দধাম্যহম্, ততো ভবতি	১৫৮	ভগবান
	বৈ, পুত্র, তৎপ্রেমাত্মার্থনৈব	১৫৯	বরেন
	মত্মার্থমাত্মানি	১৬০	একটু পরেতে, জনৈক
৭০	লাল, টোলের		ভক্তের বাড়ী
৭১	গ্রাম	১৬১	জনৈক ভক্তর, স্বামীজিকে
৭৩	শ্রুতি	১৭২	সকালে
৭৫	করী	১৭৩	রকম
৭৬	মুখুর্য্যেকে	১৭৯	ঘণ্টাটা
৭৮	বং লব্ধা চাপরং লাভং	১৮৩	নত্ত
	ঋগ্বেদ	১৯৩	জীবই
৭৯	রকম, মিললে	১৯৫	বিষয়
৮১	পিঠে	১৯৮	১৩২৪, ১৩২৫
৮২	গুরুকেও	১৯৯	কৃষ্ণাসপ্তমী
৯৫	স্নায়ুতে	২০৩, ২০৫,	কৈ, কৈ
৯৮	সুপষ্ট	২১৬	কল্যাণাশীর্ব্বাদ
৯৯	Nerves	২২৬	৭৩
১০০	ব্যক্তিত্ব	২৩১	মাষ্টার মহাশয়
১০৩	বরেনদের	২৩৭	পাইলাম
১০৪	বাক্‌বিতণ্ডা	২৪২	বোলেছিলেন
১০৫	অপানাদি		ভক্তগণের উৎসাহ ও আগ্রহ
১১০	মেরেছেন		তাদের স্ব ইচ্ছায়
১২৭	পূর্ব্বার্জিত	২৭০	সুধাংশু

LIBRARY
No. ... ৺৹ (গ)
... Ashram
BANARAS

ভ্রম সংশোধন ও দ্রষ্টব্য

পুস্তকটী ছাপার শেষে দেখা গেল কতক ভুল হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ পুনরায় আলাদা কাগজে ভ্রম সংশোধনগুলি ছাপাইয়া সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ll৶৹, ৺৹ নম্বরের পাতায় ll৶৹ (ক), ৺৹ (খ) বুঝিতে হইবে। উহার মধ্যে যে সব বানান ভুল পরপর নম্বর দিয়া দেখান হইয়াছে আর এই সংযুক্ত পাতার মধ্যে যে সব নম্বর দিয়া বানান ভুল দেখান হইল তা ঠিক পরপর পূর্ব্বের মত মিলন না হইয়া ওলট পালট হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন পাতার মধ্যে ৬৮ পৃষ্ঠায় দদামাহম্, ৭১ পৃষ্ঠায় গ্রাস, ১২৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বার্জ্জিত হইবে।

আশা করি তাড়াতাড়ির—কারণবশতঃ পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন ও মনে কিছু অসন্তুষ্ট বা বিরক্তি ভাব আনিবেন না।

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
৶৹	শ্রীরামকৃষ্ণ	২৪	ত্রৈলক্য, ত্রৈলক্য
৺৶৹	অন্তর্গত	৫০	ছাদের, নীচে
১৲	কাত্যায়ণী, ক্ষুদিরাম, পদ্মধারী	৫৪	নীচে
১৮	খাজাঞ্চী	৫৩	বেগুণ

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
৬৮	দদামাহম্, কোরি	১৯৭	পুরুতকে, কণে
৭১	গ্রাস		মাথার, মাদুহঁব
৮৫	এটর্ণী, মাদুহঁব	১০০	জগৎ, মুহুর্মুহুঃ
৯৯	atom Nerves	২০১	সেক্রেটারী, সোণার
১০৩	বরেণদের, ব্যক্তিত্ব	২০৭	অতিথি, কৈরে, কৈ
১০৯	জ্যৈষ্ঠ, এটর্ণী	২০৫	কৈ
১১৩	অশ্লেষা, সিংহবাহিনী	২২৩	ব্রাহ্মণ
১২৪	বাহিনীর মাটী	২২৯	চেটো
	বাহিনীর মাটীর	২৩৩	প্রোমোশান, পরণের
১২৫	সিংহবাহিনীর	১৩৪	পুরুত
১২৭	দ্রষ্টা, পূর্ব্বার্জ্জিত	২৩৫	ছাদের
১২৯	নীচে	২৩৬	Tuition
১৩১	মাষ্টারমহাশয়ের	২৩৭	ছাদের
১৩৪	ছাদ	২৩৮	নীচের, নীচে
১৫৮	বোলেন	২৩৯	নীচে
১৫৪	কর্ম্মাণি সঙ্গঃ ত্যক্ত্বা	২৪২	মিস্ত্রী, কষ্টের,
১৬৫	ভারত		বোলেছিলেন
১৬৬	কাণ	২৪৪	ঘ্রাণ, দ্বিতীয়
১৬৭	পুরাণ, পুরাণ	২৫০	বিধুদত্ত, বিধু, স্বজন
১৭৩	রোগী	২৫৩	বাবুদের
১৭৯	ভূমিষ্ঠ	৫৬২	ছিট
১৮০	ভগবত্ত	২৫৯	রোগা
১৮৫	কোরে	২৬১	ভ্রূণ
১৮৭	অণিমাদি, মোহিনী	২৬৮	বিধু
৫৫১	অন্নপ্রাশন	২৬৯	রোগীদের

দুঃখ ও মন্তব্য জানান

দক্ষিণেশ্বর রামলালদাদার বাড়ী—

কমল। (রামলালদাদা)। আপনাকে কিছু দুঃখ কষ্ট জানাব দয়া করে শুনবেন কি? রামলালদাদা। কি বল না শুনি।

কমল। (রামলালদাদা)। আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আপনার কাছে থেকে সেবা কোরি ও ঠাকুর স্বামীজির কথা ও গান গুলো লিখে রাখি। আর দাদা, এই আশীর্ব্বাদ করুণ, ঠাকুরকে যেন না ভুলি। সর্ব্বদা তাঁর নাম জপ ও গানে মত্ত থাকি।

রামলালদাদা। (কমল)। আহা! তিনি (ঠাকুর) মঙ্গলময়, ইচ্ছাময়, আহা! তিনি! তাই করবেন বৈকি। তবে কি জান ভাই, আমি ঠাকুর স্বামীজির কথা ও গান বলবো আর তুমি লিখতে থাকবে, সেটা যেন একটা বেভাব হয়ে পড়ে। আমায় ভেবে ভেবে বলতে হবে, তাড়াতাড়ি বললে কি হয়। যখন ভক্তরা সব আসেন, তাদের সঙ্গে ঠাকুর ও স্বামীজির গান কি কথা হতে থাকে, তখন লিখলে এক চলে। আর কি জান, যার সরল ভাব, ভক্তিবান ও বিশ্বাস ওসব থাকে, তাদের ওসব যায় না। তার সুখে, দুঃখে সমান ভাব থাকে। ও জিনিস যাবার নয়।

কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, জন্ম-জন্মান্তরের ভাল সংস্কার থাকলে ও রকম হয়। রামলালদাদা। (কমল)। ঠিক কথা।

কমল। (রামলালদাদাকে)। আপনার কাছ থেকে ঠাকুরের যে সব কথা শুনে লিখে রেখে ছিলুম, তার মধ্যে কয়েকটা বিষয় কয়েক জনকে বলে ছিলুম। তারা শুনে বললেন, 'কই এ সব কথা ত কোন বইতে নেই। মাষ্টারমহাশয় যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুরের কথা গুলি দিন ও তারিখ দিয়ে লিখে রাখতেন, তেমন কি আর দাদা

ওসব ঠাকুরের কথা লিখে রেখেছেন ? দাদার ওসব কথা তেমন বোধ হয় ঠিক ঠিক মনে নেই, ভুল ও ত হতে পারে ? রামলাল দাদা। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের কাছে যে দিন আসতেন, সেই দিনেরই কথা ও গান লিখে রাখতেন। তাঁর অসাক্ষাতে কত কথা ও গান ঠাকুর বলেগেছেন তার কি সীমা আছে। আমি যখন কামারপুকুর দেশ হতে ঠাকুরের কাছে ৺দক্ষিণেশ্বরে এলুম তখন ঠাকুরের কাছে ২।১টী ভক্ত আনাগোনা করত। তারপর বোধ হয় কয়েক মাস পরে একে একে সব ভক্তগণ ঠাকুরের কাছে আস্‌তে সুরু করলেন। কেশব সেন, রামবাবু, গিরিশ, বলরাম, মাষ্টার মহাশয়, স্বামীজি ইত্যাদি। ঠাকুরের কাছে আমি প্রথম হতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা থেকে তাঁর কত সেবা করেছি, কত দেখেছি, শুনেছি। এবং আমার অসাক্ষাতে যে সমস্ত ঘটনা গুলি হয়ে যেত, ঠাকুর আমায় একে একে সব বল্‌তেন। এমন ত কেউ আর করেন নি বা শুনেননি, এ ত ঠাকুরের অন্তরঙ্গ মাত্রই জানেন। তবে কি জান, আমি ঠাকুরের কথা কি গান ও সব দিন ও তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম না বটে। কিন্তু যে সমস্ত দেখেছি, শুনেছি সে গুলো চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করছে, সর্ব্বদাই মনে পড়ে যায়, ভুল হবার যো নেই'। কমল। আমি তাদের ও সব কথা শুনে খুব বলেছিলুম। রামলাল দাদা। 'কি বলেছিলে গো' ?

কমল। (দ, অ, ও অন্যান্য ভক্তদের)। শুনেছিলুম, বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), একদিন কয়েকটী ভক্তকে ঠাকুরের কথা কিছু বলেন। তারা শুনে বলেছিলেন, কই মহারাজ, এ সব কথা ত কথামৃতে বা কোন বইয়ে নেই। বাবুরাম মহারাজ শুনে বলেছিলেন যে, 'কথামৃতে নেই বলে কি ঠাকুর বলেন নি, আমি তোমায় মিথ্যা বলছি' ? তোমাদের ঐ এক হয়েছে কথা, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ

কথামৃতে ঠাকুরের এ সব কথা নেই, তখন তিনি বলেন নি। আমিও তেমি তোমাদের বলছি যে কাথামৃতে বেশী কিছু নেই। মাষ্টার-মহাশয়ের কথামৃত ছাড়া ঠাকুরের বহু কথা ও গান আছে যা মাষ্টার মহাশয় জানতেন না'। কমল। (উহাদের)। এখন ভেবে দেখুন, কথা গুলো কত সত্য। শুনতে পাই দাদাকে ঠাকুর বলেছিলেন, "সত্য কথা বলবি, সত্যই কলির তপস্যা"। তা আমি দাদার কাছে ৭ মাস থেকে সে বিষয় বহু পরখ করেছি, দাদা মিথ্যা বলবার লোক নন। আপনাদেরই কাছে অমন বলে মনে হয়। চাষা কি জানে—জহুরী না হলে কি—ইত্যাদি। রামলালদাদা। এত কথা তাদের শুনালে কেন, তারা যদি না মানে, না শোনে, তাহলে কি তুমি তাদের জোর করে মানাতে পার? তারা হল এক ক্লাসের লোক, (হাসিতে হাসিতে) যাহোগ, তোমার ওসব কথা শুনে তারা কি বললেন? কমল। বেশী কিছু বল্লেন না, আমি বলে উঠে চলে গেলুম।

রামলালদাদা। ছাখ, তোমায় একটা কথা বলে দি তুমি যাদের নাস্তিক ভাব কি ভাবের ঘরে চুরি, কিংবা খারাপ লক্ষণ আছে দেখতে পাবে, তাদের কাছে বেশী কথা বলা কি মেশা মেশী এ সব কোর না।

কমল। যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ও কলিকাতায় আসা

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামার পুকুর গ্রাম। পিতা—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দুই ভ্রাতা ও এক ভগ্নী, নিধিরাম, কানাই ও রামশিলা। ক্ষুদিরামের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তানে মারা যান। মাতা—চন্দ্রাদেবী। সরাটী মায়াপুরে তাঁর বাপের বাড়ী। ক্ষুদিরাম বাড়ীতে

'রঘুবীর' শালগ্রামের পূজাদি করিয়া কাটাইতেন, তিনি অতি নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ক্ষুদিরামের দুই পুত্র ও এক কন্যা। রামকুমার, রামেশ্বর ও কাত্যায়নী।

ক্ষুদিরাম ৺গয়া ধামে গিয়া স্বপ্নে দেখেন যে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী ভগবান বলছেন, 'আমি তোমার ঘরে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করবো।' ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া ১২৪২ সাল। ইং 17—2—1836 রাত্রি ৩১ দণ্ড অতিবাহিত হইয়া অর্দ্ধ দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় 'গদাধর' 'গদাই' বলিয়া তাঁহাকে সকলে ডাকিত। অন্নপ্রাশনের নাম, রাশনাম 'শম্ভূনাথ' রাখা হয়।

ঠাকুরেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি ৺দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে প্রথম পূজারী হন। ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ইনিও কালী বাড়ীতে মাঝে মাঝে পূজা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। রামলাল, শিবরাম ও লক্ষ্মীদেবী।

ঠাকুরের বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর তখন তিনি কলিকাতায় কিছু দিন নাথের বাগানে, ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়ীতে কিছু দিন পূজা করিয়া ছিলেন। শ্যামসুন্দরের সেবক শ্রীশৈলজা চরণ চাটুর্য্যে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালী বাড়ীতে পূজায় থাকা কালিন ঠাকুর মধ্যে মধ্যে কালী বাড়ীতে আসতেন ও কিছু দিন পরে নিজে পূজার কাছে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ বৎসর ছিল।

ঠাকুরের বিবাহ হয় ২২।২৩ বৎসরে শ্রীশ্রীমার বয়স তখন ৬ বৎসর ১৮৫৯ সাল বাঙ্গলা ১২৬৬ সাল। ঠাকুর দেশে যান 3—3—1880

হইতে 10—10—1880 পর্য্যন্ত কামারপুকুরে ৮ মাস ছিলেন। দেশে থাকবার সময় ৺রঘুবীরের জমি ক্রয় হয়।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সাধনার সময় ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন। তারপর ন্যাংটা তোতাপুরী সাধুর নিকট দীক্ষা পাইয়া ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে পরমহংস নাম দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গায়ত্রী :—ওঁ রামকৃষ্ণায় বিদ্মহে গদাধরায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ ঐঁ সর্ব্ব দেব দেবী স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।

দক্ষিণেশ্বরে কালী প্রতিষ্ঠা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নান যাত্রার দিন, ১২৬২ সাল। মা কালী (৺মা ভবতারিণী) দেবীর মন্দির ঐ দিনে প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ অর্থাৎ 'শ্যামসুন্দর' মন্দিরে ও কালী মন্দিরে দুটী ঘটনা যা হইয়াছিল তাহা এই :—

১৩৪০ সালে দক্ষিণেশ্বরে কলু বাবুর মন্দিরে থাকা কালীন একদিন শুনি মা কালীর মন্দির হ'তে মায়ের সোণার গহনা গুলি চুরি হইয়াছে। সকালে গিয়ে দেখি সত্যই গহনা চুরি হইয়াছে। ৺মথুর বাবুর সময়কার, পূর্ব্বের যে ভাল ভাল গহনা গুলি ছিল তা নাই এবং অষ্ট ধাতুর 'রামলাল বিগ্রহ মুর্ত্তি'টীও চুরি হইয়াছে। চোর পরে ধরা পড়ে, গহনার মধ্যে কিছু সোণা গলান তাল পাওয়া যায়—।

শ্যামসুন্দরের মন্দির মধ্যে পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ মুর্ত্তি ছিল তা এখন শ্যামসুন্দর মন্দিরের পার্শ্বের ঘরে রাখা আছে ও পূজা হয়ে থাকে। উক্ত সালে তখন মন্দিরের সেক্রেটারী

শ্রীকালি পদ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন। তিনি পুরান শ্যামসুন্দরজীকে পার্শ্বের ঘরে রাখিতে আদেশ করেন এবং নুতন শ্যামসুন্দর আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। কারণ পুরান শ্যামসুন্দরজীর একটী পা ভাঙ্গা-জোড়া ছিল এই কারণ তিনি পুরান শ্যামসুন্দরজীকে পার্শ্বের ঘরে রাখান।

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আছে, যে একদিন পুরান শ্যাম-সুন্দরজী পুরুতের হাত হইতে পড়িয়া যান ও পা ভাঙ্গিয়া যায়। ৺মথুরবাবু (রাণী রাসমণির জামাতা) ঠাকুরকে বলেন যে, বাবা ভাঙ্গা ঠাকুর কি করে পূজা হবে, গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে কি? ঠাকুর শুনিয়া ৺মথুরবাবুকে বলেন, "তোমার ছেলে যদি খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে তার হাত কি পা ভেঙ্গে যায়, তুমি কি তাকে গঙ্গায় ফেলে দেবে"? ঠাকুর নিজের হাতে ঐ পুরান শ্যামসুন্দরজীর ভাঙ্গা পা খুব ভাল করে জুড়িয়াছেন এবং বরাবর ঐ পুরান শ্যামসুন্দরজীর মন্দিরে তাকে রাখিয়া পূজা হইয়া আসিতেছিল আর এখন মন্দিরের পার্শ্বের ঘরে রাখিয়া পূজা হইতেছে।

দ্বাদশ শিব মন্দিরের নাম

১। নির্জ্জরেশ্বর। ২। নাকেশ্বর। ৩। নকুলেশ্বর। ৪। জটিলেশ্বর। ৫। যজ্ঞেশ্বর। ৬। যোগেশ্বর। ৭। নরেশ্বর। ৮। বন্দাশ্বর বাননী-কেশ্বর। ৯। নাগেশ্বর। ১০। জগদীশ্বর। ১১। জলেশ্বর। ১২। যজ্ঞেশ্বর।

PRESENTED No...........

গুরু-বন্দনা গীত।

বন্দি তোমারে গুরু !

(ও গো) তুমি যে আমার সুধার সিন্ধু, আমি যে তৃষিত মরু ॥

হে মোর জীবনের ধ্রুব তারা, আমি আঁধারে আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়েছিনু দিসে হারা ; তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া, ভয় নাই বলে পথ দেখাইয়া, আগে আগে যাও ফিরে ফিরে চাও, বুঝিয়া আমারে ভীরু ॥

তুমি আমার পরম বন্ধু, আমার শত অনাদর লও সমাদরে অপার করুণা সিন্ধু ; দেখিতে আমার পাওনাক দোষ, নাহি অভিমান নাহি তব রোষ, সদা হাসি মুখ প্রশান্ত সুমুখ, হে আমার আশ্রয় তরু ॥

অন্তরেতে তুমিই প্রাণ (আবার) বাহিরেতে তুমি বিশ্বরূপ ধরি রহিয়াছ দৃশ্যমান ; তুমি আবার দেহধারী হয়ে, কর অভিনয় দেহী মোরে লয়ে, নমি বিশ্বপ্রাণ কর পরিত্রাণ, হে আমার কল্পতরু ॥

ওঁ

নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র
শ্রীযুত রামলাল (দাদা) চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীমুখ নিঃসৃত ঠাকুরের কথা।

স্থান :—দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের ঘর। সকাল প্রায় ৮টা। একদিন রামলালদাদা বললেন :—

প্রথম অধ্যায়

ঠাকুরের সাধনা

শ্রীরামলালদাদা। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে সাধনা করতেন, তখন তাঁর খুব উন্মাদ অবস্থা ছিল। তিনি মা মা বলে, চীৎকার করে ছট্‌ফট্‌ ক'রতেন, আর ছুটে ছুটে এদিক ওদিক যেতেন। বহু প্রকার কঠিন সাধনা করতেন—রাত্রি কালে পঞ্চবটী বনের কাছে যে শান্তিকুঠীর আছে (তখন ছিটে বেড়ার ছাউনি ছিল) তার বারাণ্ডার চাতালে শুয়ে থাকতেন। কত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র তাঁর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। কতদিন অনাহারে কাল কাটিয়েছেন ঠাকুর বেশীর ভাগ ঘরের বাইরে চাতালের উপর পড়ে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে ঘরে গিয়ে

শুতেন। পরে ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস (৺মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র) শান্তি-কুঠীরটা পাকা করে, একটি ঘর করে দিলেন।

কমল। (রামলালদাদা)। পঞ্চবটীর কোন স্থানে ঠাকুর বসে সাধনা করতেন? রামলালদাদা। শান্তি কুঠীরের কাছে অশ্বত্থ গাছের নিকট পশ্চিম দিক অথবা গঙ্গা মুখ পূর্ব্ব ও উত্তরাস্ত হয়ে বসতেন। যখন যেমন আবশ্যক বুঝতেন তেমন ভাবে বসতেন। দেবী সাধনার সময় উত্তর দিক হয়ে আর দেবতার সাধনার সময় পূর্ব্ব দিক হয়ে বসতেন।

৭-৬-১৯৩১—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার সপ্তমী ১৩৩৮ সাল। সকাল ৭টার সময় কমল ও শ্রীপ্রবোধচাঁদ দত্ত, দক্ষিণেশ্বর রওনা হয়। মন্দিরে পূজার টাকা দিয়ে তারা রামলালদাদার বাড়ী গেলেন।

প্রবোধ। আচ্ছা দাদা, কোন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সব সাধনাগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন? রামলালদাদা—ঠাকুর যখন সাধনার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে তিনি আপনা আপনি বলে বেড়াচ্ছিলেন, যে, "শক্তি সাধনা করবি আচ্ছা আচ্ছা"। তারপর দেখেন, এক ভৈরবী গেরুয়া পরা, হাতে ত্রিশূল, কাঁধে ঝুলি, সম্মুখে এসে ঠাকুরকে নিয়ে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন করে তাতে ঠাকুরকে বসিয়ে, সাধনার ক্রিয়াগুলি একে একে সব দেখিয়ে দিলেন। ভৈরবী যখন দেখলেন, ঠাকুর বসে বেশ সাধনা করছেন ও দর্শনাদি পাচ্ছেন, তখন তিনি সেখান হতে চলে যেতেন। এইরূপে ভৈরবী এসে বহুবার ঠাকুরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সব কথা ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন।

PRESENTED LIBRARY
No.........
BANARAS

একবার ঠাকুরের মুসলমানের মস্‌জিদে গিয়ে সাধনা করতে ইচ্ছা হল। একটা মস্‌জিদ আছে। (রামলালদাদার বাড়ী হতে মন্দির যাবার পথে অথবা সদর ফটক হতে রাস্তার কাছে—যাবার পথে) একদিন, ঠাকুর ভোরে (তখন কেউ উঠেনি) ঐ মস্‌জিদে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে এক গজ কাপড়—কাচা নেই, তারপর মুসলমানরা এসে দরজা খুলে দেখে—একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে, কোথায় থাক? তার মধ্যে একজন বোলে উঠলো, 'ইনি মন্দিরে থাকেন ও পূজা করেন।' তারপর ঠাকুর তাদের সঙ্গে নেমাজ পড়তে গেলেন, এইভাবে তিনি তিন দিন সাধনা করেছিলেন।

একদিন ঠাকুর দেখেন মস্‌জিদে একটি বৃদ্ধ ফকির, গোঁফ, দাড়ি, মাথার চুল সব সাদা, আলখাল্লা পরা, গলায় কাঁচের (অর্থাৎ ফকিরদের গলায় যেরূপ মালা দেখা যায়) মালা, হাতে লাঠি, ঠাকুরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুমি এসেছ, বেশ বেশ, বোলে হাস্‌লেন ও হাত নেড়ে আশীর্ব্বাদ করলেন'। এই সব ঘটনা ঠাকুরের মুখে শোনা।

ঠাকুরের সাধনার পর

রামলালদাদা। (কমল)। কামারপুকুর (ঠাকুরের দেশ) হ'তে গ্রামবাসীরা কলকাতায় এসে কাপড় ও নানা প্রকার জিনিষ বিক্রী করতে আসত। তারা মন্দিরে এসে মা কালী ও ঠাকুরকেও দেখে যেত। গ্রামবাসীরা দেশে গিয়ে ঠাকুরের মাকে

বলতো, 'তোমার গদাইকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখে এলুম খুব উন্মাদ অবস্থা, কেবল মা মা বলে চীৎকার করছে। আবার ছুটে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। তুমি শীঘ্র তার কাছে যাও নচেৎ সে কোথাও চলে যাবে'।

ঠাকুরের মা এই সব শুনে ঠাকুরের কাছে এসে বললেন,—"গদাই তুমি কেন এরূপ আচরণ করছো, তোমার এই সব কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পার্চ্ছি না। শুনছি তুমি মধ্যে মধ্যে আবার কোথায় চলে যাও তুমি যদি চলে যাও বা এরূপ কর ত আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো"। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, "না মা, আমি এ স্থান ছেড়ে এখন কোথাও যাব না। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ভাল হয়েছি"।

ঠাকুরের যখন উন্মাদ অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি মথুর-বাবুর কুঠী-বাড়ীর উপরে থাকতেন। একদিন মথুরবাবু ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা, এ বাগান বাড়ীটী হেষ্টি সাহেবের কাছ থেকে কেনা হয়। তা কিনে অবধি ঘর গুলোতে কলি দেওয়া হয়নি, মনে করছি সব ঘরগুলো একবার ভাল কোরে কলি দোয়াব। আপনি আমার সঙ্গে নীচে আসুন. যেখানে যে ঘরে থাকতে ইচ্ছা করবেন, আমি সেই ঘর আপনার থাকবার জন্য ব্যবস্থা করে দোবো। তারপর কলি দেওয়া হয়ে গেলে, আবার এসে থাকবেন'।

ঠাকুর ও মথুরবাবু উপর থেকে নীচে এলেন, ঠাকুর অনেক ঘর দেখে শেষে বললেন, "এই ঘরটা (অর্থাৎ যে ঘরে ঠাকুরের

খাট বিছানা উপস্থিত রয়েছে, সেই ঘরটী পূর্ব্বে ৺শ্যামসুন্দরের ভাঁড়ার ঘর ছিল) হলে বেশ হয়। পাশেই গঙ্গা দর্শন (পশ্চিম দিকের গোল বারাণ্ডা হতে) এদিকে মার মন্দির দর্শন, আবার উত্তর দিকের দরজা খুললে নহবৎ পঞ্চবটী দর্শন হয়"। মথুর-বাবু বললেন, 'বেশ বাবা, আমি তাই বন্দেবস্ত করে দিচ্ছি'। তারপর ঐ ঘর হতে ৺শ্যামসুন্দরের ভাঁড়ারের জিনিষগুলো অন্য ঘরে রাখা হল। ঠাকুরের জন্য খাট, তক্তাপোষ ইত্যাদি এল। তখন ঐ ঘরের মেজেটা ইটের গাথুনি ছিল, এখন যেমন মা কালীর ভাঁড়ার ঘরে ইটের গাঁথুনি দেখা যায় তেম্নি ছিল।

একদিন মথুরবাবু এসে ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা, কুঠীর উপরে ঘরগুলি কলি দেওয়া হয়ে গেছে, এইবার আপনি উপরে চলুন'। ঠাকুর বললেন, "আবার এ ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? এই ত বেশ হয়েছে। তোমরা বাবু মানুষ, তোমাদের ও সব ঘরে থাকা পোষায়। তা ছাড়া উপর নীচে করা বাপু এ সব আর পারি না।" এই কথা শুনে মথুরবাবু আর কোন আপত্তি করলেন না। সেই অবধি ঠাকুর সেই ঘরে থাকতেন।

কমল। (রামলালদাদা)। আপনি কি সে সময় সেখানে ছিলেন, এই সব ব্যাপার যখন ঘটে?

রামলালদাদা। না, আমি যখন ঠাকুরের কাছে দেশ থেকে এলুম, ঠাকুর ও ঠাকুরের মা, একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি আমায় বলেছিলেন।

ঠাকুরের হাবভাব

শ্রীমহিমমহারাজের (স্বামীজীর ভাই) শ্রীমুখে শোনা।

(সংযোগ)। স্থান:—স্বামীজিদের বাড়ী। 24-3-1937 নং ৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জি লেন, কলিকাতা, (সিমলে)।

সদর দরজায় দক্ষিণমুখ ঢুকে পশ্চিম মুখ ঘরে স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত। (কমল তাঁকে মহিমমহারাজ বোলে উল্লেখ করেন)। তিনি বসে আছেন। কমল ও প্রবোধ চাঁদ দত্ত গিয়ে ছাখেন যে শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উনি স্বামীজির শিষ্য, স্বামী শিষ্য সংবাদ পুস্তক লিখেছেন, উপস্থিত আছেন। ঠাকুরের কথা সুরু হল।

প্রবোধ। (মহিমমহারাজ)। ঠাকুরের গায়ের রং কি রকম ছিল?

মহিমমহারাজ। (প্রবোধ)। সাধারণ বাঙ্গালীর গায়ের রং। আর ছবিতে যেমন বসা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি ভাবে বসতেন। ঠোঁট পুরু এবং ঠোঁটের ফাঁকে একটু দাঁত বারকরা দেখা যেত। গালে কোপচান দাড়ি। তিনি আবার থ্যাবড়ানি খেয়ে ছুটো হাটুর মাঝে হাত রেখে বসতেন, অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে বসা, গ্রামের চণ্ডী মণ্ডপে লোকেরা যেমনভাবে বসে। কাপড় কখন কোঁচাটা দেওয়া থাকত কখন বা খুলে লম্বা চাদরের মত কোরে বাঁ কাঁধে ফেলতেন। যখন কীর্ত্তনে যোগ দিতেন তখন কোঁচার কাপড়টা কোমরে ফেট্টী কোরে বাঁধতেন। গায়ে একটা পিরাণ পরা থাকত, আস্তিনটা কনুই ও কবজির মাঝ বরাবর থাকত। নিতান্ত

গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করতেন। 'ন' এর স্থানে 'ল' উচ্চারণ আর কথাগুলো একটু ঈষৎ তোতলা ছিল।

চোখ দুটো মাঝে মাঝে—সর্ব্বদাই পিট পিট করত; এত তাড়াতাড়ি পড়তো যে কি বলব। Rapid thinking power খুব বেশী ছিল। সাধারণ লোকের যে চোখ পিট-পিটানির মত নয়। চোখ দুটো ছোট ছিল, যাকে হাতী চোখ বলে। চোখ তিন প্রকার, নরনেত্র, ঋষিনেত্র ও দেবনেত্র। শিব নেত্র হ'ল ঋষিনেত্র। দুর্গার নেত্র হ'ল দেবনেত্র। দেবনেত্রকে চলতি কথায় পদ্ম, শঙ্খ ও মীননেত্র বলে। দেব-নেত্রের দৃষ্টিতে অব্যক্ত হ'তে ব্যক্তে আসার ভাবটা প্রকাশ পায়।

কথা যা বলতেন, প্রায়ই Drawling অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে, এটা সমাধির পূর্ব্বে দেখা যেত। যেমন জগন্নাথ—ই....গ....বলতে বলতে চুপ হয়ে গেলেন।

কথা বলতে গেলে আমরা বুঝি কতকগুলো অক্ষর একসঙ্গে কোরে বোলে; তাতে ভাব আনা এইত? কিন্তু ঠাকুর যা বলতেন, দেখতুম, এই এক রকম বল্লেন তখনই এমন এক ভাবের কথা বলতেন যে সহজে ধারণা করা বড়ই শক্ত হত। কি যেন দেখতুম, কেবল শক্তি। এইগুলো শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে পাওয়া যায়।

রামদাদার বাড়ীতে (নং ১১, মথুরায় লেন, সিমলা) ঠাকুর প্রায়ই আসতেন আর আমি গিয়ে দেখতুম। কেউ

কোন কথা বলতেন না সবাই চুপ কোরে তাঁর মুখের দিকে দেখতো। ঠাকুর আপনা আপনি কথা বলছেন, রঙিন বাটুয়া থেকে মধ্যে মধ্যে মশলা মুখে দিচ্ছেন কখন কখন শ্যামা বিষয়ক গান বৈষ্ণবদের গান করতেন। কোন সময়ে দেখতুম তিনি কথা কইতে কইতে স্থির হয়ে গেলেন। ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল তিনটি বেঁকে গেল। হাত দুটো সিধা ও শক্ত হয়ে গেল।

প্রবোধ। ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে কেউ প্রণাম করতেন ?

মহিমমহারাজ। না, তাঁর পা কেউ ছুতে সাহস করতো না, কথা কইতে কেউ সাহস করতে পারতো না।

প্রবোধ। যারা ভগবান মানতো না, তাঁদের প্রতি কি ঠাকুর রেগে যেতেন ?

মহিমমহারাজ। না, তিনি যাকে ধর্ম্মের গোড়ামী দেখতেন তাকে একটা Parable অর্থাৎ তাঁর গ্রাম্যভাষায় একটি সুন্দর গান দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। যেমন 'যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী বায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'।

21-1-1936—স্বামীজির বাড়ী। কমল ও কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদেরপ্রতি)। একদিন সুরেশ মিত্র রামদাদার বাড়ীতে ঠাকুরকে একটি ভাল বড় গোড়ের মালা এনে গলায় পরিয়ে দিলেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে বললেন—"কি দিয়ে সাজাবি আমায়, জগৎ-চন্দ্র-হার আমি

পরেছি গলায়"। এই কথা তিনি তিনবার হাত নেড়ে বোলে সমাধিস্থ হলেন।

23-9-1944—স্বামীজির বাড়ী। বেলা ৫টা।

মহিমমহারাজ। (কমল)। ঠাকুরের হাত দানের মুঠো হতোনা (চিৎকোরে দেখিয়ে)। তর্ক ও ফিলোজপি এসব তাঁর কাছে টেক্‌তো না। এইছ্যাখ, আমি দেখছি, তোরা ছ্যাখ। তাঁর (ঠাকুরের) বিষয় যে যা লিখেছে কেবল একটা উচ্ছাস। তিনি ধারণার অতীত। সহজ অবস্থায় এক রকম পাগল, কথা এড়ান—একটা জ্যোতি ও শক্তি ঠাকুরের দেহ থেকে যখন বেরোতো তখন কেউ তাকাতে পারতো না। কি অদ্ভুত দেখতুম।

18-12-1946—২রা পৌষ, বুধবার, দশমী, ১৩৫৩ সাল। (কমল তাঁর পায়ে মালিশ ও লণ্ঠনের শেক দেবার সময়)।

মহিমমহারাজ। (কমল)। তোমায় বলছি যে তুমি ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ ভাববে। তাঁকে ভাব দিয়ে ধরা যায় না। তিনি ভাবাতীত। ঠাকুর বলতেন "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ"। তিনি তাই ছিলেন।

(সংযোগ)। স্বামীজির বাড়ী। 19-1-1940— কমল, প্রবোধ, ধীরেণ, দুইজন ভক্ত ও একটি সাধু উপস্থিত আছেন।

চেনা ও শক্তি

মহিমমহারাজ। (ভক্তদেরপ্রতি)। ঠাকুরকে আগে কে জানতো, সকলেই জানতো পাড়াগেঁয়ের একটা মূর্খ পাগল,

অসভ্য। তারপর রামদাদা (রামচন্দ্র দত্ত) যখন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা কোরে প্রচার করলে যে দক্ষিণেশ্বরে একজন 'পরমহংস' আছে খুব উন্নত বোলে মনে হয়। তখন সকলে জানলে যে রামদাদার গুরু একজন দক্ষিণেশ্বরে আছেন। তখনকার দিনে পাদরী সাহেবরা হিন্দুদের খৃষ্টান করবার জন্য রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায়, লেকচার দিয়ে বেড়াত। 'বাইবেল' অমনি বিনা মূল্যে বিলি করত।

কেশববাবুর বক্তৃতায় সকলে জানলে যে দক্ষিণেশ্বরে 'পরমহংস' নামে একজন আছেন। তখনকার সময় কেশব-চন্দ্রের খুব প্রতাপ ছিল। তিনি বহু স্থানে বক্তৃতা দিতেন। (তখনকার সময় ধর্ম্মান্দোলন চলছিল। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ অপর দিকে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দস্বামী ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখান। অনেক কিশোর যুবক ছাত্র ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন)।

একদিন শনিবার ঠাকুর কেশব সেনকে বল্লেন, 'ভগবানের যদি বিভূতি না থাকে তাহ'লে কি বলবে ভগবান নেই? বাপের বিষয় যদি ছেলে না পায় তা ব'লে কি ছেলে বাপ বলবে না, না বিষয় নেই বা ছিল না বলবে'? পরদিন রবিবার আমাদের পাড়ায় কতক লোক এসে প্রচার করলে যে শুনেছেন, কেশব বাবুর মাথা কাটা গেছে। কিনা, দক্ষিণেশ্বরে 'পরমহংসের কাছে তিনি অনেক বিষয় হেরে এসেছেন। তখন সকলে বুঝলে যে কেশববাবুকে যখন হারিয়ে দিয়েছে

LIBRARY

তখন সে যেসে লোক নয় হে। তখন থেকেই ঠাকুরকে 'পরমহংস মহাশয়' বলতে স্বরু করলে। ঠাকুরের গা থেকে একটা কি বেরুতো।

একজন। কি জ্যোতি?

মহিমমহারাজ। না, শক্তি বল আর যাই বল। সে একটা জিনিষ আমরা বেশ টের পেতুম যে আমাদের শরীরে ঢুকেছে। ঠাকুর ঘরের ভেতর বসে আছেন শুধু যে ঘরে ঐ জিনিস হচ্ছে তা নয়। ঘর থেকে বাইরে পর্য্যন্ত যেত আর যারা সেই সময় বাইরে যেত কি থাক্‌ত, তাদের পর্য্যন্ত মন টলে যেত। একেবারে মোহিত হয়ে যেত, একটা নেশায় ধরে থাকতো। এই ভাবটা তিন দিন থাক্‌ত। এতো সকলেই জানতো, যারা সে সময়ের লোক আছেন তাদের জিজ্ঞাসা কোরো। একটা ছেলে ঔষধ আনতে যাচ্ছিল এমন সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঐ শক্তিটা তাকে লাগে, সে এসে বসে পড়ল। ঠাকুরের কথা শুনে, প্রসাদ খেয়ে, যখন যাবে যেন তার মনে হ'ল আমি যে ঔষধ আনতে যাচ্ছিলুম একি হল! আমায় কে ধরে এখানে আন্‌লে, কেনই বা এখানে বসেছিলুম!

একজন। (মহিমমহারাজ)। ঠাকুর কি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতেন?

মহিমমহারাজ। না, তিনি এসে বাইরের দরজার কাছে পাইচারি করতেন। আমার মাথায় হাত দিতেন, আমায় ডেকে

দিতে বলতেন, আমি গিয়ে স্বামীজিকে খবর দিতুম যে ঠাকুর এসে তোমায় ডাকছেন।

লেকচার দিতে বলা।

১১-১২-১৯৩২—২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার চতুর্দ্দশী ১৩৩৯ সাল। বেলা ১২॥টার সময় কমল দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ী গেল। ঘরে একটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

রামলালদাদা। (কমল)। একদিন কোজাগর পূর্ণিমার দিন—সন্ধ্যার সময় কেশববাবু সদলবলে, ঠাকুর, আমি ও ভক্তরা সদলবলে গঙ্গারঘাটে চাঁদনীর চাতালে বেড়াচ্ছি। সেদিন আমি বড় ধামির তুইতিন ধামি মুড়ি কিছু নারকেল ও তালের ফোঁফর এনে বেশ কোরে তেল, নুন, কাঁচা লঙ্কা মেখে সকলকে খেতে দিলুম। ওদিন ওসব খেতে হয় কিনা তাই সকলে বসে বেশ খাচ্ছেন। এমন সময়ে ঠাকুর কেশববাবুকে বল্লেন—কেশব, তুমি আজ কিছু লেকচার দাও, আমরা সকলে শুনি। আহা! দেখ, কেমন এই চাঁদের আলো, সামনে মা গঙ্গা রয়েছেন, কেমন মনোহর শোভা দেখাচ্ছে, বাঃ বাঃ, তুমি কিছু বল, তোমার মুখে আজ কিছু শোনবার সাধ হচ্ছে।

কেশববাবু প্রথমে না, না,—কোরে লজ্জা করতে লাগলেন। শেষে তিনি গঙ্গাঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে আরম্ভ করলেন। ঠাকুর বসলেন, আর আমায়ও বসতে বললেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে আমায় বলতে লাগলেন—'আহা! কেশব বেশ বলছে'।

তারপর কেশববাবু এসে ঠাকুরের পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম কোরে হাত জোড় কোরে বল্লেন—কেমন শুনলেন? ঠাকুর বল্লেন—'বেশ বেশ সত চমৎকার হয়েছে'।

(খৃঃ ১৮৭৫, বেলঘরের বাগানে কেশব সশিষ্য সাধন ভজন করিতেছিলেন। ঠাকুর গিয়া কেশবকে দেখেন, সঙ্গে হৃদয়। বেলঘরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব 28-3-1875, রবিবার—'মিরার' সংবাদপত্রে ঠাকুরের রিষয় কিছু লিখিয়াছিলেন। 1876 January তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন। বিষয়ঃ—'ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি'। কেশব ঠাকুরকে 15-9-1879 সোমবার বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। 14-5-75-১লা জ্যৈষ্ঠ ঠাকুর আবার বেলঘরের বাগানে। Bharat Asram libel suit ending 30-4-75-১৮ই বৈশাখ, কেশব ঐ বাগানে তখনও ছিলেন। 18-2-83-মাঘ, শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র রবিবার। বেলঘরের গ্রামে ৺গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে।

ঠাকুর। (কেশব)। 'আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লেখে খবরের কাগজে লিখে কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়োনা—লোক্, পোক্। যে মুখে ভাল বলছে সেই মুখে আবার মন্দ বলছে। (কথামৃত ৫মভাগ)।

চিত্র ও রঙ্গরস।

(সংযোগ)। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘর। রামলালদাদা, কমল ও প্রবোধ উপস্থিত। একদিন রামলালদাদা দক্ষিণ বারাণ্ডার এসে আমাদের দেখালেন দক্ষিণ দেওয়ালের উপর ঠাকুর কাঠ কওলা দিয়ে একটি টবের উপর পদ্ম ফুলের গাছটি এঁকে ছিলেন। আর ফুলের উপর একটি হাঁস কি পাখী আঁকা রয়েছে। তারপর পার্শের দেওয়ালে এসে দেখালেন—গিরিশ বাবু ও ঐরূপ একটি চিত্র কাঠ কয়লা দিয়ে এঁকে ছিলেন। আমরা দুটি চিত্র দেখেছি। এখন ঠাকুরের আঁকা চিত্রটী দেওয়ালে আছে ও গিরিশবাবুর চিত্রটি পুছে গেছে।

(21-9-1879-কেশব ঠাকুরকে কমল কুটীরে উৎসবে লইয়া যান। ঠাকুর সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্মভক্তসহ তাঁর ফটো তোলা হয়। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হৃদয় ধরিয়া আছেন। 10-12-1881-২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১২৮৮ সাল। ঠাকুর ৺রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী ঠন্ ঠনে্ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে আসেন। (৺রাজেন্দ্র, রাম ও মনমোহনের মেষোমহাশয়)। (২৩, সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে মনোমোহনের বাড়ী, সুরেন্দ্রের বাড়ীর নিকট)। অপরাহ্নে ৬টায় সুরেন্দ্র ঠাকুরকে লইয়া চীনা বাজারে Bengal photographer studio-তে যান। ফটো তোলা হয় ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ)।

(কথামৃত ৫ম ভাগ)।

'টে-কথায় চটা'। পরে, রামলালদাদা বললেন, এই ঘরে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন) কত নামগান, কথা,

রঙ্গরস হয়েছে। ঠাকুর এমন রঙ্গ রহস্য করতেন যে হেসে হেসে পেটের নাড়ী বেদনা হতো। তিনি ভক্তদের বলতেন—"হ্যাঁগা, আমি এসব জানি শুনেছি, দেখেছি, তা কি দোষ হবে"? ভক্তরা বলতেন, না না, আপনি বলুন বেশ ভাল লাগছে।

(সংযোগ)। মহিমমহারাজ একদিন বললেন, ঠাকুর এক দিন ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে খুব হাসি, তামাসা, ঠাট্টা করছেন। আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে বললেন, ওদের দুটো ভাল কথা বলুন। ঠাকুর বললেন, "তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজের এই একটা দোষ, ছেলেবেলা থেকেই হবিষ্যি খাওয়ার ধাত"। কথার ভাবটা এই যে, তোমরা মনের ও জগতের এক দিকটাই দেখছো অপর দিকও যে একটা আছে তাহার কোন উল্লেখই করছ না। তীক্ষ্ণ মেধাবী ব্যক্তির হাসি কৌতুকের ক্ষমতা মনোবৃত্তির একটি বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঠাকুরকে দেখা

ইং ১-১০-১৯৩১—১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ১৩৩৮ সাল। বিকালে কমল রামলালদাদার বাড়ী গেল।

কমল। (রামলালদাদা)। শুনেছিলুম, ঠাকুর নাকি খড়ম পরে খট্‌খট্ করে ঘরে এসেছিলেন?

রামলালদাদা। (কমল)। পঞ্চবটীতে হিরালাল ব্রহ্মচারী নামে একজন মাড়োয়ারি থাকত। তিনি রাত্রি ১০॥০ টার সময় প্রস্রাব করতে উঠে দেখেন যে বকুলতলা হতে কে যেন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, বরাবর ঠাকুরের ঘরের

দিকে যাচ্ছেন। তিনিও পেছু পেছু গেলেন, গিয়ে আর দেখতে পেলেন না। তিনি সেই রাত্রে সমস্ত দোর ঠেলেছিলেন কিন্তু দরজা খোলা পাননি। তার পরদিন, সে সকালে এসে আমায় বললে যে, কাল রাত্রে একজন খড়ম পরে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর বকুলতলা ঘাট হতে এই টাকুর ঘরে এলেন, আমি তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, তিনি কোথায় জানেন ? আমি তাকে বললুম, ঠাকুরের আজ জন্মতিথি দ্বিতীয়া, তিনিই ঠাকুর ঘরে এসেছিলেন।

রামলালদাদা দুইটী গান গাইলেন—'আমার জাতি গিয়াছে'। 'ভেবেমরি কি সম্বন্ধ'। রামলালদাদা। (কমল)। তুমি একটা গাও শুনি। কমল গাইল—'তোমার প্রেম পাথারে যে সাতারে'। কমল। (রামলালদাদা)। আবার শুনেছিলুম ঠাকুর আপনাকে বলেছিলেন, আমি সর্ব্বদা এখানে আছি, তুই কেন ভাবিস্ ?

রামলালদাদা। ঠাকুর যখন ৺বলরাম ভবনে কি কাশী-পুরে গিয়ে থাকতেন তখন বলেছিলুম, আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন করবে। তিনি শুনে বলেছিলেন, "তুই মনে করবি যে আমি যেন কলকাতায় গেছি, কি ঝাউ-তলায় শৌচে গেছি, আবার আসব এই ভাববি, তাহলে মন কেমন করবে না"।

রামলালদাদা। তাই, সেই অবধি মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর এখান থেকে চলে গেছেন। সর্ব্বদাই মনে হয় তিনি রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই।

দেশে যাওয়া হল না

১৩-১১-১৯৩১—২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার চতুর্থী ১৩৩৮ সাল। কমল বেলা ৪॥০টার সময় দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামলালদাদা বললেন :—

রামলালদাদা। (কমল)। দেশ হতে (কামারপুকুর) এসে ঠাকুরের কাছ থেকে ঠাকুরের সেবা করতুম। তারপর কয়েক মাস পরে ঠাকুরের কাছে যখন ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসতে সুরু করলেন, তখন একদিন ঠাকুরকে বলেছিলুম, আমি অনেক দিন দেশে যাইনি, একবার মনে করছি দেশে গিয়ে ধান, জমি; খাজনা এ সবগুলো দেখে শুনে আসি আপনি কি বলেন? ঠাকুর শুনে বললেন, "তুই যাবি ত বলছিস, কিন্তু আমায় কে দেখবে?" আমি বললুম, কেন ভক্তরা ত এইবার আসা যাওয়া করছেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে রাত্রিতে থাকেন তারা দেখবেন। আর আমি ত বেশী দিন থাকব না, কাজ হয়ে গেলেই চলে আসব। ঠাকুর শুনে বললেন, "তাত আসছে কিন্তু ওরা কি আমার ধাত জানে যে সেবা করবে? তুই যেমন করে করবি তাকি ওরা তেমন করে করতে পারবে? কে জানে বাবু"।

তারপর দিন সকালে ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি, ঠাকুরের মুখ হাত ধোয়ার পর ফের ঠাকুরকে বল্লুম যে, আদেশ করুন আমি দেশে একবার যাই। তিনি একটু ভেবে বললেন "না তোর যাওয়া হবে না, মায়ের ইচ্ছা নয় যে আমাকে

ফেলে এখন যাস"। আমি বল্লুম, দেশে যাবার জন্যে যে প্রস্তুত হয়ে আছি, একবার খাজাঞ্চী মহাশয়ের কাছে গিয়ে ছুটি নিলেই হয়।

এই কথা শুনে ঠাকুর আঙ্গুল দিয়ে শূন্যে একটি গোল চক্রের মত কোরে তার মধ্যে হিজিবিজি কি লিখলেন, পরে আমায় বোললেন, "ওরে রামলাল, তোর কোন মতেই যাওয়া হবে না।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পাঁচালী ও পাঁচটি ছবির বর্ণনা

৯-১১-১৯৩০—২৩শে কার্ত্তিক, রবিবার তৃতীয়া ১৩৩৭ সাল।

সকালে কমল ও নন্দ (শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রামলাল দাদার শিষ্য তাহার পুত্র) রামলালদাদার বাড়ী গেল। রামলালদাদা ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী পড়ছিলেন।

রামলালদাদা। (কমল)। এই বইতে কি সুন্দর গান ও কথা আছে, তুমি পড়েছ? কমল। আজ্ঞে না। রামলালদাদা। "হরিতকি চার অক্ষরে, শেষদ্বয় ত্যাগ কোরে ব্যবহার করিবে দিবানিশি"। ঠাকুর দাশরথি রায়ের গান খুব পছন্দ করতেন 'একি বিকার শঙ্করী'। 'দোষ কারু নয় গো মা'। তা ছাড়া অনেকেই এসব গান ও কথা পছন্দ করেন। ঠাকুর শুনে বলতেন, "আহা! কি গান ও ভাব, ভাবই আসল জিনিষ। কুলোর যেমন স্বভাব খারাপটি ফেলে ভালগুলি কোলের দিকে টানে"। কি জান বুঝদার হওয়া

চাই, ভাব চাই, 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয় যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়'। (কমল দাদার পদ সেবা করিতে লাগিল)।

নন্দ। (রামলালদাদা)। ঠাকুর ঘরে ধ্রুব প্রহ্লাদের যে ছবি আছে এমন আর বাজারে দেখতে পাই না, বেশ সুন্দর ভাব।

রামলালদাদা। (নন্দ)। ঠাকুর একদিন সীতির বেণীমাধবকে বোলেছিলেন, "আমায় কিছু ভাল ভাল ছবি এনে দিতে পার"? রামলালদাদা। তা বেণীমাধব আমায় বোলেছিলেন, আমি ছবি দোব তুমি এনে দিও। আমি পাঁচটি ছবি আনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গৌরাঙ্গের, জগন্নাথের ও কমলে-কামিনী। কমলেকামিনী ও জগন্নাথের ছবি দুটো দেশে (কামারপুকুরে) আছে। (রামলালদাদা আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা কোরলেন। আমরা মন্দিরে এসে প্রসাদ পেয়ে ৩টার সময় কলকাতা যাত্রা করলুম)।

(সংযোগ)। ১৩ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪০ সন। দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের ঘরে রামলালদাদা, কমল, হরিবাবু (পর্ব্বত) ও ছুনিবাবু উপস্থিত।

হরিপর্ব্বত। (রামলালদাদা)। ঠাকুরের সময়কার ছবি গুলো ছিড়ে যাচ্ছে, ভাল কোরে বাঁধিয়ে দিলে হয় না?

রামলালদাদা। বেশ ত, তা যদি হয় ত খুব ভাল হয়।

কমল। (রামলালদাদা)। আমার মনে হয় ঠাকুরের সময়কার ছবিগুলি যেখানে যেমন ঠাঙ্গান ছিল ঠিক সেইখানে থাকলে ভাল হয়। আর অন্য ছবিগুলো এখন যারা দিয়ে গেছেন সেগুলো আপনাদের বাড়ী রাখলে কেমন হয় ?

রামলালদাদা। আমি হরিহরকে (রামলালদাদার ছোট ছেলে) ও জগুকে (রামলালদাদার মধ্যম ছেলে) কতবার ঐ কথা বোলেছি। যে ঠাকুরের সময়কার ছবি গুলি রেখে অন্য গুলো বাড়ী নিয়ে রাখ। (রামলালদাদা এইবার ছবিগুলির বর্ণনা করছেন।

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুর সুরেশমিত্রকে বোলেছিলেন, আমায় ভাল কালীর ছবি এনে দিতে পার ? সুরেশবাবু একদিন কালীর ছবিতে শ্মশান, মড়া, ছেড়াকাথা, হুঁকো, ডাকিনী-যোগিনী সব চিত্রে আঁকা ছিল, আর মূর্ত্তিটি খুব উগ্র ছিল। ঠাকুর দেখে বল্লেন, "সুরেশ, এ ছবি খুব চমৎকার আঁকা হয়েছে, তবে এতটা এসব থাকা বিশেষতঃ গৃহী লোকের ঘরে থাকা ঠিক নয়, দেখলে ভয় করে। আচ্ছা ওসব একটু পুছে দিলে হয় না ? তাই কোরে এনে দিও।" সুরেশবাবু একদিন তাই পুছে আনলেন।

আর ক্ষেমঙ্করী, (অর্থাৎ শিবের কোলে কালী বসে) দেখে ঠাকুর বোললেন, "বাঃ বেশ হয়েছে। মা এই ঘরে থাক, আর (অর্থাৎ ঠাকুরের ঘরে) মন্দিরে যেয়ে খেও।"

আমায় বোলেছিলেন, "ছাখ, কালীপূজার দিন মার ছবিটি কালী ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সে দিন অনেক কিছু খাবে। আমি কালী ঘরে পূজার দিন মার খাটের কাছে রেখে দিতুম। এখন ঐ ছবি বেলুড়মঠে পুরান ঠাকুর ঘরের হলে রাখা আছে দেখে এসেছি।

ঠাকুর ভবনাথকে বোলেছিলেন, "তুমি আমায় নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন ছবি এনে দিতে পার"? আমায় বোলেছিলেন, "ওরে রামলাল, ওকে হুটো টাকা দেত যা দাম লাগে এনে দেবে"। আমি দিলাম। ঐ ছবির দাম লেগেছিল ১৷৶০ এক টাকা নয় আনা।

যমুনা পুলিনে ছবিটী রাখালমহারাজ এনে দিয়েছিলেন। ঠাকুর দেখে বোলেছিলেন, বাঃ রাখালের কি পছন্দ। রাধিকা কোমরে হাত দিয়ে যেন বাঁশরী কারতে যাচ্ছে।

শ্বেত পাথরের সরপোষ, গেলাস, পাথরের জৈন বুদ্ধ মূর্ত্তিটি পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়ণী দিয়েছিলেন।

নেপাল রাজ-প্রতিনিধি কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত মৃন্ময় গণপতি মূর্ত্তি।

কেশব চন্দ্র সেন প্রদত্ত যীশুখৃষ্টের ছবি। আর মহেন্দ্র নাথ পাল প্রদত্ত যশোদাগোপাল ও ষোড়শী।

কমল পরে ছাখে কথামৃতেও আছে, যে শিকদার পাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ষড়ভূজ মূর্ত্তি অহল্যা পাষানীর পট। জগন্নাথ। রাধাবল্লভ,

নিত্যানন্দ অদ্বৈব ভক্ত। শ্রীরাম লক্ষণ বিশ্বামিত্র। শ্রীগোপাল যশোদা।

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম ভ্রমণ

ইং ১০-৯-১৯৩১—২৪শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর, রামলালদাদার বাড়ী। বৈকাল বেলা।

রামলালদাদা। (কমল)। চল তোমায় একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি, ঠাকুর যে সব জায়গায় যেতেন। কমল দাদার সহিত গেল। রামলালদাদা। এই দেখ নবীন নিয়োগীর বাড়ী ঠাকুর ও আমি এসে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনেছি। এই মোড়লদের বাড়ী, ঠাকুর এসে 'ঝুমুর গান' শুনেছিলেন। এই নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী, ঠাকুরকে এরা প্রায়ই নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াতেন। ঠাকুর বহুবার এসে খেয়েছেন। আর বলতেন, "আহা! কি রান্না! প্রত্যেক জিনিষ গুলি যেন ওজন কোরে রেঁধেছে"। রামলালদাদা। বাস্তবিক অতি চমৎকার জিনিষ হত, নবকুমার বাবু প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসতেন। নবকুমার বাবু আর ঈশান মুখোজ্যে, এই দুইজনকে দেখেছিলুম ব্রাহ্মণের মধ্যে নিষ্ঠাবান্ ও ভক্তিবান্।

ধুমধাম বর্ণনা

৩১-১০-১৯২৯—১৪ই কার্ত্তিক, কালীপূজা বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ সাল। কমল সকালে রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। আগে কালীপূজোতে দক্ষিনেশ্বর কালী বাড়ীতে কত আলো দেওয়া হত, যাত্রা হত। নানাবিধ খাবার

কত কি হয়েছে, আজকাল ত সে রকম কিছুই হয় না। নহবৎ বাজতো, গঙ্গার ঘাটে এমন আলো সাজানো হতো, যে একটুও ফাঁক থাকত না। একেবারে দিনের মত দেখাতো। নাট মন্দিরে ভাল ভাল যাত্রার দল এসে সমস্ত দিন ধরে যাত্রা করত। বড় বড় লুচি হত, কচুরি, নানারকম ভাজা তরকারি দই, মিষ্টি, পায়েস ইত্যাদি। যে আস্‌ত সে পেট ভরে খেত তারপর আমি চাঙ্গারি কোরে বয়ে কত খাবার লোকদের দিয়ে আসতুম। ঠাকুরের সময় যে রকম আনন্দ হয়ে গেছে, সে রকম আর হবে না বলে মনে হয়।

রামলালদাদা। (কমল)। তুমি কি আজ থাকিবে? কমল। মনে করছি আজ থেকে সারারাত মায়ের নাম গাইব। রামলালদাদা। সারারাত জেগে হিম লাগান, মোশার কামড়, এসব আমি পছন্দ করি না।। ঠাকুর বলতেন, "কার্ত্তিক মাসের হিম বড় খারাপ, শালার হিম পাষাণ ভেদ কোরে দেয়।"

সাইনবোর্ড

ইং ৯-১১-১৯৩১—২৩শে কার্ত্তিক কালীপূজা, সোমবার ১৩৩৮ সাল। সকালে কমল দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। (কমল)। ৺যদু মল্লিকের বাগানে বড়-দিনের সময় খুব ভোজ হত। তিনি বহু বড় বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করতেন। একদিন বৈকালে অনেক জন মা কালীর মন্দির দর্শন কোরতে এল। বেশ সাজ-সজ্জা পরা, পায়ে জুতো, তারা প্রথমে তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ক্রমে মার মন্দিরের উপর এসে

দর্শন করতে লাগল। ঠাকুর ঘরে বোসেছিলেন আর হৃদয়দাদা ঘর হতে যেই চাঁদনী পর্য্যন্ত এসেছেন অমনি ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে তাকে ডেকে বোললেন, "তোর এখন ওখানে যাবার দরকার নেই তুই এখানে বস। দেখছিসনি ওরা সব জুতো পরে এসে দাঁড়িয়েছে কত কি বোলবে।"

ত্রৈলক্ষ্যবাবু ঐ সব দেখে শুনে খুব চটে গেলেন, তাদের খুব বোললেন। তারা বোললেন, 'মহাশয়, আপনাদের ত কোন সাইনবোর্ড নেই যে জুতো পরে ভিতরে এস না বা মুসলমান কি খৃষ্টান মন্দিরে আসতে পারবে না' ইত্যাদি। তারপর ত্রৈলক্ষ্যবাবু ঐ সব শুনে সাইনবোর্ড কোরিয়ে ঝুলিয়ে দেন। তাই আজকাল কেউ মন্দিরে জুতো পরে যায় না।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রসদ্দার দেখান

দক্ষিণেশ্বর, ইং ৮-১০-১৯৩১—২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার একাদশী, ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় লম্বা বারাণ্ডায়, রামলালদাদা, কমল ও ভক্তগণ বোসলেন।

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুর একদিন টাকা মাটি, মাটি টাকা, বিচার কোরে, গঙ্গায় ফেলেন। পরক্ষণে দুঃখিত মনে মার মন্দিরে গিয়ে মাকে জানান, যে মা আমি ত ঐ কোরে বসলুম। কিন্তু যদি মা লক্ষ্মীর কোপে পড়ি, তিনি যদি খ্যাট বন্ধ কোরে দেন ত কি হবে মা, আর আমায় কে খাওয়াবে, দেখবে ?

ঠাকুর আমায় তারপর বোলেছিলেন, "ওরে রামলাল, মার কাছে গিয়ে ও সব বললুম। মা শুনে বললেন, "তুই লক্ষ্মীর কোপে পড়বি ত কি বয়ে গেল, তোর ভয় কি এই ত্থাখ, এরা তোর রসদ্দার হয়ে খাওয়াবে দেখবে"। এই বোলে মা দেখালেন। "দেখলুম মার চারিদিকে স্ফুট উঠছে। তাতে মথুর, বলরাম, সুরেন্দ্র, কেশব আরও কত রে। এরা এক একজন মায়ের চারিদিকে হাততালি দিয়ে বলছে, "জয় কালী মহাকাল, জয় শিব মহাকাল"। তারপর সকলে একে একে লীন হয়ে গেল। তারপর দেখলুম, সব সাদা সাদা চেহারা, (অর্থাৎ সাহেব মেমরা) তা তাদের আর দেখা হলনি, তুই যদি বেঁচে থাকিস, ত পরে কত দেখতে পাবি"। তা দেখনা ঠাকুর থাকতে মথুর বাবু ঠাকুরের প্রতি কত কোরেছিলেন। ঠাকুরের যখনই যে জিনিষটার দরকার হয়েছিল, মথুরবাবু অমনি সেটা পূরণ কোরে দিয়েছিলেন।

রাণীরাসমণির ত অত বিষয় ছিল। একদিন, মথুরবাবু ঠাকুরের কাছে এসে বোললেন, 'বাবা আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমি আপনার নামে লিখে দিতে চাই'। ঠাকুর শুনে বোললেন, "না না, আমি নিয়ে কি করবো"। মথুরবাবু শুনে বোললেন, 'আপনি যদি না নেন ত আমি মার নামে (অর্থাৎ ঠাকুরের মা) সমস্ত বিষয় লিখে দিচ্ছি। ঠাকুর শুনে বোললেন, "না, সে একই কথা হল, টাকা বিষয় এ সব থাকলে মনে হবে আমি বড় লোক, জাঁক-গুমর আসবে, ওসব আমি পছন্দ কোরি না"।

তারপর দেখ, বলরাম, কেশব, সুরেন্দ্র এরাও ঠাকুরের প্রতি কত কোরেছিলেন। আর আজকাল দেখছি কত সাহেব, মেম ঠাকুরের ভক্ত হয়েছেন। স্বামিজী বিলাতে গিয়ে লেকচার দিয়েছিলেন তাই কত বড় বড় ধনীলোক স্বামিজীর ভক্ত হয়েছেন, আর বহু বিষয় সাহায্যও করছেন।

মিতব্যয়ীতে কাজ

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। বর্ষার সময় ঠাকুরের পেটের অসুখ হ'ত, তখন তিনি কেবল মাছের ঝোল কি শুক্ত দিয়ে ভাত খেতেন। একদিন আমি ও হৃদয় দাদা ঠাকুরের ঘরে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে শুতেন) শুয়ে আছি অর্দ্ধেক রাত্রে উঠে দেখি, ঠাকুর দিগম্বর হয়ে তরকারি (কূটনো) কূটছেন। মশলা, চাল ইত্যাদি সব যোগাড় কোরে রেখে দিচ্ছেন। হৃদয় দাদা এই সব দেখে ঠাকুরকে বোল্লে উঠলেন, 'তুমি ত বেশ, ঘুম নেই, ওসব কাজ কি সকালে হয় না? আমরা ত রয়েছি, সকালে কোরে দোব আখন, তুমি এখন শোওগে। আর তোমার এ সব কাজ দেখে হাসি পাচ্ছে, ঠিক একটা লোকের মত অল্প স্বল্প জিনিষ যোগাড় কোরে রাখছ। যা চাল নিয়েছ তা দেখছি খুবই কম,. তুমি যা তরকারি কূটেছ, এ সব বোধ হয় একটা লোকেরই পেট ভরা হবে না, তা তোমার কেমন করে হবে? তুমি আচ্ছা কিপ্পন যা হোক, জ্বালালে বাবা'। ঠাকুর এই সব শুনে বললেন, "দেখ ঘুম ভেঙ্গে গিছিল তাই প্রথমে বোসেছিলুম, তারপর ভাবলুম বোসে বোসে আর কি

করবো, বরং ওসব কাজ করে রাখি তাই—যারা আমার পেটের আটকোল জানে না, তারা ওসব জিনিষ বেশী বেশী কোরে কোরবে হয়ত কিছু কিছু অপচয়ও কোরবে। আর আমি ওসব কাজ কোর্ছিলুম সাধে? ছাখনা, সব খাবার সময় দেখেছি (অর্থাৎ কালী বাড়ীর কর্ম্মচারীরা যখন খেতেন) পাতে কত কত তরকারি ফেলে দেয়"।

"আহা! এই ভারতের জন্যই ত তুই কুলীন বামুনের ছেলে হয়ে কোথা শিউড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বরে এসে ছুটো ভাত ও পয়সার জন্যে এদের এখানে (অর্থাৎ রাসমণির কালী বাড়ীতে চাকরি করতে এসেছিস। আজ যদি দেশে ধানের জমি, টাকা, পয়সা তোর বেশ সচ্ছল থাকত তাহলে কি তুই এখানে এসে চাকরি করতে আসতিস? আর কি জানিস, খুব মিতব্যয়ী হতে হয়, তা না হলে লক্ষ্মীছাড়া হতে হয়। হৃদয় দাদা এই শুনে ঠাকুরকে বললেন, হ্যাঁ, তা' ত বটেই, তাই আপনার পাতে ১০০টা ভাতের দানা ছাড়া বোধ হয় ১টীও বেশী পড়ে থাকতে দেখি না'।

ঠাকুর একদিন সকালে একজনকে একটি দাঁতন কাটি আনতে বোললেন। সে ২৷৩টে গাছের ডাল ভেঙ্গে আনে, ঠাকুর একটি নিয়ে তাকে বোললেন, "শালা, তোকে একটা আনতে বোললুম তুই এত আনলি কেন? যাহোক, রেখে দে"। সে রেখে দিলে। তারপর ছুদিন পরে সকালে আবার তাকে বোললেন, "ওরে একটা দাঁতন দেনা"। সে এই কথা শুনে

ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে, ঠাকুর তাকে বললেন, "ওরে কোথা যাচ্ছিস"? সে বোললে, "আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙ্গে আনতে যাচ্ছি"। ঠাকুর তাকে বোললেন, "সেদিন যে কয়েকটা এনেছিস, তোকে রেখে দিতে বোলেছিলুম যে, ছাখদিকিনি।" সে খুঁজে বোললে, হ্যাঁ আছে আছে। ঠাকুর শুনে বোললেন, "না দেখে অমনি ছুটে আনতে যাচ্ছিস যে? ও গাছ কি তুই সৃজন কোরেছিস? মনে কোরলেই টপ কোরে কিছু ডাল ভেঙ্গে আনলেই হল, যাকে সৃজন করতে হয় সেই জানে। তো শালার একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, জেনে রাখ, বুঝে সুজে কাজ করতে হয়, কোন জিনিষের অপচয় করতে নেই"।

শ্রীশ্রীমার কথায় আছে, "কোন জিনিস নষ্ট করা ঠিক নয়। তরকারির খোসা গরুর প্রাপ্য। যার যা প্রাপ্য তা হতে তাকে বঞ্চিত করা ভাল নয়।"

বুনি। (স্বগত)। তাই দেখি, রামলালদাদাকে খুব মিতব্যয়ী হয়ে কাজ করেন। এমন কি রাত্রে যতবার বিড়ি খান, ততবারই পোড়া দেশলাইয়ের কাটি নিয়ে লণ্ঠন হতে বিড়ি ধরিয়ে নেন। তবুও একটি দেশলাইয়ের কাটি খরচ করেন না। আর মাষ্টার মহাশয়কেও দেখেছি তিনি খুব মিতব্যয়ী হয়ে কাজ করতেন। মিতব্যয়ী অর্থে এই বোঝা যায় যে আমাদের যে কোন জিনিষের যতটা দরকার হবে ঠিক ততটা নোব, কম বা বেশী নোব না। যদি এক পয়সায় হয়ে যায় ত দেড় পয়সা খরচ কোরবো না। যদি কেউ জিনিষের দাম বলে ৪ পয়সা, আমি

২ পয়সায় সেটা কিনতে চেষ্টা কোরব। মোটকথা, কোন জিনিষের অপচ্ কোরবো না বুঝে শুজে খরচ করা। অপচ্ কোরো না, অভাবও হবে না।

দু'জনের ঝগড়া

১৩-১১-১৯৩১—২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার চতুর্থী ১৩৩৮ সাল। কমল বেলা ৪॥০টার সময় রামলালদাদার বাড়ী গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামলালদাদা বোল্লেন।

রামলালদাদা। (কমল)। আহা! হৃদয়দাদা ঠাকুরের খুব সেবা কোরেছেন।

ঠাকুর বোলতেন, "যে এমন সেবা বাপ মাও কোরতে পারে না"।

কমল। (রামলালদাদা)। আবার খুব যন্ত্রণাও দিয়েছেন শুনি।

রামলালদাদা। হ্যাঁ, সে সব ঝগড়া দেখবার ছিল।

যখন ঠাকুর হৃদয়দাদার উপর রেগে যেতেন তখন হৃদয়-দাদাকে যা তা গালাগালি দিতেন, সে সব মুখে আনা যায় না। হৃদয়দাদা সে সময় চুপ কোরে থাকতো আর মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে বলত, 'আঃ কি কর মামা, ওসব কথা কি বোলতে আছে, আমি যে তোমার ভাগনা। ঠাকুর সামনে যা পেতেন ঝাঁটা, জুতো, অমনি সপাসপ কোরে লাগিয়ে দিতেন। এইসব ব্যাপার দেখে আমি ভাবতুম, এইবার বুঝি দু'জনে ছাড়াছাড়ি বা আড়ি হয়ে যায়। কিন্তু তা হত না, পরক্ষণে

আবার দু'জনের ভালবাসা, কথা, ইয়ারকি চলতো। আবার হৃদয়দাদা যখন ঠাকুরকে কিছু বলতেন, তখন তিনি চুপ কোরে শুনতেন।

ঠাকুরের পথে সমাধি

২১-৪-১৯৩১—৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৩৮ সাল। কমল ভোরে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে গঙ্গাস্নান কোরে ৭টার সময় রামলালদাদার বাড়ী গেল। রামলালদাদা তিনতলা ছাদের উপর ছিলেন, কমল গিয়ে দেখল, রামলালদাদা একটি ছোট লাল পেড়ে কাপড় পরে, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। রামলালদাদা ভাবস্থ হয়ে গঙ্গা মুখ করে দাঁড়িয়ে স্তব কোরছেন, 'অসীতগিরি সমস্যাৎ' ইত্যাদি। তারপর বোববম্ বোববম্ কোরে গাল বাজাচ্ছেন, একটু পরে কমলের হাত ধরে মা কালীর মন্দির ও গঙ্গা দেখালেন। রামলালদাদা। কেমন আছ, কখন এলে? কমল। ভাল আছি, এই গঙ্গাস্নান কোরে মন্দির হতে আসছি। রামলালদাদা। একটু বসি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি পা টা ব্যথা কোরছে। আচ্ছা তুমি নিচে গিয়ে বোস, আমি একটু পরে যাচ্ছি। রামলালদাদা এসে কমলকে সিঁন্দুর ও দ্বারকা তীর্থের প্রসাদ দিলেন। কমল রামলালদাদার পা টিপতে আরম্ভ করল।

রামলালদাদা। একদিন ঠাকুর ও আমি কলকাতা থেকে গাড়ি কোরে আসছি। এমন সময়ে যেই বরাহনগরের চৌমাথায় গাড়ী এল অমনি তিনি বোলে উঠলেন, "হ্যাঁরে,

এটা কি বরাহনগর ?" আমি বোললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বোললেন, ছাখ "পেটটা যেন খিদেয় জ্বালা কোরছে, তোর কাছে (আঙ্গুল নেড়ে দেখিয়ে) আছে ত ?" রামলালদাদা। আমি বুঝতে পেরেছি যে পয়সা, আমি বোললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ আছে বই কি। আমার কাছে টাকা, পয়সা রেখে দিতুম, কি জানি কখন কি দরকার হয়। হয়ত বোলে উঠতেন, "দেতোরে একে তু'আনা পয়সা, আহা ওর বড় কষ্ট খেতে পায় না" ইত্যাদি। ঠাকুর বোললেন, "কিছু কচুরি ফাগুর দোকান থেকে আনদিকিন।" আমি বোললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ যাই, আপনি বসুন, আমি শিগগীর আন্‌ছি। এই বোলে আমি চলে গেলুম। ফাগু বেশ যত্ন কোরে এক গ্লাস জল ও পান দিত।

তারপর খাবার এনে দেখি ঠাকুর গাড়ীতে নেই; কোচমানকে জিজ্ঞাসা করলুম, বাবু কাঁহা গিয়া হ্যায় ? সে বললে, বাবু ত অনেকক্ষণ হল নেবে সোজা চলে গেছেন। আমি খাবার রেখে দৌড়ে ছুটে গেলুম, দেখি ঠাকুর আপন মনে হন্ হন্ কোরে চলে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বললুম, কোথায় যাচ্ছেন চলুন, গাড়িতে খাবার এনেছি। আমি যতই তাঁকে বোলছি তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। শেষে তাঁর হাত ধরে বোললুম, কোথায় যাচ্ছেন একা ? ফিরে চলুন। ঠাকুর বোললেন, "এ্যাঁ এ্যাঁ, তুই কে"। তারপর তুটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আর মাথার ব্রহ্মতলায় চাপড়ে প্রকৃতিস্থ হলেন। পরে হেসে বোললেন, "ছাখ,

তোকে একটা কথা বোলে রাখি মনে রাখিস, তুই যখন আমায় ফেলে কোথাও যাবি তখন আমায় জিজ্ঞাসা কোরবি, যে আমি যাচ্ছি, আপনি বোসে থাকবেন কোথাও যাবেন না, যতক্ষণ আমি না আসি। আমি যদি কিছু মত দি তবে জানবি, তা না হলে এই রকম হবে জেনে রাখ।"

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুরের সমাধির বিষয় একটু বলুন না।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুরের চক্ষের চাউনি ছিল অর্দ্ধ শিবনেত্র, সোজা দৃষ্টি, যেমন ফটোতে দেখা যায়। চক্ষের কোণ দিয়ে আনন্দাশ্রু খুব গড়িয়ে পড়ত। প্রথমে গড়িয়ে গোঁফে তারপর দাড়িতে তারপর বুকে পড়ে ভেসে যেত। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর বহু সময় দেখা যেত তিনি মুখ ভঙ্গী কোরে (দেখিয়ে) কত রকম কথার ভাষা বোলতেন, "ক, কা, কি, কু," ইত্যাদি। ওসব বিষয় কেউ কিছু বুঝতে পারত না।

পঞ্চম অধ্যায়: নীলপদ্মে দুর্গা দর্শন

১১-১২-১৯৩২---২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার চতুর্দ্দশী ১৩৩৯ সাল। কমল বেলা ১২৷৷০ টার সময় রামলালদাদার বাড়ী গেল। ঘরে একটী ভক্ত বোসে আছেন।

কমল। (রামলালদাদা)। শুনেছিলুম পদ্মফুলের উপর ঠাকুর দেবী দর্শন কোরেছিলেন? রামলালদাদা। হ্যাঁ, একবার কেশব-

সেনের সঙ্গে ষ্টিমারে কোম্পানীর বাগানে (ইডন গারডেনেতে) বেড়াতে যান। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, বহু নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। তারমধ্যে একটি মস্ত বড় নীল পদ্মের উপর গণেশ-জননী (মা দুর্গা) রয়েছেন। মা ডান পা টী ঝুলিয়ে আর বাঁ পা টী ডান পায়ের উপর রেখে গণেশকে কোলে নিয়ে বোসে আছেন। আর মধ্যে মধ্যে বড় পদ্ম ফুলটী দুলছে। ঠাকুর এইরূপ কমলে-কামিনী দর্শন কোরে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

কমল। আপনি কি সে সময় তথায় ছিলেন? রামলালদাদা। না, ঠাকুর ওসব দেখে এসে আমায় বোলেছিলেন, "ওরে রামলাল কি সুন্দর দেখে এলুম তোকে আর কি বোলব পারিস ত তুইও একবার দেখে আসিস্"। কমল। আপনি দেখতে গিয়েছিলেন? রামলালদাদা। হ্যাঁ, পরে গিয়েছিলুম কিন্তু ঠাকুর যেমনটী দেখেছিলেন, তেমনটী আর দেখতে পেলুমনি।

কমল। (রামলালদাদা)। আর একটি শুনেছি যে, ঠাকুর কুক্‌সাহেবের সঙ্গে জাহাজে কোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন? রামলালদাদা। হ্যাঁ, একদিন কেশব বাবু ষ্টীমারে সদলবলে এসে ঠাকুরকে বোললেন, 'ষ্টীমারে কুক্‌সাহেব বোসে আছেন, তিনি খুব পণ্ডিত ও ভক্ত। চলুন না একটু ষ্টীমারে আপনাকে বেড়িয়ে আনি'। ঠাকুর শুনে বোললেন, "বেশত চল"। আমায় বোললেন, "ওরে রামলাল তুইও চলনা, একটু বেশ বেড়িয়ে আসবি"। আমি ও ঠাকুর ষ্টীমারে চড়ে বেড়াতে গেলুম। কেশববাবু কুক্

সাহেবকে ইংরাজি কোরে ঠাকুরের সব পরিচয় দিতে লাগলেন। তিনি শুনে মধ্যে মধ্যে হাসতে লাগলেন।

ষ্টীমার যখন বড়বাজারের পোলের কাছে এল, তখন ঠাকুর কেশববাবুকে বোললেন, "কেশব, খিদে পেয়েছে, কি খাই বল-দিকিনি"? কেশববাবু বোললেন, কি খাবেন বলুন, যা খাবেন তাই এনে দিচ্ছি। ঠাকুর বোললেন, "আচ্ছা গরম গরম জিলিপি আনাহোক। তুমি যেওনা, রামলাল যাক"। আমায় বোললেন, "রামলাল তুই গিয়ে সব আন"। আমি গিয়ে গরমগরম জিলিপি, ছাঁচি পান, তামাক, টিকে, কলকে, হুকো সব আনলুম। তারপর ঠাকুর বোললেন, "গঙ্গা হতে জল তুলে বেশ করে জায়গাটা (ষ্টীমারের ভিতর একটি জায়গায়) ধুয়ে সব জিনিষ গুলো রাখ"। আমি তাই কোরলুম। ঠাকুর খাবার খেয়ে তামাক খেলেন। পরে আমায় বোললেন, দেখ এ গুলো করা হল কেন জানিস? দিনু খাজাঞ্চী (কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী কাজ কোরতেন) দেখেছে যে আমি কেশবের সঙ্গে ষ্টীমারে বেড়াতে যাচ্ছি, হয় ত মনে কোরবে যে, আমি ওদের হাতে খাব। কত কি মনে কোরবে তাই তোকে ও সব কোরতে বোললুম"। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল ঠাকুরকে ষ্টীমার হতে যখন নাবান হল তখন তিনি সমাধিস্থ। একটী গাড়ী করা হল, তিনি টলতে টলতে গাড়ীতে উঠলেন, আর সাহেবরা ফিস্ ফিস্ করে হেসে কেশববাবুকে কি বোলতে লাগলেন। আমি কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা কোরলুম ওরা হাসছেন কেন? কেশববাবু বোললেন 'ওরা

LIBRARY
No. . . ..
Ashram

বললে যে বাবুকে কি এত বেশী খাওয়াতে হয় (অর্থাৎ মদ) যে হুঁস নেই। আমি বোললুম তাদের যে, উনি মদ খাননি উনি ভগবৎ নামে মাতোয়ারা হয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন, তাই টলছেন'। তারা শুনে সব অবাক হল।

আমি ঠাকুরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা কোরলুম। তারপর ঠাকুরের সমাধিভঙ্গের পর, আমি তাঁকে বোললুম যে আপনার টলা দেখে সাহেবেরা খুব হাসছিলেন। ঠাকুর শুনে বোললেন, "বটে" আর হাসতে লাগলেন। গাড়ী যেই বরাহনগরের চৌমাথায় এল ঠাকুর বোললেন, "দেখ খিদেয় পেটটা জ্বালা কোরছে, তোর কাছে (হাত নেড়ে) আছে ত" ? আমি বোললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বোললেন, "তবে কিছু হিংয়ের কচুরী ফাগুর দোকান হতে আনদিকিনি।" আমি বোললুম, আপনি, বসে থাকবেন ত ? আমি না আসা পর্য্যন্ত ? এই কথা তিনবার বোললুম। তিনি হেসে বোললেন, "না না না, তুই শীগগির আন"। তারপর ঠাকুর খাবার খেয়ে যাত্রা কোরলেন!

দক্ষযজ্ঞ দেখা

দক্ষিণেশ্বর, ইং ৮-১০-১৯৩—২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার একাদশী ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা, কমল ও ভক্তগণ লম্বা-বারাণ্ডায় বোসলেন।

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। একদিন গিরিশবাবু (৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ) ঠাকুরের কাছে এসে বোললেন, 'আজ আমাদের থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ বই প্লে হবে, আপনি দয়া করে

শুনতে যাবেন কি? ঠাকুর শুনে বোললেন, "আমি ও রামলাল দেখতে যাব আখুন।" তারপর আমি ও ঠাকুর একটি গাড়ী কোরে থিয়েটারে গেলুম। আমরা গিয়ে প্রথমে মেয়েরা যে পথ দিয়ে যায় সেই পথে ঢুকে পড়েছি। দেখি, কেউ কোথাও নেই, আর সেই পথের কাছে আবর্জ্জনা (অর্থাৎ মাছের কাটা, ভাত ছাই) এ সব পড়েছিল। শেষে একটা মেয়ে লোককে দেখে ঠাকুর তাকে বোললেন, "ওগো, গিরিশকে একবার ডেকে দাও না। বলগে, দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে"। তারপর গিরিশবাবু এসে প্রথমে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরলেন। গিরিশবাবু ঐরকম হয়ে ৩।৪ মিনিট হবে ঠাকুরের পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকাতে, ঠাকুর গিরিশবাবুকে বোললেন, "থাক থাক হয়েছে গিরিশ ওঠ গো ওঠ।" গিরিশবাবু যখন উঠলেন, তার জামার বুকে সব ময়লা লেগে গেছে। এই দেখে ঠাকুর নিজের হাতে সব পুছে দিতে দিতে বোললেন, "আহা ভ্যাখ দিকিনি, এমন সাদা জামাটা নোংরা হয়ে গেল"। গিরিশবাবু আমাদের নিয়ে উপরে ভাল জায়গায় বসালেন। তিনি মেয়েদের নাম কোরে একে একে ডাকলেন, তারা সাজগোছ কোরছিল, কিন্তু ডাকার চোটে সব যে যেমন ভাবে ছিল, অমনি ছুটে এল। গিরিশবাবু মেয়েদের বোললেন, 'নে নে শীগগির ঠাকুরের পায়ে লুটে পড়, তোদের এমন সুযোগ আর হবে কি'। ঠাকুর মেয়েদের বোললেন, "থাক থাক মা আনন্দময়ীরা হয়েছে, উঠ উঠ তোমরা নেচে গেয়ে, সর্ব্বপ্রকারে

জীবদের আনন্দ দিচ্ছ, যাও মা—এইবার সাজগোজ করগে।”

গিরিশবাবু দক্ষযজ্ঞে রাজা সেজে প্রথমে ষ্টেজে নেমে বোললেন, “শিবনাম ঘুচাইব আজি ধরা হতে”। এই শুনে ঠাকুর বোললেন, “ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কিরে”—ইত্যাদি। তারপর গিরিশবাবু ঠাকুরের কাছে এসে হাত জোড় করে বোললেন, ‘দক্ষ রাজার প্লেটা কেমন শুনলেন’? ঠাকুর তাকে বোললেন, “ছাখ গিরিশ, তোমার মুখে এ সব কথা সাজে? যে শিবনাম—গিরিশবাবু বোললেন, ‘কি করব, পেটের দায়ে সব কোরতে হয়, বোলতে হয়’। ঠাকুর শুনে বোললেন, “তা বটে, পেটের—”

গিরিশবাবু চলে গেলেন তারপর সতীর প্লে যখন আরম্ভ হল, তা দেখে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঐরূপ সমাধিস্থ হয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে “আহা আহা” কোরে উঠছিলেন। থিয়েটার ভেঙ্গে গেল, ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন কিন্তু ভাবে টলমল কোরছিলেন। গিরিশ বাবু এসে ঠাকুরকে প্রণাম কোরলেন, আর বোললেন, ‘কেমন সব দেখলেন শুনলেন? ঠাকুর কিন্তু কোন কথাই বোলতে পারলেন না। গাড়ী ছেড়ে দিলে আমরা দক্ষিণেশ্বর যাত্রা কোরলুম। তারপর ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর তিনি আমায় বোললেন, “হ্যারে রামলাল, তারপর কি হলরে বলতো”। আমি ঠাকুরকে একে একে সব বোলতে সুরু কোরলুম, তিনি শুনে বোললেন,

"আহা ! আমি আর সবটা দেখতে পেলুমনি, যাই হোক তোর মুখে সব শুনে আমার দেখবার সাধ মিটে গেল"।

পাঁচালী শোনা

২৪-৯-১৯৩১—৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী, ১৩৩৮ সাল। কমল সকালে রামলালদাদার বাড়ী গিয়ে ছাখে, রামলালদাদা ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী পড়ছেন। রামলালদাদা কমলকে রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পোড়ে শোনালেন।

রামলালদাদা। (কমল)। আলমবাজারে শিব আচার্য্যের পাঁচালী শুনতে গিছলুম, তিনি অতি চমৎকার কোরতেন। এক তাড়া কলার ঝাড় ও ৫০৲ টাকার নোট ঝুলান থাকত। যে ভাল কোরতে পারবে সে ৫০৲ টাকা পাবে, আর যে মন্দ কোরবে সে ঐ কলার ঝাড় পাবে। একদিন শিব আচার্য্যের পাঁচালী গান শুনে এসে ঠাকুরকে জানালুম, যে একটা গান শুনে এলুম, "এমন অমূল্য ওই শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।" ঠাকুর শুনে বোললেন, 'বটে, আমি শুনতে পেলুম নি'। তারপর একদিন শিব আচার্য্য মায়ের মন্দিরে এল মাকে দর্শন কোরতে, আমি তাকে বোললুম, চলুন না ঐ ঘরে পরমহংসমহাশয় আছেন, দেখতে। তিনি বোললেন, হ্যাঁ তাঁর নাম শুনেছি বটে, চলুন। তিনি ঠাকুরের ঘরে এলেন, ঠাকুর তাকে বোললেন, "তোমার গান রামলাল শুনে এসে আমায় বোললে, আহা ! কি গান, একবার ঐটে গাওনা শুনি"। তিনি গাইলেন, ঠাকুর শুনে দু'চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমায় বোললেন,

গানটা লিখে নিতে। তারপর শিবু আচার্যিকে বোললেন, "আহা তুমি কত লোককে গান শুনাচ্ছ, ৪।৫ ঘণ্টা একভাবে গাইছ, তোমার গলা খারাপ হয় না, একি কম কথা। যাঁর দ্বারা দশজন আনন্দ পায় আর যার আকর্ষণ শক্তি বেশী, তার হৃদয়ে যেন ঈশ্বরের শক্তি বিরাজ কোরছে"। শিবু আচার্য্যি পরে একদিন ঠাকুরের ঘরে পাঁচালীর গান শোনায়। তিনি ঠাকুরকে বোললেন, মহাশয়, একবার আমাদের শ্বশুর বাড়ী ওপারে ভদ্রকালীতে যদি দয়া কোরে পায়ের ধূলো দেন ত বড় ভাল হয়। ঠাকুর বোললেন, "বেশ ত হবে আখুন"।

একদিন শিবু আচার্য্যি ৪ খানি নৌকা নিয়ে হাজির। একটি নৌকায় ঠাকুর আমি রাখালমহারাজ, স্বামীজি, আর অন্যতে অক্ষয়মাষ্টার, মহিম চক্রবর্ত্তী, মাষ্টারমহাশয় এরা সব ছিলেন। সে খুব ধূমধাম কোরে যাওয়া হয়েছিল, নৌকায় পতাকা টাঙ্গান হয়েছিল। শিঙ্গে, খোল-করতাল, বাজিয়ে হরিনাম কোরতে কোরতে যাত্রা করা হয়েছিল। পারে, বড় ধামি দু' ধামি বাতাসা ও ফুলের মালা নিয়ে সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঠাকুরের গলায় মালা দেওয়া হল, বাতাসা গুলি হরিবোল হরিবোল বোলে ছড়ান হল, ঠাকুর দেখেশুনে সমাধিস্থ হয়ে, টলমল টলমল কোরতে কোরতে সেখানে গেলেন। সেখানে কীর্ত্তন চলছে, এদিকে সব পণ্ডিতেরা ন্যায়-শাস্ত্র আলোচনা কোরছেন, সে মহা ধুমধাম লেগেছে।

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায় নামে একজন পণ্ডিত খুব তর্ক কোরছিল।

যে যা বলে, তিনি সব কেটে দেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন। তারপর আমায় বোললেন, "চল ত' রে এক বার প্রসাব যাব"। আমি ঠাকুরকে নিয়ে বাহিরে এলুম, তিনি একটু বোসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বোললেন, "মা, শালা ভারি তর্ক কোরছে। সব কেটে দিচ্ছে কিছু মানতে চায় না, হ্যাঁ পণ্ডিত বটে, কিন্তু শুক্‌নো"। তারপর ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে তাঁর কাছে গিয়ে খপ কোরে ডান পায়ের হাঁটু ধরে (কমলের হাঁটু ধরে দেখিয়ে) তাকে বোললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিলে বলত বলত" ? তিনি শুনে বোললেন, কই আমি ত কিছু বোলিনি। ঠাকুর বোললেন, হ্যাঁ এই যে কত কথা বোলছিলে গো, কি তর্ক হচ্ছিল ? পণ্ডিত বোললেন, না না, সে আমি ঠাট্টা তামাসা কোরছিলুম, দেখি আমার কথা শুনে কে কি বলে, ওসব কিছু নয়। তারপর ঠাকুরকে সান্ত্বনা কোরে, ওখান হতে ফিরিয়ে আনা হয়।

দিগম্বর বাড়ুর্য্যেকে কৃপা করা

ইং ৮-১০-১৯৩১—২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার একাদশী ১৩৩৮ সাল দক্ষিণেশ্বর লম্বা বারণ্ডায় সন্ধ্যায় সময় রামলালদাদা ও কমল বোসলেন।

রামলালদাদা। (কমল)। দিগম্বর বাড়ুর্য্যের দেশ ছিল শিউড়, তাঁর বয়স প্রায় ৭০।৭৫ ছিল, বড় গরীব ছিলেন। তিনি একদিন তুলসীর মালা ১০৮, গঙ্গা জলে স্পর্শ কোরিয়ে চন্দননাদি দিয়ে ঠাকুরের পায়ে এনে দিলেন। ঠাকুর সেটী নিয়ে তাকে দিলেন আর বোললেন, "এটী নাও জপ কোরো, আর প্রত্যহ খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম কোরো। তাতে মঙ্গল

হবে। কলিযুগে হরিনাম সার. এ করলে ধ্যান, যাগ-যজ্ঞের ফল হবে।"

ঠাকুরের কৃপায় দিগম্বর বাবু জমিদার হয়ে, ধনি লোক হয়ে গেলেন। তিনি ঠাকুরের কথা অনুযায়ী প্রত্যহ খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম কোরতেন, আর যত দল আসত তাদের নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াতেন।. আহা! ঠাকুরের উপর তাঁর অচলা ভক্তি, বিশ্বাস ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিবর্ত্তন

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘর। একদিন রামলালদাদা কমল ও ভক্তগণ উপস্থিত থাকায় তিনি বোল্লেন :—

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত কোরতেন, তিনি ব্রাহ্ম সমাজে বেশী যেতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বোলেছিলেন, "বিজয় তুমি একদিন সুবিধামত আমার কাছে এস তোমায় কিছু বোলব"। তারপর কিছুদিন পরে, একদিন বিজয়বাবু একলা এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে বোললেন, "দেখ বিজয়, বাপু এ সব সাজে না (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া) তোমার ভিতর অদ্বৈতবংশের রক্তের সংস্কার রয়েছে, কিন্তু সব চাপা রয়েছে। তুমি কোথায় হরিনামের মালা গলায় দেবে, তেলক ফোঁটা পোরবে, হরিনাম কোরবে। এ সব না কোরে তুমি কি কোরছ? আহা! তোমায় দেখে বড় কষ্ট হয় তাই বোলছি"। এই সব কথা শুনে বিজয়বাবু

ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, আর বোললেন, 'মহাশয় আমার কি কিছু হবে' ?

ঠাকুর শুনে বোললেন, "অবশ্য, হরিনামে মাতোয়ারা হ'লে তিনি দয়া কোরবেন বৈকি"।

তারপর বিজয়বাবুকে ওসব কোরতে দেখা গেল, তিনি ঠাকুরের কৃপায় একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেলেন। তিনি সর্ব্বদা হরিনামের মালা জপতেন ও বহু তীর্থে গিয়ে সাধন ভজন কোরেছিলেন।

একদিন বিজয়বাবু বেশ সেজেগুজে (অর্থাৎ হরিনামের মালা হাতে, নাকে তেলক, গলায় মালা ইত্যাদি) ঠাকুরের কাছে এলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে বোললেন, "বাঃ, বাঃ বেশ বেশ, কি সুন্দর মানিয়েছে, এই ত ঠিক। তোমায় এইবার দেখলে মনে হচ্ছে হরিনাম যেন আপনি ফুটে বেরুচ্ছে। এতদিন চাপা ছিল, এইবার ফুল ফুটেছে"। বিজয়বাবু ঠাকুরর চরণে মাথা দিয়ে প্রণাম কোরলেন আর বোললেন, 'এ দাসকে মনে রাখবেন, চরণে ঠেলবেন না। আমি জেনেছি **আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, কেবল ছলনা করেন মাত্র'**। ঠাকুর শুনে বোললেন, "নাগো না, সব মা জানেন, আমি কিছু বুঝতে পারি না, যা করেন, বলেন সব মা"।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রণাম ও নাম দেওয়া

(সংযোগ)। স্থান ঃ—স্বামীজির বাড়ী। একদিন মহিম মহারাজ ভক্তদের সঙ্গে কথা কইছিলেন, এমন সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। তখনকার সময় (অর্থাৎ ঠাকুরের সময়) দু' হাত তুলে প্রণাম প্রথা ছিল। যুবকরা ঐ প্রথা না মেনে হাতের একটা আঙ্গুল কপালে ঠেকাত মাত্র। ঠাকুর দু' হাত তুলে প্রণাম করার প্রথাটা পুনঃ জীবিত কোরেছিলেন। ভক্তদের মধ্যে সেইজন্যে দু' হাত তুলে প্রণাম খুব চলেছিল। আর সকলেই সকলকে পাঞোমে পড়না মহারাজ, মাথা ঠেকনা মহারাজ, এই বোলে অভিবাদন কোরতেন। এটা পাঞ্জাবী প্রথা।

বলরামবাবু 'স্বামী' কথাটা নামের পরে দিয়ে ডাকতেন, যেমন 'নরেন স্বামী' 'রাখাল স্বামী' ইত্যাদি। আর বোধ হয় মঠে গুপ্ত-মহারাজ কথাটা প্রচলন করেন, তিনি পশ্চিমের যৌনপুরের লোক ছিলেন। সেখানে 'মহারাজ' কথাটা প্রচলন ছিল। গুপ্ত-মহারাজ ডাকতেন, স্বামীজিমহারাজ, রাখাল মহারাজ। ইত্যাদি।

ইংরাজি ১৮৯৩ সালে স্বামীজি মাদ্রাজ হ'তে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন। ঐ মাসে কলকাতায় September কি Octcber মাসে সংবাদ পত্রে বেরিয়েছিল।

ঠাকুর স্বামীজিকে আদর কোরে 'শুকদেব' বোলে ডাকতেন। একদিন রামদাদার বাড়ীতে স্বামীজি আসতে দেরী হয়েছিল। তারপর একজন তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। ঠাকুর স্বামীজিকে বোললেন, "তুমি আসনা কেন? আসর যে জমে না। **আমরা নর তুমি যে নরের ইন্দ্র**"।

'একদিন ঠাকুর হঠাৎ সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি খানিকক্ষণ দেখেশুনে চলে আসবার সময় বোলেছিলেন, "**ডাল খিচুড়ি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**"। অর্থাৎ পাঁচ মিশালী, সব জিনিস হ'তে কিছু কিছু লওয়া হয়েছে, কোনটা পুরা মাত্রায় নয়।

(মহিমমহারাজের মুখে যা শুনেছিলুম আর তাঁর বইতে যা পড়েছিলুম তা ঐগুলি হচ্ছে)।

স্বামীজির জন্য উতলা

২১-১০-১৯৩১—৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার ৺বিজয়া দশমী ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা ও কমল দক্ষিণেশ্বরের লম্বা বারাণ্ডার নিচে চাতালে বোসলেন। রামলালদাদার সঙ্গে কোলাকুলি হল, তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টি হাতে দিলেন। রামলালদাদা বোললেন, ৺বিজয়ার দিনে ঠাকুর খুব খেউড় ঝুমুর গান কোরতেন।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর স্বামীজির জন্য খুব উতলা হতেন দেখে আমি বোলতুম, কেন আপনি তার জন্য এত উতলা হচ্ছেন? ঠাকুর শুনে বোলতেন, "তোর **ফ্যারেণডো** যেমন রসকে, (রসিকলাল সরকার ইনি মা কালীর ঘরে সমস্ত

কাজের যোগাড় কোরে দিতেন তার কামারপুকুরে বাড়ী ছিল) নরেনের ফ্যারেণডো যেমন হাজরা, আম্মার ফ্যারেণডো তেমন নরেন হচ্ছে। নরেন বোলে গেল বুধবার আসবে, কিন্তু ফিরে বুধবার এল সে এখনও এল না। তুই একবার গিয়ে খবর লিয়ে আয়, কেন সে এল না, সে কেমন আছে"। রামলালদাদা। ঠাকুর যখন তুপুরে খেয়ে শুতেন, আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম। তিনি বোলতেন,"থাক থাক তুই এইবার একটু গড়িয়ে নিগে যা"। আমি মাতুর বালিশ লিয়ে একটু শুয়ে তারপর রসিকের কাছে দপ্তরখানার দিকে যে ছাতের উপর চিলের ছাত আছে সেখানে রসিক থাকত, গিয়ে গল্প কোরতুম। ঠাকুর ঘুম থেকে উঠে ডাকতেন "ওরে রামলাল ওরে রামলাল"। তিনি যদি সাড়া না পেতেন ত বোলতেন, "ওরে রামলেলো শালা, শীগগীর আয় আমি বাহ্যে যাব"। আমি শুনে ছুটে আসতুম। ঠাকুর বোলতেন, "শালার এমন ভালবাসা যে রসকের কাছে যাবে, তা মাতুর বালিশটা তুলতে আর সময় পায়নি, ওমনি ছুট মেরেছে"। তারপর বোললেন, "ওরে রামলাল ছ্যাখ, মাড়োয়ারি ভক্ত এসে, আমায় বাদাম, কিচমিচ, সন্দেশ এসব খেতে দিয়ে গেছে। আমি এসব খাবনা, তোকে দিচ্ছি তুই লিয়ে নরেনকে দিয়ে আয়, আর তার খবরটা লিয়ে আয়"।

রামলালদাদা। ঐসব জিনিষ ঠাকুর একটা পুটলি কোরে আমার হাতে দিলেন, আমি লিয়ে যাত্রা কোরলুম। বরাহনগরে তখন শেয়ারের গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত, কিন্তু আমি যখন

গেলুম তখন কেউ যাত্রী নেই। এই দেখে, আমি হেটেই স্বামীজির বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। স্বামীজি আমায় দেখে বকুনি দিলেন। "কেন দাদা, পয়সা কি ছিল না"? ইত্যাদি। আমি বোললুম, এই ছ্যাখ পয়সা ত রয়েছে, কিন্তু গাড়ী ছাড়তে দেরী দেখে হেটে এলুম। স্বামীজি আমার পা ধুয়ে দিলেন ও হাওয়া কোরলেন। আমি স্বামীজিকে বোললুম, তুমি যে ঠাকুরকে বোলে এলে বুধবারে যাবে, কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই। তাই তিনি ভাবছেন, আর আমার হাতে এগুলো দিয়ে তোমার খবর নিতে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজি বোললেন, 'হ্যাঁ দাদা, যাব বোলে ঠিক কোরি কিন্তু সংসারের কাজে যাওয়া হয়ে উঠে না। চল তোমার সঙ্গে আজই যাব'। স্বামীজি বেশ বাবু সেজে টেরী কেটে ফিট-ফাট হয়ে, আমার সঙ্গে মন্দিরে এলেন। স্বামীজি ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরলেন, ঠাকুর স্বামীজির কপালের ধূলো গুলো পুছে দিলেন। আর মাথার টেরী দেখে উস্ক-মুস্ক কোরে বোললেন, "তোর আবার এসব কেন। তুই আজ থাকবি ত" ? স্বামীজি বোললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ থাকবো'। ঠাকুর বোললেন, "ওরে রামলাল আজ ভাল কোরে খাওয়ার বন্দোবস্ত কোরিস"।

বুনি। (স্বগত)। ঠাকুর স্বামীজির জন্যে এত কোরতেন কেন তিনি কি বুঝেছিলেন যে স্বামীজির যত লক্ষণ সব ভাল ভাল আছে তা কারুর সঙ্গে মিল হবে না, আর স্বামীজির ঘর আলাদা। "স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী" প্রথম ভাগ শ্রীমহেন্দ্র নাথ

দত্ত, (স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা) লিখিত পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮২ পড়লে লক্ষণ বিষয় কিছু জানা যায়।

লক্ষণ বিষয় বর্ণনা

স্বামীজির পায়ে যব ধান ইত্যাদি চারিটী চিহ্ন ছিল। এক গনৎকার স্বামীজির পায়ের দিকে দেখে বলে ডান পায়ের বুড় আঙ্গুলের তলা তৎনিম্নস্থিত স্ফীত, স্থানটী দেখে বলে পায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি চিহ্ন রয়েছে। ইহা সাধারণ লোকের দেখা যায় না। এখন যেমন অবস্থা দেখছি লক্ষণের সঙ্গে ত কিছু মিলছে না। তখন নরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

স্বামীজির পা ছিল, নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ এবং জোড়া পা খড়ম পা কিঞ্চিৎপূণ্য ভাব ছিল। মোটকথা, অল্প পরিমাণে হাতী পা, অল্প পরিমাণে জোড়া পা মিশ্রিত ছিল।

পায়ের তলা অনেক প্রকার হয়, রাখালমহারাজের হাতী পা চেপটা অর্থাৎ পায়ের তলার অধিকাংশ মাটির সহিত সংলগ্ন থাকিত। কাহার কাহার পা ঘোড়া পা, খড়ম পা হয়, অর্থাৎ মাটীতে পায়ের মধ্যস্থান সংলগ্ন হয় না, শুধু একদিকের ধারটা উপর নীচু মাটি স্পর্শ করে।

স্বামীজির আঙ্গুল ছিল চাঁপার কলির মত, মেয়েদের মত নহে অর্থাৎ আঙ্গুলি গোড়া থেকে আসিয়া ডগার দিকে একটু ক্ষীণ হইয়াছে। নখ থ্যাবড়া বা ফ্যাটকা নহে Tapering

finger কহে। এই রকম আঙ্গুলি হইলে সে দ্বিধা শূন্য নিশ্চয়াত্মিকা হয় অর্থাৎ মনের ভাব চোস্ত কাঠা গোড়া হয়।

স্বামীজির নখ ছিল—ঈষৎ রক্তাবর্ণাভা বা জৌল্লুসযুক্ত এবং নখের মাথাটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ছিল। সংস্কৃতে এইরূপ নখকে নখমণি বলিয়াছে।

স্বামীজির পদবিক্ষেপ অতি দ্রুতও ছিল না অতি শ্লথও ছিল না, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষায় অতি দৃঢ় সুনিশ্চিত ভাবে ভূপৃষ্ঠে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেন। (বুদ্ধদেবে পদ বিক্ষেপের বহু প্রকার বর্ণনা আছে) শশকবৎ, ভেকবৎ, করিবৎ, সিংহবৎ ইত্যাদি। স্বামীজির সব সময়ে বিজয়লাভের সূচনা স্বরূপ ছিল।

স্বামীজি কোন সময়ে হর্ষিত হইলে বা বক্তৃতা দিবার কালে, তিনি ডান হাতের আঙ্গুলি প্রথমে সংযত করিয়া হঠাৎ ছড়াইয়া ফেলিতেন। এবং তাঁর মনে যেমন যেমন ভাব উঠিত, আঙ্গুলি সঞ্চালন ও সেইরূপ হইত। ডান হাতের পর বাম হাত ঠিক এইরূপ ভাবেই দেখাইতেন। তিনি একটু বিশেষ উত্তেজিত হইলে, উভয় হস্ত ও আঙ্গুলিতে ভাব প্রকাশ করিতেন।

স্বামীজির মনে যেরূপ ভাব উঠিত, তাহা অর্দ্ধেক মুখ দিয়া ও অপর অর্দ্ধাংশ হস্ত অঙ্গুলি ও মুখ ভঙ্গি দিয়া প্রকাশ করিতেন। এইজন্য আমেরিকানরা বলিত—He is an orator by devotion sight অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত বাগ্মী-

7/222

শক্তি তাহার আছে। তাঁহার হস্ত পদ সঞ্চালন অতি গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রত্যেক জিনিষটিই দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য ভাবে প্রস্ফুটিত হইত।

স্বামীজির সত্য রক্ষা

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। স্বামীজি ঠাকুরকে বোলে গেলেন, বুধবার আসব। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কখন আসবি" ? স্বামীজি বোললেন, 'বেলা ৩টার সময়'।

রামলালদাদা। তারপর স্বামীজি বুধবার দিন বেলা ২টার সময় এসে সদর ফটকের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ তিনি ঠাকুরকে বোলে গিয়েছিলেন ৩টায় আসব, কিন্তু ২টার সময় এসেছেন, এখনও ৩ টে বাজেনি। যদি ২টার সময় ঠাকুরের কাছে যান ত মিথ্যা কথা হয়ে যায়।

ঠাকুর ঘরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কইছিলেন। এমন সময় তাদের বোসতে বোলে, চটিজুতো পায়ে দিয়ে হন হন কোরে, সদর ফটকের দিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন, স্বামীজি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঠাকুর স্বামীজিকে বোললেন, "কিরে নরেন যে, কখন এলি, আর এমন কোরে বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন রে ? কি হয়েছে ? স্বামীজি বোললেন, 'আমি বোলেছিলুম, আপনার কাছে ৩টার সময় আসব, কিন্তু বাড়ী হতে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি, এসে দেখি এখন দুটো বেজেছে। তাই আপনার কাছে না গিয়ে সত্য রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, ৩টে বাজলে যাব। ঠাকুর শুনে বোললেন,

"ও সে জন্যে দাঁড়িয়ে, তা বেশ"। রামলালদাদা। ঠাকুর ও স্বামীজি পরস্পর কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন, যখন ঠিক ৩ টে বাজল, তখন ঠাকুর স্বামীজিকে নিয়ে ঘরে এলেন।

স্বামিজীর বাল্য পরিচয়

(স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী বইতে আছে।)

সিমুলিয়া পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের বাড়ী। ৺রামমোহন দত্ত তাঁহার পুত্র ৺দুর্গাচরণ দত্ত। ইনি পত্নী ও একটি শিশুকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাসীর পুত্র ৺বিশ্বনাথ দত্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পিতা।

নরেন্দ্রনাথের মাতা ৺ভুবনেশ্বরী দেবী। দুই কন্যার পর তিনি পুত্রলাভের কামনায় শিব পূজা করিতেন। একদিন ভুবনেশ্বরী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন মহাদেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে শিশুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

বালকের চেহারা অনেকটা পিতামহের মত ছিল বলিয়া সকলে দুর্গাদাস রাখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মাতা স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নাম রাখিলেন বীরেশ্বর, (বিলে) অন্নপ্রাশনের নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ। বাল্যকালে শিব শিব বলিয়া মস্তকে কিছু জল ঢালিয়া দিলেই নরেন্দ্রনাথ শান্তভাব অবলম্বন করিতেন।

স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম ১২৬৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে পৌষ, সোমবার কৃষ্ণা সপ্তমী, সংক্রান্তির প্রাতে ৬-৩৩ মিঃ ৩৩ সেঃ সময় সূর্য্যোদয়ের ৬ মিঃ পূর্ব্বে।

২০ বৎসর বয়সে জেনারেল এসেমব্লী নামক বিদ্যালয় হইতে এফ-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ, পাঠ করিতে থাকেন। হেষ্টি সাহেব একজন খৃষ্টান মিশনারী, ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন।

(শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজিকে দেখে বোলেছিলেন—"নরেন সাক্ষাৎ শিব ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের একজন। ও (নরেন) আমার শশুর ঘরের লোক"।)

স্বামীজির শরীর যায় ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসের ২০শে। ইংরাজী ৪-৭-১৯০২ বেলুড় মঠে।

তামুক সাজ নারে

৪-১-১৯৩১—১৯শে পৌষ, রবিবার পূর্ণিমা ১৩৩৭ সাল। কমল বেলা ৩টার সময় রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। (কমল)। মন্দির হতে আসছ? কমল। আজ্ঞে না, বাড়ী থেকে। রামলালদাদা। এই খেয়ে উঠছি আজ খেতে বেলা হয়ে গিছিল। আজ মন্দিরে বেশ কীর্ত্তন হচ্ছে, তুমি শোনগে, আমি একটু গড়িয়ে যাচ্ছি। কমল মন্দিরে এসে সমস্ত দর্শনাদি কোরে ঠাকুর ঘরে বসল। কিছুক্ষণ পরে রামলালদাদা আসলেন রামলালদাদার সঙ্গে কমল পুনরায় দর্শনাদি করতে গেল। পরে, লম্বা বারাণ্ডায় দাদা, কমল ও কয়েকটি ভক্ত বসলেন।

রামলালদাদা। (কমলকে)। তামুক সাজনারে!

কমল। আপনি ত তামাক খান না, এই নিন বিড়ি।

রামলালদাদা। আর একটি দাও ত। দাদা নিয়ে ব্রাহ্মণকে দিলেন। রামলালদাদা। বেশ ব্রাহ্মণ সেবা হল।

রামলালদাদা। হ্যাঁ তামুক সাজনারে ঠাকুরের কথা বোলছিলুম। একদিন ঠাকুর ঐ ছোট খাটটিতে বোসে, আর আমি তাকিয়ার পিছনে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একঘর লোক বোসে আছেন। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা কইছেন, আর মধ্যে মধ্যে বোলছেন, "তামুক সাজনারে, কই সাজলি না?" আমি বোলছি, আজ্ঞে হ্যাঁ এই যাই। ঠাকুর বোললেন, "যা শিগগীর যা, কি শুনছিস্? "আমি বোললুম, আজ্ঞে দেখে-শুনে সব অবাক হচ্ছি। তিনি বোললেন, "হ্যাঁ অবাক হবি বৈকি, আরও যদি কিছুদিন বেঁচে থাকিস ত কত দেখবি শুনবি। মা যদি তোকে বাঁচিয়ে রাখেন, 'ত' অনেক দেখে শুনে অবাক হবি"। তা দেখনা আজ কালীবাড়িতে কি ধুম, চারিদিকে গান, কীর্ত্তন হচ্ছে, কত লোক এসেছে; বাগানে বহুলোক রান্না কোরে খাচ্ছে। এদিকে ভোজনানন্দ ওদিকে ভজনানন্দ। তা এইরকম মস্ত বড় জায়গায় এমন না হলে মানায় না, কি বল? কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুর যদি না আসতেন বোধ করি এ জায়গার এতটা মাহাত্ম্য কি হোত?

রামলালদাদা। হ্যাঁ, তারপর আমি তামুক সাজতে যাচ্ছি, দরজার বার না হতে হতে তিনি বোললেন, "ছাখ বেশ (ইশারা কোরে হাতটা মুখের কাছে এনে নাড়িয়ে) তারমানে হচ্ছে সেজে খেয়ে টেনে দেখবি, যখন ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তখন নিয়ে আসবি।"

আমি তাই কোরে নিয়ে গেলুম। তিনি দু এক টান দিচ্ছেন আর কথা কইছেন। কখন কখন হাতের হুঁকো হাতেই রয়েছে টানছেন না। আমি দেখে বোলছি, কই টানুন, নিবে যাবে যে। তিনি শুনে বোলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বোলেছিস ভাই"। এই বোলে আবার টান দিলেন, এমনি কোরে মধ্যে মধ্যে টান দিতে ভুলে যান, তারপর আমায় রেখে দিতে বোললেন। অনেকক্ষণ ঠাকুর কথা কইছেন দেখে মনে হল একটা গান হলে ওনার বিশ্রাম হয়। ঠাকুর আমায় মধ্যে মধ্যে গানের ফরমাস করে বোলতেন, "গাতোরে ওমুক গানটা 'তার তারিণী' 'কি ভুবন ভুলাইলি মা,' 'কি কবে সমাধি হব'। আমি যদি লজ্জা করতুম ত খুব বক্‌তেন, "শালা লোক দেখে তোর লজ্জা হয় কেন? লোক না পোক"। তিনি আরও বলতেন শোন—

কলকাতার ভক্তি

"কলকাতার লোকেরা ভক্তি যেমন, অভক্তি করতেও করতেও তেমন। আমায় কেউ কেউ বলে বাবুর লাল পেড়ে কাপড় পরা, পায়ে কাল বার্নিস চটি জুতো, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা, এসব না হলে চলে না। গঙ্গার জল সকালে দেখলুম বেশ ভরপুর রয়েছে, আবার দেখি না কমে গেছে। এসব লোকদেরও কি রকম জানিস, ঠিক জোয়ার ভাটার মতন। কত শালা কত কি বলে, ও শালাদের ভাল কথায় মুতে দি, আর মন্দ কথায় মুতে দি। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আছে ভক্তিমান বিশ্বাসী, তাদের আর ওসব হবেনি। তারা

যাকে ভক্তি কোরবে বা বিশ্বাস করবে, তাদের আর ভুল হবেনি। কি রকম জানিস, যেমন বিন্ধ্যগিরিকে বোলেছিল, আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি এই রকম থেকো, সে আর মাথা তুললে না।

ভক্ত। (রামলালদাদা)। অনুমতি হোগ, এইবার আমায় ওপারে যেতে হবে। রামলালদাদা গান ধরলেন, 'মন ক'রোনা কাজে হেলা'। পুনরায় গাইলেন, 'প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র'। রামলালদাদা—এই দুটো গান ঠাকুর গাইতেন। রামলালদাদা। (কমল)। এইবার তুমি একটি শোনাও। কমল। এ গানের কাছে কি আর আমার গান, পায়েসের পর কি অম্বল হবে, তা ছাড়া আমার গলাটা সর্দ্দিতে বোসে আছে। রামলালদাদা। তা হোক ও বেশ হবে গাও, লজ্জা কোরোনি, এই যে বোললুম, লোক না পোক। কমল গাহিল, 'কখন কি রঙ্গে থাক মা'। রামলাল দাদা। বেশ বেশ, এই ত বেশ হল।

তারপর রামলালদাদা বাড়ী গেলেন। বুনি প্রসাদ পেয়ে রাত্রি ৮টার সময় মানুষের লক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে বাড়ী রওনা হল।

বুনি। (স্বগত)। ঠাকুর যে কলকাতার ভক্তি সম্বন্ধে বোলেছেন তা ঠিকই দেখা যায়, বহুজনের ভিতর ঐরূপ স্বভাব, লক্ষণও দেখতে পাওয়া যায়। আরও শুনেছি, ঠাকুরের কাছে যিনি প্রথমে যেতেন, ঠাকুর আগে তার লক্ষণ পরখ কোরতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীম, বাবুরামমহারাজ,

স্বামীজি, শরৎমহারাজ ইহাদের লক্ষণ আগে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব পৃষ্ঠা ১৭১—১৮১ পড়লে লক্ষণ বিষয় কিছু জানা যায়। আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আরও লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুর বোলেছেন।

লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা

পুরুষের চক্ষু—"পদ্ম চক্ষু হইলে অন্তরে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে। পুরুষের চক্ষু বৃষের ন্যায় হইলে কাম প্রবল হয়। যোগীর চক্ষু উদ্ধর্দৃষ্টি সম্পন্ন রক্তিমাভাব হয়"। **দেব চক্ষু**—"অধিক বড় হয় না কিন্তু টানা বা আকর্ণ বিশ্রান্ত হয়; কাহারও সহিত কথা কহিতে কহিতে আড় চোখে চাওয়া, তারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হয়"।

শরীর—"ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবত কোমল ও তাহার হস্ত পদাদির গ্রন্থি সকল শিথিল হয় (অর্থাৎ সহজে ফিরান ঘুরান যায়)। কৃশ হইলেও তাহার শরীরে অস্থি পেশী প্রভৃতি এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না"।

হস্ত—"অল্প ভার হইলে সুবুদ্ধি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

নিশ্বাস—"ভোগীর নিশ্বাস একভাবে ও যোগীর নিশ্বাস অন্যভাবে পড়িয়া থাকে"।

মূত্র—"ভোগীর মূত্রের ধারা বামে হেলিয়া পড়ে ও ত্যাগীর মূত্র দক্ষিণে হেলিয়া পড়িয়া থাকে"।

মল—"যোগীর মল শূকরে স্পর্শ করে না"।

স্ত্রী শরীরের গঠন অবয়ব

বিদ্যাশক্তিদিগের—"ভোজন নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়াশক্তি স্বভাবতঃ অল্প হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও আলাপ করিতে ইচ্ছা। পতিকে নীচ কার্য্য হইতে সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা, এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন, তাহাতে সহায়তা করা"।

অবিদ্যাশক্তিদিগের—এই সব হইতে বিপরীত দেখা যায়। ইন্দ্রিয় বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদগৌরব লাভ করিয়া থাকেন, আবার আকার নানা রকম হইয়া থাকে। যাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পিপীলিকার ন্যায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে।

আরও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়লে এই কয়েকটি লক্ষণ বিষয় জানা যায়। কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩৯ পৃষ্ঠা দেহের লক্ষণ।

"ঠাকুর। শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায় তার হবে কিনা"।

১। "খল হলে হাত ভারী হয়"। ২। "নাক টেপা হওয়া ভাল নয়। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল তাই অতো জ্ঞানী থেকেও তত সরল ছিল না।" ৩। "উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল নয়। আর হাড় পেকে কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে"। ৪। আর **বিড়াল চক্ষু**—বিড়ালের মত কটা চোখ। ৫। **ঠোঁট**—"ডোমের মত হলে নীচ বুদ্ধি হয়। বিষ্ণু ঘরের পুরুত ক'মাস একটিং কর্ম্মে এসেছিল। তার হাতে

LIBRARY

...shram

খেতুম না, হঠাৎ মুখ দিয়ে বোলে ফেলেছিলুস—ও ডোম। তারপর সে বোল্লে হাঁ, আমার ঘর ডোম পাড়ায়, আমি ডোমের বাসন চাঙারী বুনতে জানি!"

আরও খারাপ লক্ষণ। ৬। **"এক চক্ষু, আর ট্যারা।** বরং একচক্ষু কাণা ভাল ত ট্যারা ভাল নয়, ভারি দুষ্ট ও খল হয়। একজন হৃদেকে বোলেছিল আমি নাস্তিক তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার কর। তাকে দেখি বিড়াল চক্ষু। আবার চলনেতে লক্ষণ ভালমন্দ টের পাওয়া যায়"।

৭। **"পুরুষাঙ্গের** উপর চামড়াটি মুসলমানদের মত যদি কাটা হয় ত সে একটি খারাপ লক্ষণ"।

কথামৃত ২য় ভাগ ১৪৭ পৃষ্ঠা। এই কয়েকটি হ'তে সাবধান হ'তে হয়।

"ঠাকুর। প্রথম **বড় মানুষ** টাকা, লোকজন অনেক আছে, মনে কোল্লে তোমার অনিষ্ট কোর্ত্তে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়, তারা যা বোলবে সায় দিয়ে যেতে হয়"।

২। তারপর **কুকুর**—যখন তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ কোরে তাকে ঠাণ্ডা কোরতে হয়।"

৩। তারপর **ষাঁড়** গুতুতে এলে তাকেও ঐরূপ কোরে ঠাণ্ডা কোরতে হয়। তারপর **মাতাল**—যদি রাগিয়ে দাও ত বোলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ তোর হেন তেন! তাকে বোলতে

হয় কি খুড়ো কেমন আছ। তা হলে সে খুসী হবে, তোমার কাছে বোসে তামাক খাবে। অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই।”

৪। “কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জাননা, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়; তা না হলে হয় তো তোমার প্রথম রাগ হয়ে গেল। যে তার আবার উলটে অনিষ্ট কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদাসৎ বিচার আসে”।

৫। “মুখ হলসা, ভেতর বুদবুদে. কাণ তুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, .পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল বড় মন্দ কারি”। এই রূপ স্বভাব যাদের আছে, তাদের নিকট হ'তে চোদ্দহাত দূরে থাকতে হয়”।

বুনি (স্বগত)। বোধকোরি ভগবান প্রত্যেক মানুষের লক্ষণাদি, প্রকৃতি ও সংস্কার দিয়ে এ ধরায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কে কিরূপ মানুষ, তার আচার ব্যবহার কিরূপ, তার কি হবে না হবে, সবই টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সেগুলো আগে না দেখে শুনে, মানুষের কাছে নানা বিষয় ঠকে থাকি। মানুষকে চিনতে হলে আগে তার লক্ষণাদি পরখ কোরে লওয়া আমাদের উচিত। যে যেমন প্রকৃতি ও স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ কোরেছে সে ত তাই কোরবে। গীতায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বোললেন, ‘তুমি যুদ্ধ কর’। তিনি বোললেন, ‘কি কোরে করি কত আত্মীয় স্বজন মরবে ইত্যাদি ওজর আপত্তি দেখালেন’।

শ্রীকৃষ্ণ বোললেন, 'তোমায় কোরতেই হবে। তোমার প্রকৃতিতে করাবে' "প্রকৃতি স্ত্বাং. নিযোক্ষ্যতি" (গীতা ১৮শঃ অঃ ৫৯ শ্লোক) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"—। (গীতা ৩য় অঃ ২৬ শ্লোক) "সকল প্রকার কর্ম্ম প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে"। এ হ'তে বোঝা যায় যে অর্জ্জুনের হয় ত এমন একটা লক্ষণ কি সংস্কার ছিল যাতে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে ও যুদ্ধ কোরবেই তাই শেষে কোরতেও হল।

"মনে কোরি হেন কর্ম্ম করিব না আর, কিন্তু স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার"। কুসংস্কার ও প্রবৃত্তির হাত হ'তে ভাল হওয়া যেতে পারে, যদি সাধু সঙ্গ, ধ্যান, জপ করা যায়। বোধ হয় তাই ঠাকুর যাদের ঐরূপ লক্ষণ দেখতেন তাদের বোলতেন, "কেবল সাধুসঙ্গ কর, মনে মনে সদাসৎ বিচার কর, ধ্যান জপ ও নির্জ্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকা দরকার।" এই সব কোরলে ভগবানের দয়াতে খারাপ সংস্কার, কুবৃত্তির মন, সব বদলে ভাল হয়ে যায়। যারা ভাল লক্ষণ ও সংস্কার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তাদের বেশী কিছু কোরতে হয় না। একটু কোরলেই চৈতন্য হয়ে যায়, আর ক্রমে ক্রমে সে ভালর দিকে অগ্রসর হয়।

আর যারা খারাপ লক্ষণ ও সংস্কার নিয়ে জন্মেছে, তারা হাজার বলুক আর যাই করুক, তারা সাধুসঙ্গ, ধ্যান, জপ ছাড়া কোন মতেই ভাল হতে পারে না। তারা ওসব যা করে, কেবল

ভাবের ঘরে চুরি কোরে, আর লোক দেখিয়ে করে, এই বেশীর ভাগ দেখা যায়।

মোট কথা, যে সব বিষয়েই ভাল হয়, তার আগে এই কটা দেখা যায়, সে খুব সরল হয়. ধীর, স্থির, নম্র ও কথা গুলো কি গান—অতি মধুর হয়। দ্বিতীয়তঃ সে বেশী কথা বা মিথ্যা বলে না। যখনকার যে কাজ তাকে কোরতে হবে, শক্ত কি সোজা হউক, সে ঠিক তাতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ত্যাগ কোরে কৃতকার্য্য হবে।

কথামৃত— **প্রেমের লক্ষণ ঃ—**

ঠাকুর। "প্রথম জগৎ ভুল হয়ে যাবে, এত ঈশ্বরের ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য (ইত্যাদি) নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও মমতা থাকবে না"।

ঈশ্বর লাভের লক্ষণ ঃ—"যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বর লাভের দেরি নাই। **অনুরাগের ঐশ্বর্য্য**—বিবেক', বৈরাগ্য জীবে দয়া, সাধুসেবা, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন, সত্যকথা এই সব।"

চৈতন্য হয়েছে তার লক্ষণ—"ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে বোলতে ভাল লাগবে না। চাতক পাখীর দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ—"ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর লাভ কোরেছে অথবা বিচার করেছে তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণগান কোরছে।

ছেলে কাঁদে কতক্ষণ, যতক্ষণ না স্তন পায়। তারপর আনন্দ। খেতে খেতে খেলা করে, আবার হাসে"।

জ্ঞানীর লক্ষণ—ঠাকুর। "সোহং সোহং কল্লেই হয় না, জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখ ঠেলা। এরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।"

"জ্ঞানী কারুর অনিষ্ট করতে পারে না; বালকের মত হয়ে যায়। বাহিরে হয়ত দেখায় রাগ, অহঙ্কার আছে কিন্তু জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না। বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য রয়েছে সব ফেলে কাশী চলে গেল। বালকের যেমন আঁট থাকে না"।

তীব্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বরকে আপনার ভাবা :—

এমন হওয়া চাই যে বোলবে কি জগৎ পিতা, আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় দয়া কোরবে না?" শালা;

"যে যাকে চিন্তা করে সে তার সত্ত্বা পায়"; শিবপূজা কোরলে শিবের সত্ত্বা পায়। একজন রামের ভক্ত দৃষ্টান্ত (ইত্যাদি)।

"শিব অংশে জ্ঞানী হয়। বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়।"

সত্ত্ব, রজ, তমগুণের লক্ষণ :—

ঠাকুর। "সত্ত্বগুণের লোকদের বাড়ী ভাঙ্গা, কোনরকম ফিট-ফাট নেই। রজোগুণের লোক—"ঘড়ি ঘড়ির চেন, হাতে আংটী"। তমোগুণে—"নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহংকার" ইত্যাদি।*

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে লক্ষণাদি বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

অষ্টম অধ্যায় ঃ কালীর আহার ও বিশ্রাম

১৬-১১-১৯৩১—৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার, সপ্তমী ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা, কমল ও একটী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ঘরের সামনে লম্বা বারাণ্ডায় বোসলেন।

রামলালদাদা। (ভক্তগণ)। ঠাকুর বোলতেন, "রাণী রাসমণি মার অষ্ট সখীর মধ্যে এক সখী ছিলেন। এই দেবালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করান, মা থাকবেন বলে। মার এই স্থান হচ্ছে অন্দর মহল, আর কালীঘাট মায়ের সদর কাছারী। মা ভোরবেলায় মাখন্ মিছরী খেয়ে কালীঘাটে যান, ভক্তের বাসনা পূর্ণ কোরতে। কত লোকে এসে নানান কামনা করে, মা সেই সব শুনতে, দেখতে যান। আর রাত্রি ৯টার সময় মা এসে, মন্দিরের চূড়োতে বোসে হাওয়া খান ও গঙ্গা দর্শন করেন"।

কমল। (রামলালদাদা)। মা কালী কোন চূঁড়োটীতে বসেন ? রামলালদাদা। সর্ব্বউপরে যে মস্তবড় চূঁড়ো আছে তার উপরে বসেন।

দই ও কাঁচা গোল্লা

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘর। ইং ২৬-১০-১৯৩১—৯ই কার্ত্তিক রবিবার, পঞ্চমী, ১৩৩৭ সাল। কমল ও হরেনবাবু দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে গেলেন। একটু পরে রামলালদাদা এলেন, ব্যাবসাদির কথার পর বোল্লেন :—

রামলালদাদা। তোমাদের যখন ব্যবসায় উন্নতি হবে তখন মাকে ষোল আনা চিনি-পাতা দই, আর ষোল আনা

কাঁচাগোল্লা সন্দেশ, পূজো দিও। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে মার কাছে মানৎ কোরতেন।

রামলালদাদা। (কমলের প্রতি)। তুমি কালীতলায় জোড়া ডাব ও আধপো আধপো চিনি পূজো দিও। কমল। আজ্ঞে দেবো। তুমি ঠাকুর ঘরে ও মার মন্দিরে ডাব ও চিনি পূজো দিও আর নির্ম্মাল্য নিয়ে যেও। দরজায় সিঁন্দুরের ৫টী ফোঁটা দিও। কমল। যে আজ্ঞে।

শনির দৃষ্টি

১৬-১০-১৯৩১—২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা, কমল ও একটি ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের লম্বা বারাণ্ডায় বোসলেন।

রামলালদাদা। (ভক্ত)। ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ায় বাড়ী ছিল, তিনি মা কালীর ভোগ রান্না কোরতেন। মাঠাকুরণ তাকে ধর্ম্মবাপ বোলে ডাকতেন, আমি তাকে ঠাকুরদা বোলে ডাকতুম ও তার সঙ্গে রঙ্গরস কোরতুম। ঠাকুর তাঁকে মধ্যে মধ্যে বোলতেন, "প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবার বেগুন পোড়া কি আলু পোড়া কোরে দিতে। ঐগুলি খেলে শনির দৃষ্টি কেটে যায়"। ঠাকুর আবার বোলতেন, কলায়ের ডালে বেশ হিং দিয়ে রাধতে, ভাল ভাল জিনিষ কোরে মাঠাকুরণকে খাওয়াতে বোলতেন। তারপর রামলালদাদা গাইলেন, "ওমা গাতোল গাতোল"। রামলালদাদা। (কমল)। সেই গানটা একবার গাওনা, 'কি দেখলাম বাচ্চা'।

আগে ভোজন কর

১-১১-১৯৩১ ১৫ই কার্ত্তিক, রবিবার ১৩৩৮ সাল। সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা, কমল ও একটি ভক্ত, ঠাকুর ঘরের সামনে লম্বা বারাণ্ডার সিঁড়ীর চাতালে বোসলেন।

রামলালদাদা। ঠাকুর উপবাসের সম্বন্ধে বোলতেন যে, "মা'র পায়ের বিল্বপত্র ভক্ষণ কোরে কিংবা মায়ের প্রসাদী দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না।

যদি ঠিক ঠিক বোধ হয় তবে ত ফল হবে। আবার পেট চুই চুই কোরছে, তাতে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে। একে কলিকাল অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু। উপবাস কোরে ওসব করা চলে না, তাতে ঠিক ঠিক মন বসে না। তাই আগে কিছু খেয়ে নিতে হয়"।

বুনি। (স্বগত)। 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট'।

উপবাসের কথা

১৪-২-১৯৩১—২রা ফাল্গুণ, শনিবার দ্বাদশী ১৩৩৭ সাল।

শ্রীম। (ভক্তগণ প্রতি) ঠাকুর শিবরাত্রি উপবাসের দিন ভক্তদের কাকেও কাকেও বোললেন, "তুই এইবার কিছু খেগে যা, এখন এক প্রহরের পূজো ত হয়ে গেছে, এখন আর দোষ কি"?

শ্রীম। যিনি এই নিয়ম কোরেছেন যে উপবাস কোরতে হবে, আবার তিনিই বোলছেন যে তুমি খাও। তিনি দেখছেন যে, এরা আমার জন্যে উপবাস, পূজো এ সব কোরছে আর আমায় দেখছে, এই তাদের যথেষ্ট করা হচ্ছে।

'টে' কথায় চটা।

ইং ১৩-১১-১৯৩১—২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, চতুর্থী ১৩৩৮ সাল। কমল বৈকালে ৪॥ টার সময় দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। (কমল)। একবার কালী পূজোতে মথুরবাবু তন্ত্রধারকের জন্য বনহুগলী থেকে একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি রাত্রি ১১টার সময় এলেন। এই দেখে মথুরবাবু তাকে বোললেন, 'এখানকার নিয়ম রাত্রি ১০টার সময় পূজোতে বসা আর আপনি রাত্রি ১১টার সময় এলেন কেন'?

ব্রাহ্মণ বোললেন, আমি তিনটে কালী পূজো সেরে এলুম তাই—

মথুরবাবু। (ঠাকুর)। 'বাবা, এ মাকে বলে কিনা তিনটে, টে-কথা বোলে মাকে ছোট করে; আমি ওকে পূজো কোরতে দোব না। ওর যা পাওনা দিয়ে দি উনি চলে যান'।

মথুরবাবু। (হৃদয়দাদা)। 'তুমি কি সকালে ভাত খেয়েছ'?

হৃদয়দাদা। 'না, আমি মায়ের প্রসাদ খেয়েছি'।

মথুরবাবু। (ঠাকুর)। 'বাবা, হৃদয় ভাত খায়নি মার প্রসাদ পেয়েছে, তা প্রসাদ খেয়ে কি পূজো হয় না'?

ঠাকুর। "ঠিক যদি ধারণা হয় যে মার প্রসাদ খেয়েছি তাতে দোষ নেই, বরং মা সন্তুষ্ট হবেন"।

মথুরবাবু। 'বেশ উত্তম কথা, হৃদয় তুমি মায়ের তন্ত্রধারক হও'।

পরে রামলালদাদা বোললেন, এই ঘরে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন) কত নাচ গান, কথা, রঙ্গরস হয়েছে। ঠাকুর এমন রঙ্গরস, রহস্য কোরতেন যে হেসে হেসে নাড়ী বেদনা হ'ত। তিনি ভক্তদের বোলতেন, "হ্যাঁগা, আমি এসব জানি, শুনেছি, দেখেছি, তাই বোলছি, তা কি দোষ হবে"? ভক্তরা বোলতেন, না না, আপনি বলুন বেশ ভাল লাগছে।

নবম অধ্যায় : শ্রীরাম সাধন অর্থে

৪-১২-১৯৩১—১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার দশমী ১৩৩৮ সাল। সকালে কমল রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। ঠাকুর বলতেন; 'রা' শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝায় আর 'ম' শব্দে ভগবান অর্থাৎ রাজা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা তিনি রাম হচ্ছেন।

ইং ১-১৮-১৯৩১—১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮ সাল। বুনি বৈকালে রামলালদাদার বাড়ী দক্ষিণেশ্বরে গেল।

সৃষ্টির মধ্যে বড়

রামলালদাদা একটু পরে বোললেন; ঠাকুর বোলতেন, "ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় ও সমুদ্র বড়। পাহাড় দেখেছি কিন্তু সমুদ্র দেখা হলনা। তবে একবার ষ্টিমারে আসবার সময় রূপনারায়ণ গাঙ্গ দেখে; (যেখানে দামোদর গঙ্গা ও রূপনারায়ণ মিশ্রিত হয়েছে।) আমার সমুদ্র দেখবার সাধ মিটে গেছে। ব্রহ্ম কি রকম জানিস; যেমন জলে জল, কূল কিনারা নেই।

(সংযোগ) মা বিন্দুবাসিনী

(সৃষ্টিতত্ত্ব)

একদিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রবোধ চন্দ্র দত্তএর সঙ্গে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে দেখি ৺রামচন্দ্র দত্ত (রামবাবুর) একজন শিষ্য তিনি একটি ঘটনা বোলছেন, ঘটনাটী এই :—

একদিন গরম কাল, দুপুর বেলায় রামবাবু দক্ষিণেশ্বর গিয়ে দ্যাখেন ঠাকুরের ঘরের দরজা ভেজান রয়েছে। তিনি ঢুকে দ্যাখেন ঠাকুর ছোট খাটে বোসে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। প্রায় আধ ঘণ্টার পর, ঠাকুর ইঙ্গিত কোরে বোললেন, "কে রাম এসেছ, বোস বোস। আচ্ছা রাম; অতি ছোট জিনিষকে কি বলে"?

রামবাবু বোললেন, আজ্ঞে, অণু, পরমাণু, (ডোস)। ঠাকুর শুনে বোললেন, "তুমি যে সব নাম কোল্লে তার চেয়েও ছোট এক জিনিষ আছে, তার ভেতর বোসে তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি নিখুঁত কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। আর যে গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে সে গুলোকে আবার নূতন ছাঁচে ফেলে, খুব সূক্ষ্ম ভাবে যিনি গড়ছেন, সেই মার কোলে এতক্ষণ আমি বোসেছিলুম। মা আমার কেবল সিংহবাহিনী 'নন, তিনি আবার 'বিন্দুবাসিনী' ও হচ্ছেন"। এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হলেন।

কমল। (প্রবোধ)। বেশ চমৎকার কথা শোনা গেল। ঠাকুরের কথায় আছে, 'প্রকৃতি ও পুরুষ না হ'লে সৃষ্টি হয় না।

প্রকৃতিই সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেন, গিন্নীর মত। সৃষ্টির পূর্ব্বে মা কালী নিরাকার ভাবে মহাকালের সঙ্গে ছিলেন। আর কালীই নানাভাবে লীলা কোরছেন"।

পরে, এ বিষয় আলোচনা কোরে জানা হল যে, সৃষ্টি তত্ত্বে আছে যে 'মম যোনি মহদ ব্রহ্ম তস্মিনে গর্ভম দধামহ্যম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতাণাং ভবতি ভারত'॥ অর্থাৎ জগৎ প্রকাশ্যের কারণ স্বরূপ্ চিৎ প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ কোরে তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে আছে, যোনি শব্দের ভাবার্থ 'অহং সুবেপিত রমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনির পস্বন্তঃ সমুদ্রে'। 'সমুদ্রে' অর্থে 'পরমাত্মা'। 'অপসু' অর্থে যাহা ব্যাপিয়া থাকে। 'আমার যোনি অর্থে কারণ সমুদ্রে পরমাত্মায় সর্ব্ব জীবের বুদ্ধি বৃত্তি মধ্যে জ্ঞানরূপে আমার প্রকাশ'। 'সমুদ্রবন্তি' যাহা হইতে জীবগণ উদ্ভুত হয়।

অষ্ট মূর্ত্তিই বিশ্ব প্রপঞ্চ বা প্রকৃতি।

'ভূতস্য জাত পতিরেক অসীৎ'। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মকে প্রজাপতি এবং বিরাট পুরুষ অর্থে সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু সহস্র পাদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁহার মস্তক হ'তে আকাশ, নাভি হ'তে অন্তরিক্ষ, পদ হ'তে পৃথিবী, মন হ'তে চন্দ্র, নিশ্বাস হ'তে বায়ু হয়েছে।

আরও শাস্ত্রে আছে যে, 'আত্মা ইব জায়তে পুত্রঃ তৎ প্রেমাত্মার্ণমন্যত্র নৈব মন্যানিমাত্মানি'। অর্থাৎ আত্মাই পুত্ররূপে জন্মিয়া থাকে এবং এই আত্মানন্দ পুত্রে উপচরিত

হয়। মানুষের দেবতা যেন আত্মারই প্রতীক। আত্মরুচি বা আত্ম তৃপ্তিই পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবের হৃদয়ে প্রেমরূপ আনন্দ নিত্য বর্ত্তমান। আত্ম তৃপ্তির জন্যই অন্ত বস্তুতে সংক্রান্ত হয়। কিন্তু অন্যের জন্য আত্মায় আসে না। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন তাহা নিজের তৃপ্তির জন্যই, কিন্তু এই প্রীতির এরূপ শক্তি যে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই তাহাতে আনন্দ লাভ করেন।

ঠাকুর নাম কোরে নৃত্য করেন

৩-১-১৯৩২—১৮ই পৌষ, রবিবার, দশমী ১৩৩৮ সাল। সকালে কমল রামলালদাদার বাড়ী গিয়ে ছাখে তিনি দেব-দেবীর ফটোতে ধূপ দিচ্ছেন ও হাততালি দিয়ে নাম কোরছেন।

রামলালদাদা। "জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল। হরে মুরারে গোবিন্দ, বসু-দৈবকী নন্দন গোবিন্দ। হরে নারায়ণ গোবিন্দ হে। হরে কৃষ্ণ বাসুদেব"॥ ঠাকুর সকাল ও সন্ধ্যায় এইটী বোলে কখনও কখনও নৃত্য কোরতেন। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"।—(১৬ নাম ৩২ অক্ষর)। "রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব পাহিমাং। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং"॥ (এটা চৈতন্যদেবের জপ মন্ত্র ছিল)।

কমল। (রামলালদাদা)। আপনি আর একটী যে বলেন, "হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গৌরী শঙ্কর সীতারাম"।

রামলালদাদা। আমি একদিন এক জায়গায় হতে শুনে এসে

ঠাকুরকে শোনাই; তিনি শুনে বোললেন, 'বাঃ বেশ ত ঐ নামের মধ্যে সকলেই রয়েছেন'"।

বুনি। (স্বগত)। বল 'রামকৃষ্ণ অবিরাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম' এটা ওর সঙ্গে বোললে কেমন হয়?

(সংযোগ)। নামের শক্তি

একদিন শ্রীমকে (মাষ্টারমহাশয়) লন স্কুল বাড়ীর চার তোলায় শুনিয়েছিলুম, 'জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল হরে, রাধা মাধব কেশব হরে। জয় রামকৃষ্ণ গোপাল হরে', রাধা মাধব কেশব হরে'।

শ্রীম। (কমল)। বাঃবাঃ বেশ নাম। কমল। আজ্ঞে বৃন্দাবন হতে শুনে এসেছিলুম। শ্রীম। আমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে রোজ সকালে কতকগুলো হিন্দু হোটেলের ছাত্ররা বোলতে বোলতে যায়, "শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব"। আহা! কি নাম, ঠাকুর বোলতেন, নিতাই কোন রকমে জীবকে হরিনাম কোরিয়ে নিতেন। আর চৈতন্যদেব বোলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হোতে পারে কিন্তু কখনও না কখন এর ফল হবেই হবে। নাম কি কম জিনিষ, তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয় এক। 'মাগুর মাছের ঝোল, ধরা যুবতীর কোল, বোল হরিবোল। এর মানে পৃথিবীর উপর ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে হরিনামে কাঁদা। হেলায় শ্রদ্ধায় নাম কোর, কিছু হবেই হবে। অন্ততঃ তিন বৎসর উঠে পড়ে সাধনা কোর তখন বুঝতে পারবে। ধর্ম্ম জীবনে

প্রথমে খুব খেটে নিতে হয়, তারপর সফলতা আসে। সে খাটুনির ফল বৃথা যায় না। রোজ একটু একটু কোরতে হয় তবে ত হবে।

মাষ্টারমহাশয়ের মুখে এরূপ শুনে একটী কীর্ত্তনের বন্দনা গীত মনে পড়েছিল তা এই ঃ—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারি গোপীনাথ মদন মোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত্য সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাই কোরি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ॥
এই ছয় গোঁসাই যার মুই তার দাস।
তা সবার পদ-রেণু মোর পঞ্চ গ্রাম॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥
সদানন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন।
শ্রীগুরু চৈতন্য পাদ পদ্ম কোরি আশ।
হরি নাম সংকীর্ত্তন ক'রে নরোত্তম দাস॥

বুনি পরে দেখল্ যে কথামৃততে আছে শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মুখ ধুয়ে যে নামগুলি করেন তা এই ঃ—ঠাকুর রামনাম কোরে বলছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী গোপী। রাখাল জীবন কৃষ্ণ! নন্দ নন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ গোবিন্দ!

আবার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ। আলেখ নিরঞ্জন! জগন্নাথ! জগন্নাথ! দীনবন্ধু! আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর"! ঠাকুর গাহিতেছেন, 'উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জি'। নৃত্য ও গীত কোরে বোলছেন— "শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ! নারায়ণ নারায়ণ"!

ঠাকুর প্রার্থনা কোরে বোলছেন ঃ—

মা বিপদ নাশিনী গো বিপদ নাশিনী। ওমা, ওঁকার রূপিণী! মা। ওঁ হতে ওঁ শিব, ওঁ কালী, ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন।

মা, পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা, যেন জড় কোরো না। সেব্য সেবক ভাবে রেখো। মা! যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম কোরতে পারি, আর তোমার নাম গুণ কীর্ত্তন কোরবো, গান কোরবো মা। আর শরীরে একটু বল দাও মা; যেন আপনি একটু চলতে পারি, যেখানে তোমার

কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেন যেতে পারি"।

বুনি (স্বগত) ওঁ আদি যুগাদি, সহস্র মূর্ত্তয়ে, সহস্রনাম্নে, সহস্র কোটী যুগ ধারণে সর্ব্বাত্মনে। অনন্তরূপায়, সর্ব্বসম্ভবায়, সর্ব্বেশ্বরায়, সর্ব্ব পাপ বিমোচনায়, সর্ব্ব দুঃখ প্রশমনায়। ত্রৈলোক্যনাথায়, প্রাণবল্লভায়, জগৎপিতায়, সর্ব্ব দেবদেবী-স্বরূপায়, শ্রীগদাধর রামকৃষ্ণ তোমায় ভূয়োঃ ভূয়োঃ প্রণাম কোরি।

তদব্রহ্ম সচ্চিদ ভূবি রামকৃষ্ণ মম জীবন। হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি সাধন ভজন জ্ঞান ভক্তি ক্রিয়া হীনে, কৃপা কটাক্ষ কুরুদেব নিত্যম। ত্বমেব সর্ব্বম মম পরম দেবদেব। শরণাগতস্মী শরণাগতস্মী শরণাগতস্মী।

স্তোত্রস্য স্তোত্রং মনসোমনঃ, বাচো বাচং প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষু।

ধীরাঃ প্রেত্যোসাস্মাল্লোকাদ মৃতাভবন্তিঃ।

নহিকল্যাণ কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং গচ্ছতি।

অর্থাৎ যাঁর ধ্যানে যুগে যুগে,—শ্রবণে যিনি শ্রুতির শ্রুচতি, মনের মন মানসে, প্রাণের প্রাণ হৃদয়ে যিনি, আঁখির আঁখি নয়নে, বচনে যিনি মন্ত্র সম। যাঁহার করুণা পেলে তুফানেও হয় না তরি ডুবি।

মানুষের ইচ্ছা না ভগবানের ?

২১-১০-১৯৩০—৪ঠা কার্ত্তিক, কালীপূজা, মঙ্গলবার ১৩৩৭ সাল।

কমল মন্দির হয়ে বৈকাল ৪॥টার সময় রামলাল দাদার বাড়ী

গেল। দাদা কমলকে সিন্দূরের টিপ পরিয়ে দিলেন ও অর্দ্ধেক সন্দেশ দিলেন। দাদা কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

রামলালদাদা। (ভক্তগণের প্রতি)। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, মানুষের ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা কিরূপে জানা যায়? রামলালদাদা। ঠাকুর শুনে বোলেছিলেন, "মনে করো একজন কাশী যাবে, বোলে সমস্ত ঠিক করে বসে আছে। এমন সময় টেলিগ্রাম এল যে, তোমার ভাইয়ের অসুখ যায় যায় অবস্থা, তুমি যদি আস ত দেখা হতে পারে। সে তখন ছট্‌ফট্ করে তাড়াতাড়ি বাঁকুড়ায় চলে গেল, কাশী যাওয়া আর হল না। এখন ভেবে দেখ কার ইচ্ছা"।

কমল। (স্বগত)। মানুষ ভাবে এক ঈশ্বর করেন আর এক।

রামলালদাদা। (ভক্তগণের প্রতি)। একটি বিড়ি সেবন হোক না। ভক্তরা। আজ্ঞে আমরা কেউ খাই না।

রামলালদাদা। যদি কেউ না খায় ত একলা খেতে কি রকম লাগে, ঠিক আনন্দ হয় না। গাঁজাখোরের আনন্দ হয় সকলকে দিয়ে খেলে, সকলে খাবে তবে ত তার দেখে আনন্দ হবে। একটা খাই, কমল এনেছে নইলে কি মনে কোরবে। (কমল। ভারি ত জিনিষ এক পয়সায় আটটা বিড়ি)।

তারপর দাদা ভক্তগণকে প্রসাদ দিলেন। পুনরায় কমলকে প্রসাদী সন্দেশ অর্দ্ধেকটা দিয়ে দাদা বোললেন, এইবার পূর্ণ হল। তারপর সকলে মিলে আমাদের মন্দিরে আসা হল। দাদা

দর্শনাদি কোরে বাড়ী গেলেন, কমল তিনটি গান গেয়ে রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী যাত্রা করল্।

লীলা বোঝা ভার।

৩১-৫-১৯৩১—১৭ই জৈষ্ঠ্য, রবিবার, শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা পূর্ণিমা ১৩৩৮ সাল। কমল বেলা ৫টার সময় রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। তোমার পত্র পেয়েছি, কি আর বোলব, তুমি সুখ দুঃখের কথা বল, তবে শোন—

"মাতা মহেশী পিতা মহেশ" (কে না শঙ্কর ; শং. মানে মঙ্গল, কর মানে, যিনি করেন = যিনি মঙ্গল করেন তিনি হচ্ছেন শঙ্কর)। এ হেন গণেশ খলু বিঘ্ন নাশ, তথাপি শিরে করি মুণ্ড ধারণ, কপাল, মূলং"। অর্থাৎ এমন যার বাপ মা তার ছেলের কি না হাতীর মাথা হল। তা কি জান, 'কপালে লিখিতং ধাতা' কে খণ্ডাবে বল। বিধাতা যে নিয়ম গুলি কোরেছেন সে গুলি ত আর বদলাতে পারেন না, তা হলে মিথ্যাবাদী হয়ে যান। কমল। যিনি এই নিয়ম আইন কোরে সৃষ্টি কোরেছেন, তিনি আবার ভাঙ্গতেও ত পারেন? রামলালদাদা। হ্যাঁ, এমনত দেখি, যার আয়ু ছিল ৩০ বৎসর, তার হয়ে গেল ৫০ বৎসর। ঠাকুর বোলতেন, "বিধাতার আইন কানুন বোঝা যায় না"। ছাখ, ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু ছিল অর্থাৎ অমর, কিন্তু শর-শয্যায় শুয়ে কাঁদছেন, যে ভগবানের লীলা খেলা কিছুই বুঝতে পারলুম না ; এই দুঃখ। আবার ছাখ পঞ্চ পাণ্ডবের সখা যিনি শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বদাই যাদের

কাছে কাছে রয়েছেন তার মধ্যে ছ্যাখ, কেউ গেলেন বনে, কেউ যুদ্ধে, তবুও তাঁদের কত কষ্ট হয়েছে"। কমল। তবে গানে আছে, 'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বোলে কেন ডাকা তবে গো মা'। রামলালদাদা। হ্যাঁ, ঠাকুর বোলতেন, "ভগবানের লীলা খেলা, মায়া এ সব বোঝবার যো নেই। যেটা সম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে; আবার যেটা অসম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় সম্ভব হয়ে যাচ্ছে"। রামলালদাদা। ঈশান মুখোজ্যেকে ঠাকুর কি বোলেছিলেন শোন :—

নাম মাহাত্ম্য

"আচ্ছা ঈশান, রেলে রেলে ঠোকা ঠুকি হয়ে কত লোক বেঁচে গেল, আবার কত লোক মরে গেল। তা এ থেকে বোঝা গেল, যারা দুর্গা বোলে যাত্রা কোরেছিল তারাই বেঁচে গেল। আর যারা দুর্গা বোলে যাত্রা করেন নি তারাই মরে গেল। একজনের কপালে লেখা ছিল পায়ে ফাল ফুটে ঢুকে যাবে। সে দুর্গা বোলে পথে যাচ্ছে, এমন সময়ে তার পায়ে কুশ ফুটে গেল। এ থেকে বোঝা গেল যে ঐ দুর্গানামের গুণে অল্পের মধ্যে কেটে গেল কি বল" ? ঈশান। আজ্ঞে হ্যাঁ।

একাদশ অধ্যায় ঃ কুকুর কাপ্তেন

১৬-১০-১৯৩১—২৯শে আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর লম্বা বারাণ্ডায় সন্ধ্যার সময় রামলালদাদা, কমল ও একজন ভক্ত বস্‌লেন।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর বোলতেন, "এখানকার কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত ধন্য হয়ে গেল। দ্যাখনা, মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে, গঙ্গা দর্শন কোরছে, গঙ্গা জল খাচ্ছে, মন্দিরের চারিদিকে যাওয়া আসা কোরছে"। একটা কুকুর ছিল ঠাকুর তাকে কাপ্তেন কাপ্তেন কোরে ডাকতেন। সে প্রায়ই মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকতো। ঠাকুর কাপ্তেনকে ডাকলেই সে এসে ঠাকুরের পায়ে গড়াগড়ি দিত, ঠাকুর তাকে লুচি সন্দেশ খেতে দিতেন। ঠাকুর বোলতেন, "দ্যাখ, এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ ত মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর মত কই কাকেও ত দেখিনি। এ কাপ্তেনটা শাপ-ভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে, ওর পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার যা ছিল তাই এখানে এসে কোরছে, ধন্য হয়ে গেল"।

আশ মিটিয়ে দেখা

১-১০-১৯৩১—১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮ সাল। কমল বৈকালে রামলালদাদার বাড়ী গেল।

রামলালদাদা। মার মন্দিরে যদি কেউ চোখ বন্ধ কোরে ধ্যান কোরতো, কি জপ কোরতো, তা দেখে ঠাকুর তাকে বোলতেন, "এখানে আবার ওসব করা কেন গো। সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ কোরছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নাও। ওসব বাইরে চলে, যেখানে অনুভূতি হবে না, এখানে ওসব কোরো না। মনেকর, তুমি তোমার আপন মার কাছে গেছ মাকে

দেখতে, তুমি কি চোখ বন্ধ কোরে মার কাছে বসরে না মালা জপতে বোসরে" ?

(সংযোগ)। আগে দর্শন পরে অন্য কিছু

একদিন গরমিকাল রবিবার দিন—মাষ্টারমহাশয়ের স্কুল বাড়ীর তিন তোলার ঘরে জিতেনবাবু (উকিল), কার্ত্তিক (ডাক্তার), ললিত (ভাটপাড়ার), অমৃতবাবু, কমল প্রভৃতি সন্ধ্যার সময় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীম। (ভক্তগণের প্রতি)। তিনি (ঠাকুর) প্রায়ই বলতেন, যে "বিদ্যালাভ করলে ভগবানকে জানা যায় সেই হল বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা। গীতা—'যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকংততঃ। যাঁকে লাভ কোরলে অন্য কোন লাভ বেশী বোলে মনে হয় না। সাধন, ভজন, সাধুসঙ্গ, কতক্ষণ, যতক্ষণ না স্বরূপকে চিনতে না পারা যায়। শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না, ধারণ কোরে সাধন করতে হবে। ভগবান দর্শন হ'লে তখন বিদ্যা, শাস্ত্র যা কিছু বল, সব খড়কুটো বোলে মনে হবে।"

বুনি (স্বগত)। শাস্ত্র বোলতে বোঝা যায় যে গীতা, চণ্ডী, ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব্ব ইত্যাদি। 'ষড়দর্শন'—গৌতমমুনির—ন্যায়দর্শন, কনাদের—বৈশেষিক, কপিলের—সাংখ্য, পাতঞ্জলির—পাতঞ্জলদর্শন, ব্যাসদেবের—বেদান্তদর্শন, জৈমিনির—কর্ম্মমীমাংসা। এই ছয় জন মুনির বাক্য বা মত নিয়ে যা কিছু হয় শোনা যায়। ষড়দর্শন না পড়লেও পঞ্চদশী

No. ......
... Ashram

পড়লে অনেক কিছু জানা যায়। কিন্তু উনি যা বলছেন, তা ঠিক, কারণ যাই পড়া যাক না কেন ধারণ কোরে সাধন কোরতে হবে, বিনা সাধন ভজনে তা ঠিক ঠিক বোঝা বা ধারণা করা যায় না—।

শ্রীম। "জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল আগে সাধন ভজন কোরে ঈশ্বর লাভ, পরে যা কিছু। হাজার লেখা পড়া শেখ আর যা কর, ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না আসলে, তাঁকে লাভ না কোরতে পারলে সব মিছে, দু'দিনের জন্য।"

'শাস্ত্রের দু'রকম অর্থ। শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থটুকু নিতে হয়। তাই তিনি (ঠাকুর) বলতেন, আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিশলে কিছুই নিই না'।

'বিশ্বাস ভক্তিতে নির্জ্জনে ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরকে ডাকলে সত্যি, মাইরি বলছি দেখা পাবে। ভগবান দর্শন হ'লে চারটী অবস্থা হয়। বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ। এ অবস্থা যাদের মধ্যে আসেনি তারা হাজার বলুক যে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে বিশ্বাস কোরো না। আর একটি থাকা চাই সরলতা'। একি কম জিনিস, বহু জন্মের সাধনা থাকলে তবে হয়'।

মাষ্টারমহাশয় এই কথাগুলি বলতে যীশুর কথা একটা মনে পড়ে যায় যে তিনি বলেছেন, 'সত্যি বলছি যদি কেউ ক্ষুদ্র শিশুর মত স্বর্গরাজ্যকে গ্রহণ করতে না পারে তাহা হইলে সে তথায় প্রবেশ করতে পারবে না'।

খৃষ্টানি মত

২৮-১০-১৯৩১-১১২ কার্ত্তিক, বুধবার, দ্বিতীয়া ১৩৩৮ সাল। কমল বিকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ঘরে গান করছিল। এমন সময়ে রামলালদাদা এলেন, দাদাও কয়েকটি গান গাইলেন। তারপর দাদা বোললেন ঃ—

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর একদিন বোল্‌লেন, "ওরে রামলাল, আলমবাজার থেকে মিটে কড়া তামুক, জোয়ান, কাবাকচিনি এ সব কিনে আন দিকিনি"। আমি আনতে গিয়ে পথে দেখি, একজন খৃষ্টান বক্তৃতা দিচ্ছে, পাপের বিষয় বোলছে। আবার "মথি লিখিত সুসমাচার" নামে বই বিলি কোরছেন। এই দেখে আমিও একটা বই নিলুম। ঠাকুরের কাছে আসতে তিনি দেখে বোললেন, "ওটা কি বইরে? একটু পড়না শুনি"। আমি শোনাতে লাগলুম, ঠাকুর শুনে বোললেন, "থাক থাক, দূর কর দূর কর, কেবল পাপ কেবল পাপ এই সব কথা লেখা। ওটা বলতো, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী"। আবার বোললেন, "যিনি মহারাজা এ বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননা রে মন আমি পুত্র তাঁর"।

পাপ ও মন

(সংযোগ)। স্থান ঃ—দক্ষিণেশ্বর, রামলালদাদার বাড়ী। একদিন দাদা কয়েকটী ভক্ত সঙ্গে কথাবার্ত্তা বোলতে ছিলেন। এমন সময়ে কথায় কথায় পাপ ও মনের বিষয় উঠে। তিনি যা বোলেছিলেন তা এই ঃ—

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর বোলতেন, মনের মধ্যে যদি হঠাৎ একটা পাপের চিন্তা এসে পড়ে তা'হলে তত দোষের হয় না। আর পাপ কোরছি এ বোধ যদি তিনি (ঈশ্বর) না দিতেন ত মানুষের পাপ আরও বেড়ে যেত।

মন আর ভাব আসল জিনিষ। **ভগবান মানুষের মন দেখেন। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'।** মন নিয়েই ত যা কিছু পাপ, পূণ্য, সুখ, দুঃখ কত কি। **এই মন মত্তকরীকে বশ কোরতে পারলে তার অন্তরে মা জগদ্ধাত্রীর উদয় হয়।** মা সিংহ বাহিনীর ছবি দেখোছো? সিংহ করীকেও (হাতী) জব্দ কোরে রেখেছে মাথা তুলতে দেয় না। আর সিংহ পীঠে মা ভগবতী স্থির হয়ে বসে আছেন। ঠাকুর প্রায়ই বোলতেন, 'মানুষের মন কামিনী কাঞ্চনে থাকে তাই মনটা ভগবানের দিকে দিতে পারে না'।

রামলালদাদা ঐ কথাগুলি বলবার পর, পরে মনে এল, যে ঠাকুরের কথায় আছে যে "মেঠো পুকুরের জল সূর্য্যের তাপে আপনি শুকিয়ে যায়। তখন তাঁর (ভগবানের) নামে পাপ পুস্করিণীর জল শুকিয়ে যায়"।

স্বামিজীর কথায় আছে, "সামাজিক পাপ থেকে সব শত্রু আসে। আগে ভেতর থেকে পচতে সুরু হয় তারপর বাহির থেকে শত্রু এসে ধ্বংস করে"।

স্বামিজী সামাজিক পাপের বিষয় যা বোলেছেন তা থেকে বোধ করা যায় যে সচরাচর যা পাপের কাজ দেখা

ও শোনা যায় যেমন—প্রবঞ্চনা, অনাচার, নারী হরণ, নারীদের ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা, বিষপ্রয়োগে হত্যা প্রভৃতি।

নানারকম পাপের কাজ দেখে শুনে তাই সাধু লোকেরা বলেন, যে রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর দোষে গৃহ নষ্ট শিষ্যের পাপের জন্য গুরুকেও ভুগতে হয়—পাপআত্মার মুখের দিকে তাকালেও তার বাতাসেও পাপ অর্সায়। ঠাকুরের কথায় আছে, কোন পাপআত্মা ব্যক্তি যদি ঠাকুরের পা স্পর্শ কোরতেন, ঠাকুর অমনি উফ্ উফ্ কোরে বোলতেন, "ওরে রামলাল, গঙ্গাজল নিয়ে আমার পা টা ধুয়ে দে, ওখানটা বসেছিল গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দে, ১৪ হাত মাটি পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে যায়"।

পাপ ও মন খুব চিন্তা কোরে শেষে দেখি ঠাকুর ঐ বিষয় যা বোলেছেন, তাই ঠিক। ঠাকুরের কথায় (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে) আছে ঃ—

শ্যামবাবু। (ঠাকুর)। পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর করাচ্ছেন এ কি রকম কথা ?

ঠাকুর। (শ্যামবাবু)। 'ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয় তিনি কি অন্যায় করেন ? পাপের শাস্তি দেবেন কি না দিবেন সে তিনি বুঝবেন। তোমাদের ঐ এক কলকাতার লোকগুলো, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ, কেননা তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ। যাতে ভক্তি হয় তাই চেষ্টা কর। তোমার এতশত কাজ কি? ফিলজফি লয়ে বিচার কোরে তোমার কি হবে? আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে ও হিসাবে তোমার কি দরকার”?

মহিমমহারাজের লিখান “শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান” বইতে আছে এই ঃ—

শিখসেপাই। (ঠাকুর)। আমরা মারপিঠ, সরকারি হুকুমে আমাদের গুলি কোরে মারতে হবে—এইরূপ অবস্থায় আমরা সংসারে কি রকম থাকবো?

ঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিতেই সম্মুখে দেখেন একটি ঢেঁকি আসিয়া ধান ভানিতে লাগিল।

ঠাকুর। (সেপাইদের)। “দেখ ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু নীচু উঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে, কিন্তু দু' পাশের দুটো কাটি দুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, তাতে কোন ব্যতিক্রম হয় না ঠিক এইভাবে মন রেখে কাজ করো”।

মহিমমহারাজ। 'সূক্ষ্ম মন জগতকে অন্য প্রকারে দেখে—ভাবসমূহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। এই দর্শন হইল স্থির, নিশ্চল ও গম্ভীর। অপর কথায় ইহাকে বিভোর বা তন্ময় অবস্থা বলা হয়। দর্শনশাস্ত্রের বা রাজযোগের সূত্র হইতেছে 'সত্য' প্রথমে চিত্ররূপে সম্মুখে আসিয়া থাকে'।

ঠাকুরের কথায় আছে, "শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই জিনিষ। যে মনে, যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনিই মহাকারণ—কারণের কারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম। শুদ্ধমনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা।

মহর্ষি পাতঞ্জল মতে ঃ—প্রাণ বায়ু চঞ্চল হইলে চিত্ত চঞ্চল এবং প্রাণ বায়ু স্থির থাকিলে চিত্ত স্থির থাকে। যোগীগণ বলেন ঃ—প্রাণ বায়ুরূপী প্রাণশক্তিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ ও স্থান বিশেষে ধারণ করিতে পারিলে মানুষ তাহার শরীর ও মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে।

মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনই আত্ম স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া মুক্তিলাভের এক মাত্র উপায়। মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে কর্ম্ম ও ভক্তি জ্ঞান কোন সাধনই সম্ভব নয়। চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধই যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি অজ, আমার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আপনি মায়ায় জন্ম গ্রহণ করি"।

ঠাকুরের কথায় আছে ঃ—"কর্ম্মের দ্বারা আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হলে সব জানতে পারা যায়। ভক্তিতে কুম্ভ আপনি হয়। একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায় আর বায়ু স্থির হলে মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে টের পায় না।"

ভক্তির বিষয়ে ঠাকুরের কথায় আছে :—"নিষ্ঠা ভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ সোজা হয়ে উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। উর্জ্জিতা ভক্তি প্রেমে হাসে, কাঁদে, নাচে গায়"।

জ্ঞান, বিবেক বৈরাগ্য চাই

(সংযোগ)। স্থান :—শ্রীময়ের সাদা স্কুল বাড়ীর তিন তোলার ঘর। সন্ধ্যা প্রায় ৭৷৷০টা। একদিন মাষ্টারমহাশয় ভক্তগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বোলছেন। উপস্থিত কমল, বীরেন, (এটর্নি), ফকির (মাষ্টার) গোপেন (শ্রীময়ের নাতি), সুখলাল, প্রভৃতি।

শ্রীম। (ভক্তগণ প্রতি) 'ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান ও তাঁকে ভুলে থাকার নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এইটি জানার নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষ কোরে জানার নাম বিজ্ঞান। যার চৈতন্য হোয়েছে সেই মানুহুঁস। চৈতন্য না হোলে বৃথা মানব জন্ম। ঠাকুর বোলতেন, জ্ঞানের দুটো লক্ষণ—কুটস্থ বুদ্ধি, হাজার কষ্ট বিপদ হোক নির্ব্বিকার। আর যাদের শুচিবাই, বাঁকামন, বিদ্যার, ধনের, পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব এসব থাকে তাদের কখন জ্ঞান হয় না। সদাসৎ বিচার করতে হয়। বিষয় বুদ্ধি মনে বদ্ধ রেখে ভগবানের নাম করলেও যেমন কিছু হবে না, তেমন বিবেক, বৈরাগ্য ছাড়া ভগবান দর্শনও হবে না'।

একটু পরে শ্রীম আবার বোলছেন।

শ্রীম। তিনি (ঠাকুর) বোল্‌তেন, "আমি দেহ, মন, আত্মা

নই এসব বোধ কলিতে হওয়া মুস্কিল। আর ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ জ্ঞান হোলে মনের লয় হয়ে সমাপ্তি হয়। সমাধির লক্ষণ হোচ্ছে—যদি ভেতর থেকে মহাবায়ু গড় গড় কোরে উঠে মাথার দিকে যায় তখন্ যদি সমাধি হয় ত ভগবান দর্শন হয়। আর একটি লক্ষণ হোচ্ছে খুব আনন্দ হয় সঙ্কোচ থাকে না।

শ্রীম, গুণ গুণ কোরে গান কোরলেন, 'কবে সমাধি হব শ্যামা চরণে'।

শ্রীম। (কমল)। ঐ গানটা শোনাও না, ভুবন ভুলাইলি মা। কমল গাইল। শ্রীম; স্থির হোয়ে শুনছেন ও মধ্যে মধ্যে মাথা নীচু কোরে ঢুলছেন, যেন মনে হোচ্ছে তিনি মা ভগবতীকে প্রণাম কোরছেন।

……শ্রীম। (ভক্তগণ প্রতি)। 'তত্ত্ব জ্ঞানই হোল জ্ঞান। সেন্স নলেজ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া যে জ্ঞান তাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে না। তত্ত্ব জ্ঞান ইন্দ্রিয় লাভের দ্বারা ঠিক করা যায় না। তিনি (ঠাকুর) বোলতেন, জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, শান্তস্বভাব, আর অভিমান থাকবে না। জ্ঞানের পর ভক্তি, এর মানে তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তি।'

পরে, ভেবে দেখি যে মাষ্টারমহাশয় সমাধির বিষয় যা জানালেন এছাড়া ঠাকুরের কথায় আরও আছে। কথামৃত ৪র্থ ভাগে ২৬৮ ও ২৭৭ পৃষ্ঠা :—ঠাকুর, বোলছেন, "সমাধি মোটামুটি দুই রকম—"জ্ঞানের পথে বিচার করতে করতে অহং

নাশের পর যে সমাধি তাকে স্থির সমাধি বা জড় সমাধি (নির্বিকল্পসমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদের জন্য, রেখার মত একটু অহং থাকে। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থাকলেও সব ধারণা হয় না"।

"হৃষিকেশ সাধু বলে সমাধি পাঁচ প্রকার। তা তোমার (ঠাকুরের) সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষীবৎ, তির্য্যগবৎ।

১। কখন বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত সির্ সির্ করে। ২। কখনও সমাধি অবস্থায় ভাবসমুদ্রের ভিতর আত্মা মীন আনন্দে খেলা করে। ৩। পাশ ফিরে রয়েছি মহা বায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে আমোদ করে। বায়ু হঠাৎ লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়, তাইত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। ৪। পাখীর মত এডাল, ওডাল মহাবায়ু উঠতে থাকে। যে ডালে বসে সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান—থেকে হৃদয়—এইরূপ ক্রমে ক্রমে মাথায় উঠে। ৫। মহাবায়ু তির্য্যগ গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে। শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়"। আরও ঠাকুরের কথায় আছে :—"স্থিত সমাধি—একেবারে বাহ্যশূন্য, অনেকক্ষণ হয়ত অনেকদিন রইল। আর উন্মনা সমাধি—হঠাৎ মনটা চারদিকথেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।"

(সংযোগ)। **ভক্ত ও ভক্তি**

একদিন রামলালদাদা ও কমল দক্ষিণেশ্বর হতে কলকাতায় এসে 'রূপবাণী বায়স্কোপে' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দ্যাখেন। তারপর ভক্ত ও ভক্তির বিষয় তিনি যা বল্লেন তা এই :—

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর ভক্তির মানে বোলতেন, কায়মনবাক্যে ভগবানের পূজা ভজনাদি করা। ভক্তিতে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

কমল। (রামলালদাদা)। ~~গীতায়~~ ভাগবতে আছে—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি হে নারদ'॥

রামলালদাদা। (কমল)। হ্যাঁ, ঠাকুর বোলতেন, ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের জাতি নেই।

কমল। (রামলালদাদা)। প্রহ্লাদের কি জ্বলন্ত ভক্তি বিশ্বাস ছিল এমনটা আর দেখা যায় না।

রামলালদাদা। (কমল)। আহা! ওর উপমা আর নেই, কত জন্ম জন্ম তপস্যা কোরে তবে অল্প বয়সে ভগবানের কৃপা দর্শন হোলো। ঠাকুর বোলতেন, 'কলিকালে জীবের অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু তাই নারদীয় ভক্তি। আর অন্তরে শাক্ত, বাইরে শৈব ভাব আর মুখে হরি বোল বোলতে হয়'। আর ছাখ, নারদের মন্ত্র, যাগযজ্ঞ, তপস্যা কিছুই ছিল না।

কেবল সে বীণা নিয়ে অহরাত্র হরিনাম কোরছে। সেজন্য সে ত্রিভুবন জয় কোরেছে। ভক্তির স্তর অনেক আছে। শুদ্ধা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, ঊর্জ্জিতা ও রাগভক্তি। ওসব ঈশ্বর কোটীর হয়, জীব কোটীর হয় না'।

বুনি। (স্বগত)। 'কর্ম্মনা জায়তে ভক্তি ভক্তা জ্ঞানঞ্চ জায়তে'। অর্থাৎ কর্ম্ম হতে ভক্তির এবং ভক্তি হতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সকল কর্ম্মের মূলে দীক্ষা। 'দীক্ষা মূলং জপং সর্ব্ব, দীক্ষা মূলং পরন্তপঃ। দীক্ষামাশ্রিত নিবসেদ যত্র কুত্রাশ্রমেবসন' ॥

(দীক্ষা নেবার সময় প্রশ্ন হয়ে থাকে যে মহাশয়, শাস্ত্রে মন্ত্র দিবার যে নিয়মগুলি লিখিত আছে, যদি সেইরূপে করা না হয় তাহা হইলে কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে সর্ব্ব প্রথমে জানা আবশ্যক, শাস্ত্র বেদ, পুরাণ, আইনকানুন কার কে সৃজন কোরিয়া গিয়াছেন? যদি ভগবান, ঋষি মুনিগণ অথবা অবতারাদির সৃষ্টি হয় তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি ভগবান কিংবা অবতার অথবা সিদ্ধলোক এবং তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ সিদ্ধলোক ছিলেন না?

ভগবান ছিলেন বলিয়া যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোনও প্রশ্ন হইতে পারে কি? কারণ ভগবান সত্য কিংবা মিথ্যা যাহাই করুন, তাহাই ঠিক হইবে। ইহা যদি সর্ব্ববাদি সম্মত হয়, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর সিদ্ধ

অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ যাহাকে যেরূপ ভাবেই শিক্ষাদীক্ষা দিয়া থাকুন, সে সম্বন্ধে কোন সাহসে কে প্রশ্ন করিতে পারেন ?

যিনি যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবেন আগে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। এবং যদি মন প্রাণ চায় ও তাঁর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আসে তবে তাঁহার নিকট দীক্ষা বা মন্ত্র লইতে পারেন। কিন্তু দীক্ষার পর যদি গুরুর প্রতি কোন কারণ বশতঃ অবিশ্বাস, অভক্তি আসে ত শিষ্যের খুবই হানি হয়। যিনি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া যাহাকে গুরুত্বে বরণ করিবেন তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া ধারণা বা বিশ্বাস করিবেন নচেৎ কোন কাজেরই হইবে না। এইস্থলেই গুরুবাক্যে ও কর্ম্মে বিশ্বাসের আবশ্যকতা আসিতেছে। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কাহারও জিহ্বায় নাম লিখিয়াছিলেন, কাহারও হৃদয় স্পর্শ বা কাহারও মস্তকে পাদুকা প্রদান করিয়াছিলেন এবং কাহারও মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ ইহারা ভগবান ঠাকুরের আদেশ ব্যতীত কখন কাহাকেও শিক্ষাদীক্ষা দেন নাই।

("দীক্ষায় শাস্ত্র নিয়ম অত্যাবশ্যক কিনা"—'দৈনিক বসুমতী'। ১লা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৩ সালে, ঐ লেখা বাহির হয়)। বিচার কোরে দেখলে দেখা যায় যে জগৎ চিত্ত বা মন আর ভগবান এই নিয়েই যা কিছু সব হচ্ছে। আর

উদ্দেশ্য দেখে বিচার করা দরকার, কার্য্য দেখে নয়। তুলসীদাসের কথায় আছে, 'তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলে তখন তুমি কেঁদেছিলে আর জগৎবাসী হেসেছিল। এখন তুমি এমন কর্ম্ম কোরে চল যারজন্য তুমি হাস এবং তাহারা কাঁদে'।

ঠাকুরের কথায় আছে—"ভক্ত মায়া ছেড়ে দেয় না, মহামায়ার পূজা করে। ভক্তেরা কিন্তু মুক্তি চায় না। বিদ্যা মায়া থাকলে আবার ফিরে ফিরে আসতে হয়। যারা কেবল শুদ্ধ ভক্ত তারাই থাকবে। যদি কাশীতে কারুর মৃত্যু হয় তা, হলে মুক্তি হয়। আর আসতে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি। যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না।

ভক্তের কি করা কর্ত্তব্য

শ্রীময়ের লাল স্কুল বাড়ী (৫০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) চার তোলার ছাদ। ইং ১৪-২-১৯৩১-২রা ফাল্গুন শনিবার দ্বাদশী ১৩৩৭ সাল। কমল ও কয়েকটী ভক্ত উপস্থিত।

শ্রীম। (ভক্তদের প্রতি)। ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান আর তাকে ভুলে থাকার নাম অজ্ঞান। অজ্ঞানে মানুষ কিনা বলে কিনা করে। যে মানুষ জন্মাবার পূর্ব্বে কিছুই জানে না ঘুমবার সময় কিছুই জানে না, মুখে যদি কেউ প্রসাব করে দেয় তাও যার সাড় থাকে না, সে মানুষ কি করে বলে যে আমি সব জানি সব বুঝি। তাই আগে সাধন ভজন না করলে কিছুই জানা যায় না। তুমি হাজার বল আর- যাই কর যতক্ষণ না ঠিক ঠিক জ্ঞান আসে ততক্ষণ কিছুই বোঝাবার

যো নেই। তোমাদের রোগ লেগেই আছে তাই বলছি, তোমরা সাধুসঙ্গ কর, তবে ত এ সংসার অনিত্য বলে বোধ হবে।

শ্রীম। সংসারের কাজ লেগেই আছে, বাজার যাওয়া খাওয়া কত কি কিন্তু ঈশ্বরের কথা ত আর রোজ হয় না। যেখানে সাধুরা থাকেন বা ঈশ্বরের কথা হয় সেখানে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিট বসে দেখা শোনা ভাল।

যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা বেশী কিছু চায় না, বেশী টাকা কি বিষয় থাকলে জড়িয়ে পড়বে কিনা। ভক্তের পেট চলার মত রোজগার হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট হল। আবার এমন মজা, সাধারণ লোকের সঙ্গে ভক্তের মিশ খাবে না। আবার অনেকে আছেন pension (পেন্‌সন্) নিয়ে কাজকর্ম্ম করছেন। সর্ব্বদাই সংসার নিয়ে ও টাকার জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছেন। এমন মনুষ্য জন্ম পেয়ে দুটো ভাতের জন্য, টাকার জন্য নিজেকে চির জীবনটা নষ্ট করছেন'। (এই কয়েকটি কথা শ্রীম প্রায়ই বলতেন)।

(সংযোগ)। বুনি। (স্বগত)। উনি সংসার অনিত্য বিষয় যা বললেন, ঠাকুরের কথায় আছে :—

বলরাম। (ঠাকুর)। সংসার মিছে এরূপ জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হল? ঠাকুর। "ওদের কেমন জ্ঞান, আগে ফল তারপর ফুল! আগে দর্শন তারপর গুণমহিমা শ্রবণ, তারপর মিলন"।

ভগবান গীতায় ভক্তের লক্ষণ বিষয় বলেছেন, 'যস্মান্নোদ-

বিজিতে লোকো, লোকান্নোদবিজিতে চ সঃ'। এ বিষয়ে ঠাকুরের কথায় আছে—"একজন রজক সে ব্রাহ্মণকে মারে ব্রাহ্মণ ভগবানকে ডাকিতে থাকে। ভগবান ছুটে আসছেন তাকে রক্ষা করতে। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ রজককে গালি দেয়। ভগবান ফিরে গেলেন—শালা ধোপা হয়ে গেল"। গীতায় ভগবান বলেছেন—'শুভাশুভ পরিত্যাগী, ভক্তিমান্ যঃ সমে প্রিয়'। ঠাকুরের কথায় আছে, "যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের ভাব অন্য রকম। তারা জানে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা। তাদের হিসাবকরে পাপ করতে হয় না। ঈশ্বরের উপর তাদের এতই ভালবাসা যে, যে রকমই তারা করে তাহাই সৎকর্ম্ম। কিন্তু তারা জানে এ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই আমি ঈশ্বরের দাস। ঈশ্বরই সব করছেন। যেমন একজন সাধুকে একজন মেরে অজ্ঞান কোরে চলে যায়। আর একজন এসে তাকে দুধ খাওয়ায় ও জিজ্ঞাসা করে তোমায় কে মেরেছিল। সাধু বল্লেন, যিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনিই মেরেছেন। ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এমন অবস্থা হয় না"। গীতায় ভগবান আরও অর্জ্জুনকে বলেছেন, 'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মা মনুস্মর যুদ্ধ চ'। 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন॥' অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি আমার হাতে যন্ত্র স্বরূপ—। তাই ঠাকুর বারবার বলেছেন যে, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি। ঠাকুর আরও বলেছেন, "শরণাগত ব্যতীত ঈশ্বরকে জানা যায় না। তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না।

আমি কেবল মা মা বলে ডাকি, মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয় নাই জানাবেন"। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ"। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবেই আমারই শরণ লও"।

স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ

(সংযোগ)। স্থান :—স্বামীজির বাড়ী। একদিন মহিম মহারাজের শ্রীমুখে যা শুনেছি এবং তাঁর বইতে যা পড়েছি তা এই :—

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। মন স্থূল শরীরে থাকলে সাধারণতঃ কখন নম্র কখন তীব্র ইত্যাদি হোয়ে থাকে। যে পরিমাণে মনকে স্থূলে রাখবে সে সেই পরিমাণে জগৎকে নিকৃষ্ট ভাবে দেখবে। মন সূক্ষ্ম-দেহে থাকলে দেহের ক্রিয়া খুব কমে যায়। মন সূক্ষ্ম হো'তে কারণ-দেহে গেলে দেহটা খুব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সাধারণ লোক একে বায়ুরোগ বা বিপদমার্গ বোলে ঘৃণা করে। এই ভাবটা জগতের সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনীতে দেখা যায়। মন যখন সূক্ষ্ম বা কারণ দেহে বাস করে, সেখান হোতে যে শক্তি বা স্পন্দন, কণ্ঠনালী চক্ষু, হাত, পা দিয়ে বিকাশ পায় তা খুব মধুর ও হৃদয় স্পর্শী। একে সাম্য স্পন্দন বা বিদেহ অবস্থা বলে।

স্বামীজি লণ্ডনে বক্তৃতায় বোলেছেন :—১। 'প্রথমে মনে করো, নিজের সম্মুখে বসিয়া আছ, নিজেকে দুইভাগে দেখবার চেষ্টা করিতেছ; নিজেই যেন নিজের প্রতীক, নিজেই নিজের

দর্পন স্বরূপ হইয়াছ। প্রথম চরণ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমেক্রমে বক্ষঃস্থল, হস্ত ও গ্রীবায় চিত্ত বৃত্তি সংযোগ করিতে হয়, অবশেষে মুখ ও চক্ষুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ কোরিলে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুেত চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত হয় এবং স্থূল দেহে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া অশরীরী অবস্থা বা বিদেহ অবস্থা লাভ হয়।

২। ভাবিবে যে নিজে মরিয়া পড়িয়া আছ, আর নিজেই তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছ। শব বাহকেরা তোমার মৃত দেহটা লইয়া গেল। দেহটাকে চিতায় স্থাপন কোরিয়া অগ্নি সংযোগ কোরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃতদেহ ভস্ম হইয়া গেল— নিজেই তাহা দেখিতেছ। এইরূপ ধ্যান কোরিলে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে বা বিদেহ অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে'।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। প্রত্যেক স্নায়ুর ভেতরই একই প্রক্রিয়া হোচ্ছে। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না। স্নায়ু দিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে 'মন' বলে। আর ভিন্ন স্তরের স্নায়ু দিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হবে, মন চিন্তাশক্তি, দর্শন জ্ঞান বা উপলব্ধি সেইরকম বিভিন্ন প্রকারের হবে।

মন যখন চিৎশক্তি তখন সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে থাকে জগৎ বা সৃষ্টি যে সর্ব্বত্র এক শক্তি বা এক উপাদানমূল কারণে পরিব্যপ্ত তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বুনি। (স্বগত)। ঠাকুরের কথায় আছে "পঞ্চভূত নিয়ে

যে দেহ সেইটী স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ হয়, লাভ হয় আর সম্ভোগ হয় সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে 'ভগবতী তনু'। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না"।

মহিমমহারাজ। স্নায়ু দিয়ে চিন্তা কোরবে, মাথা দিয়ে নয়। ভাব সকলকে স্নায়ুর ভেতর আনবে। ভাবে তন্ময় হয়ে যাবে।

সূক্ষ্ম মন জগৎকে অন্য প্রকারে দ্যাখে বা ভাব সমূহ কে প্রত্যক্ষ দর্শনে করে।

স্বামীজি বলেছিলেন, 'মন বা চিৎ শক্তি যখন উচ্চ স্তরে যায় তখন শরীরের পরমাণু সমূহ জড় বা ভৌতিক বিন্দু সকল তাহার আজ্ঞাধীন হয়। স্নায়ু সংযত করা বা শক্তিকে সংযত করাই শক্তিমানের প্রধান লক্ষণ বা চিহ্ন।

সর্ব্ব বিষয়ে মুক্ত হওয়াই না জীবনের উদ্দেশ্য? স্বামীজি বলতেন, 'নিয়মের মধ্যে দিয়াই নিয়ম শূন্য স্থানে যেতে হবে'।

'ত্রিগুণাতীত পথে যে বেড়ায় তার কাছে বিধি নিষেধ উপর কি জিনিস'?

(সংযোগ) স্থান স্বামীজির বাড়ী। ২৯-১১-৪৬ সন্ধ্যার সময় তিনজন ভক্ত তাঁরা জয়পুরে থাকেন, তাঁরা এলেন। মহিমমহারাজ ও স্বামীজিরা যখন জয়পুরে ছিলেন তখন তাঁর

বয়স ৯ বৎসর ছিল শুনলুম, মহিমমহারাজ তাঁর বাল্যকালের সমস্ত ঘটনা, কোথায় কি আছে, সমস্ত ভক্তদের বলতে লাগলেন। ভক্তগণ সমস্ত শুনে অবাক্ হলেন।

কমল। (মহিমমহারাজ)। আপনি বাল্যকালের ঘটনাদি সব যখন বলতে সুরু করলেন, মনে হল আপনি সূক্ষ্ম শরীরে সেখানে চলে গিয়ে সব দেখছেন।

মহিমমহারাজ। হ্যাঁরে, সেই রকম ৯ বৎসরের বালক হয়ে সেখানে গিয়ে সব দেখতে পেলুম। কি কাপড় পরে ছিলুম, কোথায় কোন জিনিস রয়েছে, কে কে রয়েছে—।

ইং ১৮-১২-৪৬-২রা পৌষ, বুধবার দশমী, ১৩৫৩ সাল।

মহিমমহারাজ। (কমল)। তুমি যদি 'কারণ'শরীরে চলে যাও তবে কিছু কোরতে পারবে। 'কারণে' কেবল সত্ত্বাটা থাকে। হাত, পা, লেখা চলবে না। মুখ থাকবে সব দেখতে, বলতে পারবে। সেখানে (কারণে) পড়া বিদ্যা কিছু খাটবে না। যারা স্কুলের মাষ্টার তারা যে বই লেখে সে আলাদা, তার সঙ্গে ও জিনিস খাপ খাবে না।

আমি যা বলেছি অন্য লোক যা লিখেছে তা তারা পড়ে আমায় মানে বোলে দেয়, আমি নিজে জানি না। গিরিশবাবু নিজে লিখতে পারতো না। তিনি বোলেযেতেন অপরে লিখতো।

কমল। (মহিমমহারাজ)। আজকাল ক'জন লোক 'কারণ দেহে' মন নিয়ে গিয়ে লেখাতে বা বলাতে সব কোরতে পারে।

মহিমমহারাজ। না, ওসব কোরতে যেও না। ঠাকুর বোলতেন, ও সব কোরতেগেলে যক্ষ্মা হয়।

বুনি। (স্বগত)। উনি (মহিমমহারাজ) গিরিশবাবুর লেখবার বা বলবার ক্ষমতার বিষয় যা বললেন তা ত ঐ হল। কিন্তু মহিমমহারাজের লেখা, 'স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী' বইতে লেখা আছে এই :—

গিরিশবাবু ঔষধ দিবার ও লিখিবার প্রথা, অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্থির হয়ে ভাবতে ভাবতে সেই দৃশ্যগুলি সুস্পষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কার্য্যে, কারণ ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। গিরিশবাবু হাওয়ার ভিতর অলক্ষিত-লক্ষিত বস্তুকে দেখিতেন এবং বিভোর হইয়া ভাষায় তাহা বলিয়া যাইতেন। এইজন্য অপর ব্যক্তিকে তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া লইতে হইত। তিনি পায়চারী করতেন আর অনর্গল বলিয়া যাইতেন।

এ ছাড়া আরও গিরিশবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারে' যখন অভিনয় করতেন তখন অনেক বই লিখিয়েছিলেন, সেই বিষয় বইতে যা পড়েছি তা এই :—

'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ'—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার লিখিত পুস্তকে আছে :—

ইং ১৮৯৮ ২৮শে জানুয়ারী শনিবার—'মিনার্ভা থিয়েটার' খোলা হয়। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কেসিয়ারে নিযুক্ত হন। আর গিরিশবাবু স্বয়ং নাট্যকার এবং অভিনেতা হইলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রনাথ বাগবাজারে বাস করিতেন। পাথুরিয়া ঘাট নিবাসী নগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ থিয়েটার খোলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং সুহৃদ।

সুন্দর ও দ্রুত লেখক বলিয়া গিরিশবাবু দেবেন্দ্রনাথকে লেখক রূপে নিযুক্ত করেন। এই সময় কয়েকখানি নাটকের দেবেন্দ্রনাথ লেখক হইয়াছিলেন। ইং ১৮৯৫ সালের মার্চ্চ মাসে দেবেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করেন।

(সংযোগ)। ১১-৮-৪৭ ২৫শে শ্রাবণ সোমবার, নবমী পরে দশমী ১৩৫৪ সাল। স্বামীজির বাড়ী, সকাল ৮টা। প্রহ্লাদবাবু খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার পর।

কমল। (মহিমমহারাজ)। 'লণ্ডনে বিবেকানন্দ' দুই খণ্ড ও তিনখানি 'অনুধ্যান' ও অন্যান্য আপনার লেখান বইতে যে গুলো আছে, ধ্যান, জপ, দ্বৈত অদ্বৈতভাব, সূক্ষ্মদেহ ইত্যাদি বিষয় সব গিলে যাচ্ছে।

মহিমমহারাজ। (কমল)। হ্যাঁরে, আগে Energy vibration, ও attom Nurves পড়, তা'হোলে সব বুঝবে। এক হোতে ৪টী হচ্ছে, ৪টী হ'তে একে যাচ্ছে। বড় শক্ত। বট ও তেঁতুলের বীজ হতে কি কোরে বাড়লো। জন্তুর ও মানুষের (Nerves) একই কিন্তু তফাৎ কি কোরে হলো—। রাম বনবাস গেলে তখন কৌশল্যা দশরথকে বলেছিলেন :— 'সত্যাৎ সোমঃ সমভবঃ সোমাৎ ব্রহ্ম ততোহমৃতং উর্দ্ধ অগ্নিঃ অগ্নেঃ পৃথিবী ভূমি ভূতানি জগ্মিবরে'। অর্থাৎ সত্য হ'তে সাম্যাবস্থা

হচ্ছে; সোম হ'তে সৃষ্টিমুখীভাব তাহা হ'তে অমৃত, তাহা হ'তে উর্দ্ধ, উহা হ'তে অগ্নি, পরে অগ্নি হ'তে পৃথিবী এবং ভূমি হ'তে ভূতানি জন্ম হচ্ছে।

ইং ২৭-৯-৪৭ স্বামীজির বাড়ী। ১০ই আশ্বিন, শনিবার, দ্বাদশী ১৩৫৪ সাল। বৈকাল বেলা। কমল, মানস, শরৎ, ধীরেন প্রভৃতি উপস্থিত।

মহিমমহারাজ। (কমল)। 'ব্রজধামদর্শন' বই কেমন লাগল?

কমল। খুব ভাল। ভাব, ভক্তি ও উদ্দীপন বিষয় খুব—। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কার্ত্তিক সরকার এলেন। কমল তামাকে গুড় দিয়ে মেখে মহিমমহারাজকে খেতে দিলেন। তিনি বোল্লেন, বেশ তামাক খেলুম।

মহিমমহারাজ। (কার্ত্তিক)। এ (কমল) বৃন্দাবনে গিয়েছিল জিজ্ঞাসা কর। তবে সব গ্রামে গিয়ে ছ্যাখেনি—।

মহিমমহারাজ (কমল)। ওরে, তুই যে আজ আমার মাথা গুলিয়ে দিলি। (শরৎ এর প্রতি)। হৈ হৈ, রৈ রৈ পূর্ব্বস্মৃতি জাগে।

ইং ২৪।১০।৪৭—৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ৺দুর্গাপূজার বিজয়াদশমী ১৩৫৪ সাল। কমল, মানস ও লক্ষ্মী, রাত্রি ১০৷৷টার সময় তাঁকে প্রণাম করে বাড়ী যাত্রা করে।

(কমল যাবার সময়) কমল। (মহিমমহারাজ)। আজ একটা মনে হচ্ছে, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা একতারে একসুরে বাঁধা থাকি আর এক সুর হতে দরকার মত শত সুর

যেন বেরোয়। আর কামনা, বাসনা, ভোগ, যোগ যার যা আছে সব যেন শীঘ্র শীঘ্র মিটে যায়।

মহিমমহারাজ। (কমল)। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কামনা, বাসনা ওসব থাকবে নইলে কি কোরে বেঁচে থাকবে—।

পরদিন একাদশী, সন্ধ্যার সময় মহিমমহারাজ শুয়ে চুরুট টানছিলেন ও কমল তাঁর পায়ের কাছে চেয়ারে বসেছিল। তিনি হঠাৎ উঠে বসে বল্লেন :—

মহিমমহারাজ। (কমল)। হ্যাঁরে, তুই ৫।৭ বছর পূর্ব্বে যা ছিলি এখন কি তাই আছিস?

কমল। আজ্ঞে না, ঢের পরিবর্ত্তন অনুভব করি।

মহিমমহারাজ। (কমল)। কাল যে তুই যাবার সময় যে কথাগুলো বলেগেলি, ওসব ত হয়ে থাকবেই। সব Nervesএর (স্নায়ুর) খেলা। স্নায়ু ত একটা নেই ঢের রয়েছে। দেখছিসনা, আমি কত রকম লিখিয়েছি, বলছি, কে কি কোরছে, কোথায় আছে, কে কি মনে কোরেছে—। তবে Nerves Control এ আনতে পারলে ওসব কোরতে বলতে, পারা যায়—।

কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐটাই ত আসল জিনিস।

মহিমমহারাজ। (কমল)। অত ভাবিস কেন, ছাখ, আমার শরীর থেকে যে সূক্ষ্ম, কারণদেহের শক্তি, তা তোদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। তা তুমি এখন পণ্ডিত কি অন্যকে ধমক দিয়ে কথা কইতে পারবে। আগে যা ছিলে এখন আর সে ত নেই।

কমল। হ্যাঁ, একটা spirit এলে তা একটু বোঝা যায়, আবার

মধ্যে মধ্যে গুলিয়ে যায়, কখন কি ভাব আসে বোঝা যায় না। মহিমমহারাজ আবার শুয়ে বিশ্রাম কোরতে লাগলেন।

বুনি। (স্বগত)। ২৮শে অগ্রহায়ন, শনিবার, ষষ্ঠী ১৩৫৩ সাল। ও ২রা পৌষ—মহিমমহারাজ ভক্তদেরপ্রতি বোলেছিলেন,—

১৪।১২।৪৬—আমি মরে গেলে আমার শক্তিটা তোমাদের সকলের শরীরে ঢুকবে। তবে একসঙ্গে কিছু করতে যেওনা। এক একজনকে, এক এক জিনিস দি সায়েন্স, ফিলজফি—

উনি আর কিছুদিন আগে বোলেছিলেন, তা' হলে তুমি লেকচার দিতে পারবে—। আজ বোলছেন এইরকম, আবার মধ্যে মধ্যে বলেন,—ভূতে ধরবে, নেশায় ধরবে,—আমিও বলেছি, যে ভূতে বা নেশায় ধরতে কি আর বাকি আছে, অনেক দিন আগে থেকেই ঢুকে বসে আছে। তোলপাড় করছে, গুলিয়ে দেয়, কিছু বুঝতে পারি না কখন কি অবস্থায় নিয়ে যায়।

৭।৫।৪৭— ২৩শে বৈশাখ, বুধবার, দ্বিতীয়া ১৩৫৪ সাল। স্বামীজির বাড়ী, সকাল ৮টা। কমল, ধীরেন, প্রহ্লাদবাবু উপস্থিত।

কমল। (মহিমমহারাজ)। কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখলুম, আপনি একটী ঘরে বসে আছেন আর আমি পার্শ্বের ঘরে বহু লোকের মধ্যে বসে আছি। আপনার মুখ থেকে যেসব ঠাকুর ও স্বামীজির কথা শুনে লিখে রেখেছিলুম আর আপনার যে সব বই পড়েছি সে সব কথা বহু লোককে শোনাচ্ছি। যারা আপনার বই পড়েনি বা জানেনা, এমন বহু লোক যাদের দেখলুম সব অচেনা। আমি যখন তাদের

ঐ সব কথা শোনাচ্ছি তখন একটা Spirit বা শক্তি আমার ভেতর এসেছিল এটা খুব অনুভব করেছি। আমি অনর্গল বোলে যাচ্ছি, ভেবেচিন্তে নয়, সকলে চুপ করে শুনছে। আর আপনাকে দেখছি পার্শ্বের ঘরে বসে শুনছেন আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন।

মহিমমহারাজ মুচ্‌কে হেসে (কমল)। তা'হলে লেকচার দিতে পারবে ত ? আর কি কি বই পড়তে হবে সেটা বরেণদের জিজ্ঞাসা করো।

কমল। (মহিমমহারাজ)। স্বামীজিকেও মধ্যে মধ্যে দু'বার স্বপ্নে দেখলুম।

.......মহিমমহারাজ। (কমল)। দর্শন শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে যে সন্দেহ হ'তে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান আসে। এই সন্দেহ যার প্রবল হবে তার তত প্রবল জ্ঞান হবে। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকবার পর আস্তিক্য জ্ঞান আসে। এই ভাবটা আমি সকলের ভেতর অল্প বিস্তর দেখেছি, বরাহনগর মঠে।

.......স্বামীশিবানন্দ বলেছিলেন, 'নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সাধন ভজন করবে। অপরকে শ্রদ্ধা করবে কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব কখনও নাশ কোরো না। তা' হলে কিছুই হবে না। যে, যে পরিমাণে ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সাধন ভজন কোরবে তার সেই পরিমাণে উন্নতি হবে'। অনুকরণশীল ব্যক্তি অল্পদিনের জন্য লোকরঞ্জক হয়। ঠাকুর একে 'এক ঘেয়েমি' বা 'গোড়ামি' বলে উল্লেখ কোরতেন। তিনি বলতেন, 'গুরু

মুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো চেলা মুতে পাক দিয়ে দিয়ে, কিরে শালারা! তোরাও কি এই কোরবি নাকি' ?

বুনি। (স্বগত)। মহিমমহারাজ জ্ঞান সম্বন্ধে যা বইতে জানিয়েছেন এবং তাঁর মুখে যা শুনেছি 'গুণ বদ্ধ জ্ঞান' ও 'গুণাতীত জ্ঞান' কাকে বলে তা এই ঃ—

মহিমমহারাজ বোলেছেন, ২।৫ খানা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়া ও প্রসিদ্ধ লোকের ২।৪টী কথা তোলায় কি হয়, সেই ব্যক্তির নিজের কি হোয়েছে ? এই হ'ল প্রশ্ন, যেমন গ্রামোফোন বা কলের গান। যদি গ্রন্থের বাণী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাণী সকল প্রমাণ করা যায় যে ঠিক হয়নি তা'হলে সেই ব্যক্তির তর্ক যুক্তি পণ্ড হয়ে যায়। এই গুণবদ্ধ জ্ঞান লয়েই জগতে বাক্‌বিদণ্ডা, বিদ্বেষভাব, জয় আকাঙ্ক্ষা, মান সম্ভ্রমের ইচ্ছা চলছে ও হোয়ে উঠে। এতে কিঞ্চিৎ উপকার আছে সত্য, কিন্তু আসল জিনিষ কিছুই নেই। ইহাকে বলে মজলিস, বাক্যবাগীশ, রাজার চলন, ব্যবসায়ীপণ্ডিত বা বিজ্ঞ ব্যক্তি। চলতি কথায় ইহাকে কথার-ভট্টাচার্জ্জি বলে।

একপ্রকার জ্ঞান আছে, তাকে গুণাতীত জ্ঞান বলে। ঐ জ্ঞানে তর্ক-বিতর্ক ও কথাবার্ত্তার কোন আবশ্যকতা নেই। ইহা হ'ল ভিতরকার বিষয়, যথার্থ দর্শনের বিষয়। এই গুণাতীত অবস্থার আবরণী বা আকর্ষণী শক্তিকে অপর ভাষায় 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিণী,' 'সন্ধিৎ' বলে। এই গুণাতীত জ্ঞান যাঁহারা পেয়েছেন তাহাদের ২।৩টী কথাতেই হৃদয়স্পর্শী

হয় এবং সেই সকল কথা চিরকাল স্মরণ থাকে; যখনই সেই সকল কথা স্মরণ করা যায় তখনই ভিতরে একটা আনন্দ আসে। কিন্তু গুণবদ্ধ জ্ঞানের কথা ২।১ বার বললেও একটা বিরক্তি ও বিদ্বেষভাব আসে। এই হোলো দুই শ্রেণীর ভাবধারার পার্থক্য'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। যোগতত্ত্বাদি

(সংযোগ)। 'মহর্ষি পাতঞ্জলি' বইতে আছে তিনি বলেছেন :—"যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধ"। চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম 'যোগ'। প্রচলিত কথায়, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য করাকে যোগ বলে। জীবাত্মা প্রাণ এবং পরমাত্মা ঈশ্বর।

যাহা হইতে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও প্রাণ, আপাণাদি একত্রে মিলিত হয় তাহাকে 'দেহ' বলে।

শরীরে দশ প্রকার বায়ু আছে, উহার মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, আপাণবায়ু গুহ্যে, সমানবায়ু নাভিতে, উদানবায়ু কণ্ঠে, ব্যান ও ধনঞ্জয়বায়ু সর্ব্ব শরীরে, নাগবায়ু উদ্গারে, কুর্ম্মবায়ু উন্মীলনে, কৃকরবায়ু ক্ষুৎকৃতে এবং দেবদত্তবায়ু জৃম্ভনে অবস্থিতি করিতেছে।

দেহ মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। উহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রধান, আর গান্ধারী, প্রসরা, হস্তিজিহ্বা, যশা, অলম্বশা, কুহু এবং শঙ্খিণীনাড়ী সমূহ সর্ব্ব শরীরে দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। এই দশটি

নাড়ি হইতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

তালু মূলে চন্দ্রনাড়ী এবং নাভি মূলে সূর্য্যনাড়ী অবস্থিত। সহস্রার নির্গত সুধা নাভিমূলস্থ সূর্য্যনাড়ী পান করেন বলিয়া জীবের মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাড়ী সেই সুধা পান করিলে জীব অমরত্ব বা চিরজীবি ও শক্তি প্রাপ্ত হয়। 'বিপরীত করণীমুদ্রা' দ্বারা চন্দ্র নাড়ীকে সেই সুধা পান করান যায়। মৃত্তিকায় মস্তক রেখে হস্তদ্বয় পাতিয়া দুই পা শূন্যে তুলিয়া কুম্ভক করাকে বিপরীত করণীমুদ্রা বলে।

হটযোগীগণ শরীরকে দীর্ঘস্থায়ী এবং রোগমুক্ত করবার জন্য প্রথম শোধনযোগ অর্থাৎ ধৌত, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই বারোটি যোগকে শোধন বলে। ধৌতিযোগ দ্বারা শরীরের মল নাশ হয়। নাস্তিযোগ দ্বারা জঠর সুস্থ থাকে। নেতিযোগ দ্বারা শ্লেষ্মা দোষ যায়। লৌলিকীযোগ দ্বারা দেহাগ্নি বৃদ্ধি পায়। ত্রাটকযোগ দ্বারা দৃষ্টিশক্তি অক্ষয় থাকে। কপালভাতি যোগ দ্বারা জরা ও বার্দ্ধক্য নিবারিত হয়। এ ছাড়া ৩২টী আসন ও ২৫টী মুদ্রা অভ্যাস কোরতে উপদেশ দেন।

স্বামীজি বোলেছেন, 'হটযোগে শুধু দেহটা ঠিক থাকে। বহু বৎসর ধরে দেহটা রাখা যায়। কিন্তু মনের উন্নতি ওতে হয় না। মনের উন্নতি ও মনের সঙ্গে যে ব্যাপার সেইটাকে রাজযোগ বলে।

রাজযোগের বিভিন্ন অঙ্গ আছে যথা :—যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যম ও নিয়ম হোল, চরিত্র গঠনের সাধন। আসন, বসিবার প্রণালী। প্রাণায়াম। প্রত্যাহার, মনকে অন্তর্মুখী করা। ধারণা, একাগ্রতা। ধ্যান। সমাধি, জ্ঞানাতীত অবস্থা।

প্রাণায়ামে কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ, মধুর ও আকর্ষণী সংযুক্ত হয়। বয়স অধিক হইলে মুখে যে কুঞ্চিত চর্ম্ম হয়, তাহা পুনরায় যুবার ন্যায় দৃঢ় হয়, মুখের উপর শুষ্কতা বা কঠোরতা প্রকাশক যে সকল রেখা ছিল সব লোপ পাইবে, বর্ণ উজ্জ্বল হইবে'।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। পূজা ও ধ্যান জপাদি

স্থান :—দক্ষিণেশ্বর, রামলালদাদার বাড়ী। ৪ঠা কার্ত্তিক, কালীপূজা, মঙ্গলবার ১৩৩৭ সাল। ও ১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১৩৩৮ সাল। বৈকাল বেলা। কমল উপস্থিত আছে।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর বোলতেন, 'অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্ব কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয়ে যদি শনি ও মঙ্গলবারে পড়ে ত বিশেষ প্রশস্ত হয়। আর শনি ও মঙ্গলবারে যদি কালীপূজায় অমাবস্যা হয় ত খুব ভাল। সাধকের ঐদিন বেশ সাধনার দিন। আমি যখন পূজা কোরতে মায়ের মন্দিরে যেতুম, তখন তাঁর (ঠাকুরের) পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কোরে যেতুম। ঠাকুর বোলতেন, 'থাক থাক, হোয়েছেরে হোয়েছে। বেশ ভাল কোরে সাবধানে পূজো কোরিস, যেন কিছু না হয়। আমি

বোলতুম, আপনি ত আছেন। তিনি (ঠাকুর) হেসে বোলতেন, হ্যাঁ, তাত আছি। তবে ভয় নেই, মা আছেন, মা দেখবেন'।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর কর জপের বিষয় বোলতেন, 'আঙ্গুলের পর্ব্বতে ঠেকবে না এবং নখে স্পর্শ হবে না। আঙ্গুল ফাঁক থাকলে জপের ফল বেরিয়ে যায়। কর্ম্ম সেরে বোসি আর শত্রু মেরে হাসি'।

পরে, বুনি। (স্বগত)। শুনি, ১০৮ জপ কোরলে পূজার ফল হয়। কিন্তু কলিকালে হয় না। ৫৪০ কি ১০০৮ জপ করতে হয়। ২০ বার জপে পূজা সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি বিষয়ে ১০০ জপ এবং ১০১ জপে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। আবার জিভ্ উল্টে আলজিভে ঠেকিয়ে কিংবা জিভ্ বার কোরে দাঁতে চেপে মা কালীর মত জপ করা।

সকালে হাত চিৎ কোরে, মধ্যাহ্নে হাত বক্র কোরে, সায়ং ও নিশায় হাত উপুড় কোরে জপ কোরতে হয়। আর যতদিন পুরশ্চরণ কাজ না হয় ততদিন হাজারের বেশী জপ করবে না। পুরশ্চরণ হলে হাজারের বেশী জপ করা যেতে পারে। কৃষ্ণাষ্টমী কিংবা শুক্লাষ্টমী তিথী হোতে রোজ একমাস হাজার কোরে জপ কোরলে পুরশ্চরণ হয়।

মালার মুখভাগে জপ কোরতে হয়। মালা শব্দ হোলে রোগ ভোগ, মালা কম্পনে বহু ক্লেশ, মালা হেলে পড়লে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়।

স্ফটিক মালা জপ কোরলে সর্ব্ব কামার্থ ও মন্ত্র সিদ্ধি হয়

রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মণ কুমারীকে দিয়ে, কিংবা নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ অথবা সাধুকে দিয়ে রক্তবর্ণ সূতোতে মালা গাঁথলে ভাল। সেই মালা দীক্ষাগুরু জপ কোরে দিলে তবে ফলদায়ক হয়।

আবার মালা শোধন, মন্ত্রপূত কোরে নোওয়া বিধিও আছে, সেগুলো হোচ্ছে এই :—নয়টী অশ্বত্থ পত্র দ্বারা মালাকে পক্ষাকার কোরে মাতৃকাবর্ণ মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে তার মধ্যে স্থাপন এবং পঞ্চ গব্য দিয়ে ক্ষলন ও বামদেব মন্ত্র যথা :—ওঁ বামদেবায় সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরায় সর্ব্ব পাপহরায় সর্ব্ব মালিকেশ্বরায় ওঁ হুঁ ওঁ ঐঁ ক্লীঁ ফট্ দ্বারা ঘর্ষণ করা। চন্দন, কুঙ্কুম, গোরোচনাদি দ্বারা মালা ঘর্ষণ করা।

যদি রবিবারে শুক্লাসপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গল বারে শুক্লাচতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে শুক্লাঅষ্টমী তিথী হয় ত সে দিন 'অক্ষয়' হয়। ঐ দিনে যা সৎকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম করা যায় ত ৬০ বৎসরেও তা ক্ষয় হয় না!

'দেবো ভূত্বা দেবান যজেৎ'। অর্থাৎ স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবতার পূজা কোরতে হয়। আর 'মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র'। 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টা'। অর্থাৎ যাঁহারা মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহারাই ঋষি।

(সংযোগ)। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৪০ সাল। ইংরাজি ১৭।৫।১৯৩৩ রামলালদাদা কলকাতায় সারদেশ্বরী আশ্রমে এসেছেন। উপস্থিত কমল, গৌরীমা, রামচন্দ্র মজুমদার, বীরেন (এটর্ণি)।

গৌরীমার শিষ্যা দুর্গাপুরী, ৺দ্বারকাতীর্থের গল্প বোললেন। গৌরীমা ঠাকুরের পুনঃ আগমনের বিষয় বোললেন। আর রামলালদাদা কথার পিঠে বোল্লেন ঃ—

রামলালদাদা। (ভক্তগণের প্রতি)। বরাহনগরে ঠাকুর প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ফিরছেন, এমন সময় দেখি একজনের পিঠে চড় মেরে বোলছেন, 'শালা, সন্ধ্যার সময় এখানেও বসে মকদ্দমার কথা ভাবছিস, জপ কখন কোরবি'? তারপর দেখি যাকে চড় মেরেছন তিনি হোলেন প্রিয়নাথ মুখুর্জ্জে।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুরের বইতে আছে, ঠিক এমনি ঘটনা তিনি (ঠাকুর) রাসমণিকেও মন্দিরে চড় মেরেছিলেন।

রামলালদাদা। (কমল)। হ্যাঁ, এই দুইজন ঠিক এক বিষয়।

পরে, বুনি রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করে।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে কি রকম ভাবে জপ, ধ্যান কোরেছিলেন?

রামলালদাদা। (কমল)। শুনেছিলুম, ঠাকুর আমলকি গাছের তলায় বসে জপ, ধ্যান কোরতেন। উলঙ্গ হোয়ে পাগলের মত মার জপ, ধ্যান কোরতেন। আর কেঁদে কেঁদে মাকে ডাকতেন ও প্রার্থনা কোরতেন।

বুনি পরে, ঐ বিষয় আলোচনা কোরে জানল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় আছে ঃ—

"পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়"।

আর জপ বিষয় ঠাকুরের কথায় আছে :—

"জপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। এক মনে নাম কোরতে কোরতে জপ কোরতে কোরতে তাঁর রূপ দর্শন হয়; তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। যেমন, শিকলে বাঁধা কড়ি কাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে। শিকলের আর এক দিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটা ধ্বাপ ধরে ধরে গিয়ে, ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়ি কাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেই রকম জপ কোরতে কোরতে মগ্ন হোয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়"।

বুনি একদিন, রাখালমহারাজ (স্বামীব্রহ্মানন্দ) এর কাছে, বৈকালে, বলরাম ভবনে (৫৭ নং রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, বাগবাজার) গিয়ে দ্যাখে যে, উপরে লম্বা হলঘরে তিনি বসে আছেন আর কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন।

রাখালমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি) 'বাবা, সাধন ভজন কোরতে হয়, নইলে কি আর কিছু হয়। একি গাছের ফল যে টপ্ কোরে পেড়ে খেলুম আর সব হয়ে গেল। একবার সাধন ভজন কোরে দ্যাখ দিকিনি, শরীর থেকে আগুন ছুটে বেরুবে'।

এই কথাগুলি তিনি হাত মুঠো কোরে নেড়ে বার বার

বোলতে লাগলেন। বুনি ভাবতে লাগল, রাখালমহারাজ বোল্লেন, সাধন ভজন কোরতে হয়—এর মানে কি সাধুসঙ্গ—? সাধুসঙ্গ না কোরলে কি কোরেই বা সাধন ভজন হবে! কে পথ দেখাবে, কি কোরে সাধন কোরতে হয়! গুরু বিনা আর উপায় নেই! শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় আছে ঃ—'সাধু সঙ্গ কোরতে হয়, নির্জ্জনে তাঁকে ডাকতে হয়'—।

'সাধু সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়ন দ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ'॥
(কুলার্ণব তন্ত্র)।

'কুলং পবিত্র জননী কৃতার্থা। বসুন্ধরা চ ধন্যা!
যস্য কুলে রামকৃষ্ণ নাম খেয়া'॥

(সংযোগ)। মহিমমহারাজের নিকট জপ, ধ্যান, চিন্তার বিষয় যা শুনেছি এবং তাঁর লিখান "লণ্ডনে স্বামীবিবেকানন্দ" বইতে স্বামীজি রাজযোগের বক্তৃতায় যা বোলেছেন তা এই ঃ—

রাখালমহারাজ বোলেছিলেন, 'এক আসন, এক জপ এক উদ্দেশ্য এইটি না কোরলে আসন জাগ্রত হয় না। আসনকে জীবন্ত কোরতে হয়, তা হ'লে জপ ধ্যানের অনেক অনুকূল ভাব আসে'।

স্বামীজি ও মহিমমহারাজের মতগুলি এই ঃ—'নিজের আসনে রোজ বোসবে। সে আসনে যেন অন্য কেউ না বসে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বোসবে না। জপের আসনের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে জপের শক্তি লুকান থাকে। কোমর

মেরুদণ্ড ও মস্তক ঠিক সিধা থাকবে। মাটিতে চেপটানি-খেয়ে বা চেয়ারে বোসে, যার যে আসনে সুবিধা হয়, কিন্তু শুধু মেরুদণ্ড, কোমর মাথা যেন সিধা থাকে।

কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উচ্চারণ কোরলে উহা হ'তে আশ্চর্য্য শক্তি লাভ হয়। ওঁকার ধ্যানে সমস্ত হয় জানি। কিন্তু কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? যার কর্ম্ম কোরে চিত্ত শুদ্ধি হোয়েছে, অর্থাৎ যে ঠিক ধার্ম্মিক'।

'জিভ্ দিয়ে তারপর মন দিয়ে জপ হচ্ছে সাধারণভাবে প্রচলিত প্রথা। মন বা চিৎশক্তি যখন খুব গভীর স্নায়ুতে চলে যায় তখন প্রথম যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল বা যে Impetus দেওয়া হয়েছিল, সেই পরিচালিত শক্তি নিজ শক্তি বলে উদ্বুদ্ধ হয়ে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুতে সর্ব্বদাই সমভাবে প্রবাহিত হয়, ইহাকে 'অজপা জপ' ব'লে।

স্বামীজি বলেছিলেন, 'আমি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়েও জপ করেছি। মস্তিকের ভিতর যে সকল সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে আঙ্গুলের অগ্রভাগেও তা আছে'।

(মহর্ষি পাতঞ্জলির মতে—'প্রণব' অর্থাৎ ওঙ্কার ঈশ্বরবাচক। পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ দ্বারা সমাধি হয়। এবং শ্রুতিগোচর জপকে বাচিক, যে জপে শব্দ শোনা যায় না কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হয় তাহাকে উপাংশু এবং মনে মনে জপ ও ও তৎসহ মন্ত্রার্থ স্মরণকে মানস জপ বলে। এইটি উৎকৃষ্ট)।

'জপ, ধ্যান করতে করতে কখনও কখনও উল্লাস বা Elation এসে পড়ে এবং তিন চার দিন পরে বিষাদ আসে। জপ, ধ্যান করবার সময় কখনও কখনও বিপরীত স্নায়ুর ভিতর শক্তি প্রবেশ করলে এইরূপ হঠাৎ একটি উল্লাস এসে পড়ে। এটা হচ্ছে অহঙ্কারের অন্তরূপ। কিছু দিন পরে এই উল্লাস বিষাদে পরিণত হয় এবং মনকে নিম্ন স্তরে নিয়ে যায়। সাধকের এইবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। আনন্দ বা Bliss অন্য প্রকার। ইহা গম্ভীর ও স্নিগ্ধ। ইহাতে ভিতরে একটা সাম্যভাব আসে এবং হৃদয়ে এক নব প্রকার শক্তি জাগ্রত হয়।'

সাধন সময়ে যে জপ, ধ্যান, চিন্তা করা যায় ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ সব যেন বিলুপ্ত বা ভ্রান্ত হল বলে মনে আসে, কিছুদিন পরে আবার নবভাব এসে পড়ে। 'অস্তি' 'নাস্তি' হয়, 'নাস্তি' 'অস্তি' হয়।

প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ প্রাণের সংযম। কি করে প্রাণ জয় হবে এই উদ্দেশ্য। নিজের মনকে যে জয় করতে পারে সে অপরের মনকেও জয় করতে পারে। নিজের ভিতরকার সাহস বা দেবভাব অপরের ভিতরে জাগ্রত কোরে দিতে পারে'।

জপ, ধ্যান করলে শরীরের পরমাণু পরিবর্ত্তিত হ'তে সুরু হয়। দেহটা যেন সামান্যভাবে বদলে যায়। পুরাতন পরমাণু পরিবর্ত্তিত হয়ে নূতন পরমাণু সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তি হ'তেই পরমাণুর সৃষ্টি এবং স্পন্দন।

জপ, ধ্যান করলে ভিতরকার কুণ্ডলিনী শক্তি বা ওজস্ জাগ্রত হয়। ভিতরকার আত্মা জাগ্রত হ'লে মানুষের শরীর অন্য প্রকার হয়। সাধারণ লোকের দেহ ও যোগীর দেহ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। শক্তি উচ্চে গমন করিলে আকর্ষণী শক্তি বাহির হয়'।

'জপ থেকে যে শক্তি আসে তাহার রং শুভ্র এবং ক্রমশঃ ফেকাশে সাদা হ'তে স্পষ্ট শুভ্রের দিকে যায়। কুচিন্তা বা কুভাব থেকে যে শক্তি আসে সেটা কালো এবং ক্রমশঃ গাঢ় কালোর দিকে যায়।

ধ্যান অনেক রকম আছে। জগৎ থেকে মনকে বিচ্যুত করাই হল ধ্যান, 'অনাসক্ত ভাব'। দেহটা স্বয়ং নয় কিন্তু বাহ্যিক বস্তু। যেমন, আমার দেহ, আমি দেহ নই, ইত্যাদি। জগৎকে নিরপেক্ষভাবে দর্শন করাই ধ্যানের প্রথম প্রধান সোপান।'

(মহর্ষি পাতঞ্জল মতে, 'যে বস্তুতে মনকে আবদ্ধ করা হয় সেই বস্তু বিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে উহাকে ধ্যান বলে। এবং 'মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য' মতে, ধ্যান না করিলে জীব বদ্ধ থাকে এবং ধ্যান করিলে মুক্ত হয়। হিন্দুর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই ধ্যানযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া পরিগৃহিত')।

'যদি মনকে কোন স্থলে বার সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটা ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বাদশগুণ হইলে এক সমাধি হইবে। ধ্যান পরিপক্ক হইলে সমাধি হয়।

আত্ম স্বরূপের ধ্যানই সূক্ষ্ম ধ্যান। এ ছাড়া ধ্যান দুই প্রকার আছে ঃ—হৃদয়পদ্মে ইষ্ট দেবদেবী, অবতার ‘গুরুর ধ্যানেকে সগুণ ধ্যান এবং আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মরূপে চিন্তা করাই নির্গুণ ধ্যান।

ভক্ত বলিলে নিস্তেজ বা ভীরু বা অপরের নির্ভরশীল ভাব বোঝায়। দ্বৈতভাবে থাকিলে একের প্রাধান্য ও গৌণ ভাব আসে। স্বামীজি মুমূর্ষ প্রায় ভক্তদিগকে শ্লেষ করিয়া এই কথা বলেন’।

‘সমস্তই নিজের ভিতর হইতেছে। সুখ, দুঃখ, ভাল মন্দ যা কিছু আছে সবই নিজের Self-projection হইতে করিতেছি এবং তাহাতেই অভিভূত হইতেছি। আমি যখন নিজের ভিতর মুক্তভাব দেখিতেছি তাই আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছি। আবার যখন ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, মুক্ত, বদ্ধ, ভাবে উপরে চলিয়া যাইতেছি তখন দেখিতেছি যে অহংই এক হইতেছে, অহংই বহু হইতেছে।

আত্মশক্তি, জ্ঞান হইলে বা সুষুপ্তশক্তি জাগ্রত হইলে এই বিনোদিত ভাব দূর হয় ও মানুষ নিজশক্তি সিংহ-বিক্রমে বিকাশ করে। একমাত্র **ব্রহ্মই অ-বিভক্ত**, আর জগতের প্রত্যেক বস্তুই বিভক্ত ও পরিবর্ত্তন শীল। এই **পরিবর্ত্তনের ভিতরেও নিজেকে অ-বিভক্ত বলিয়া জানি, এইটাই স্থির জ্ঞান।**

নিজের সামনা সামনি বসিয়া চোখেচোখে চেয়ে আছি,

এরূপ ভাবে ধ্যান কোরিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রভেদ শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম কষ্ট হয়। নিজের ইষ্ট সম্মুখে পরে আমারই ইষ্টই আমার দেহেতে ধীরে ধীরে প্রবেশ কোরিতেছেন, ক্রমশঃ এক দেহেতেই ইষ্ট ও ভক্ত রহিয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার উলট-পালট করিয়া দর্শন হইলে সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীর হইতে শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়'।

'সম্মুখে জ্যোতির্ময় বিন্দু রাখিয়া ধ্যান কোরিলে প্রথম মাথার পিছন দিক দপ্ দপ্ করে কষ্ট হয়। তখন ধ্যান বন্ধ করা ভাল। জোর কোরে ধ্যান করা ভাল নয়।

আমি বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন এই ভাবটি আসিলেই মনুষ্য হৃদয়ে ভীতি বা বিষাদের ভাব আসে। কিন্তু যখন দেখি যে আমি স্থূল সূক্ষ্মাদি স্পর্শ কোরিতেছি তখন প্রাণে আনন্দ ও সাহস আসে। ভীতি জ্ঞান হইতেই ঈশ্বর জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা যদি নিভৃতে কোনও সৎ চিন্তা কোরি এবং সেই চিন্তা যদি প্রবল বেগে বা দৃঢ় ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে সেই স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। এই স্পন্দনের উপরই সৃষ্টি চলিতেছে। রূপ ও অবয়ব এই স্পন্দনই সৃষ্টি কোরিতেছে।

হিংস্র চিন্তা বা নীচ চিন্তা বহু দূরব্যাপী হইতে পারে না। কারণ উহারা Negative ideas, Possitive ideas নহে'।

'আমি যদি অপরের অনিষ্ট চিন্তা কোরি আমার ভিতর হইতে হিংস্র অনিষ্টকর স্পন্দন উঠিবে, সেই স্পন্দন

আমার চারিদিকে থাকিবে, সেই পরিধির ভিতর যে কেহ আসিবে ওাহারই ভিতর হিংসার ভাব জাগ্রত হইবে এবং পরিশেষে সেই হিংসা নৃশংস ভাবে আমাতে আসিবে। কিন্তু আমি যদি লোকের মঙ্গল কামনা কোরি এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে চিন্তা বিকীরণ কোরি, তাহা হইলে সেই চিন্তা নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিবে। এই শান্তিপূর্ণ স্পন্দন চতুর্দ্দিক প্রবাহিত হইবে। ঐ পরিধির ভিতর যাহারা আসিবে, তাহারা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য শান্তভাব ধারণ কোরিবে'।

(সংযোগ)। জপ ধ্যানাদিতে শ্রীশ্রীমায়ের অভয় বাণী

রামলালদাদার কাছথেকে জপ, ধ্যানের বিষয় যা শুনেছিলুম এবং বইতে যা পড়েছিলুম ঐ সমস্ত বিষয় একদিন খুব চিন্তা কোরে দেখি যে শ্রীশ্রীমায়ের কথাতে তিনি যা বোলেগেছেন তা তাঁর সন্তানের পক্ষে পরম শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীশ্রীমা। 'যাতে মন পবিত্র হয় আগে তাই করা দরকার। শুচি অশুচি যেমন থাক পূজা ও মন্ত্র জপ কোরতে পার যদি মোনে একান্ত টান থাকে—দ্বিধা না হয়'।

(যীশুর পুস্তকে আছে 'বাহির হইতে যাহা ভিতর আসে তাহা কখন কাহাকেও অশুচি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের ভিতর হইতে যাহা বাহিরে যায় তদ্দারা সে অশুচি হয়। কারণ কুচিন্তা প্রভৃতি মানুষের মধ্যে হইতে তাহার অন্তর হইতে উৎপন্ন হয়')।

শ্রীশ্রীমা। "ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হোলে দেরী হয়। সর্ব্বদাই ঘড়ির কাঁটার মত জপ কোরবে। মোন না বসলেও জপ ধ্যান কোরতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি কোরে যাও। অন্ততঃ ২।৪ ঘণ্টা বোসবে, পা ঝিন্ ঝিন্ কোরলে বোদলে নেবে। মন্ত্রের ভিতর শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়। আবার শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনে দীক্ষা হোলে শীঘ্র সিদ্ধি হয়। রোজ এক অধ্যায় গীতা পড়বে। মোনে সঙ্কল্প কোরে, যে তাঁর প্রীতির জন্য পড়ছি। সময় না থাকলে ২।৪ শ্লোক পড়ে নেবে।

গুরু ইষ্টের নাম কোরতে কোরতে জীব, জগৎ সকলের মঙ্গল হউক। দশ দিকে শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে ধ্যানে বোসবে। একদিনও বাদ দিবে না, অন্ততঃ ১৫ মিনিট সেরে নেবে। ঠাকুরের মাঝে গুরু ইষ্ট পাবে। ঠাকুরও আমাকে অভেদ দেখবে আর যে ভাবে দর্শন পাবে সেই ভাবেই ধ্যান স্তুতি কোরবে। ধ্যান হয়ে গেলেই পূজা শেষ হল। হৃদয়ে আরম্ভ ও মাথায় শেষ কোরবে।

ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ কোরে নিবেদন কোরবে। ছায়া, কায়া, পট সমান। তিনি বোলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে কোরবে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পাবে না"।

"ঠাকুরকে জানালে সব পাপ যায়। প্রার্থনা কোরবে:— ঠাকুর আমার পূর্ব্ব ও ইহজন্মের কুকর্ম্মের ভার তুমি নাও।

আমার আমিত্ব যেন না আসে। মোনের কথা জানিয়ে প্রাণের ব্যথা কেঁদে কেঁদে বলবে, দেখবে তিনি কোলে বসিয়ে নেবেন। জপ ধ্যান কোরতে কোরতে দেখবে ঠাকুর কথা কবেন। মোনে যে বাসনা হবে তখনি পূরণ কোরে দেবেন। কি শান্তি প্রাণে আসবে'।

'জলে চাঁদ দেখে কেঁদে বোলবে চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে কিন্তু আমার মোনে যেন কোন দাগ না থাকে। জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাতে বোলবে তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও। হাতে ফুল ফল নিয়ে বোলবে আমার পূর্ব্ব ও ইহজন্মের জানিত অজানিত যা কিছু পাপ পুণ্য কোরেছি সব তোমাকে সমর্পণ কোরলুম।

ঠাকুর আমায় বোলে গেছেন, এখানকার সকলকে যারা তোমার কাছে আসবে তিনি শেষ দিনে দেখা দিয়ে সঙ্গে হাত ধরে নিয়ে যাবেন'।

'আমি মা থাকতে ভয় কি বাবা, সর্ব্বদা জানবে ঠাকুর ও আমি তোমাদের পিছনে রয়েছি। ঈশ্বর হাত, পা, ইন্দ্রিয়াদি দিয়েছেন তারা ত ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই। যে যা খুসী কর না কেন, যে যা ভাবে খুসি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে'।

"যারা আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে তাদের আর আসতে হবে না। এখানে যে এসেছে যারা আমার ছেলে

তাদের মুক্তি হোয়ে আছে। **বিধির সাধ্য নেই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।** তোমরা সর্ব্বদা যেনো যে তোমাদের পিছনে একজন রয়েছেন"।

'ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হল উদ্দেশ্য তা সাধন ভজন কোরেই হোক আর কুট্‌নো কুটেই হোক।

ভ্রমিয়ে বার ঘরে বোসে ভের যদি কোরতে পার।

ধর্ম্ম যদি এখনও কিছু থাকে ত উদ্বোধনে আর মঠে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগে আছে ঠাকুর বোলেছেন :—

'মা, এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়। যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে।' যারা ঠিক ঠিক তাঁকে ডেকেছে তাদের এখানে আসতে হবে, আসতেই হবে। তার মালা জপা অতো কোরতে হবে না'।

ঠাকুরের কথায় আছে :—'স্বপ্নে যদি আগুন শিখা, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশান মশান ওসব দেখা যায় ত বড় ভাল।

কেউ যদি এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যায় ও নিজের নাম নিজেই ডাকা। এই সব স্বপ্নে দেখলে বা শুনলে শীঘ্র সিদ্ধ হয়'।

'শাস্ত্রে যেরূপ দর্শন আছে, ও অবস্থা হয়, তাও হোলো। কখন জগৎময় আগুনের ফুলিঙ্গ। পারার হ্রদ ঝক্ ঝক্ করছে। রূপা গলার মত। রঙ্গ মশালের আলো যেন জ্বলছে।

তারপর দেখালে—তিনিই জীব জগৎ, চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব হোয়েছেন। ছাতে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা, অনুলোম বিলোম।

পঞ্চদশ অধ্যায়। বর্ষা যাপন

৮-১০-১৯৩১—২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার একাদশী ১৩৩৮ সাল।

কমল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরঘরে শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন কোরে সন্ধ্যার সময় লম্বা বারাণ্ডায় বোসল। একটু পরে রামলালদাদা এসে বোসলেন, কমল তাঁর পদসেবা কোরতে লাগল।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুর দুর্গাপূজার সময় কি মন্দিরে থাকতেন? রামলালদাদা বললেন, মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর জানবাজারে গিয়ে পূজো দেখতেন। কখন কখন বর্ষার সময় প্রায়ই দেশে (কামারপুকুর) জয়রাম বাটী, শিঁউড়ে গিয়ে থাকতেন। কারণ পেটের গোলমাল হত কি না সে সময়, তাই সেখানে থাকতেন। আবার কালীপূজোর চার পাঁচ দিন আগে চলে আসতেন।

ক্যাম্ খাট

ইং ১০-৯-১৯৩১—২৪শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর, রামলালদাদার বাড়ী, বৈকাল।

কমল। (রামলালদাদা)। ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে যে খাট গিয়েছিল শুনেছি সেটার বিষয় একটু বলুন না।

রামলালদাদা। দক্ষিণেশ্বরে একটা ক্যামবিসের খাট ছিল, সেটায় ঠাকুর, স্বামীজি ও রাখালমহারাজ মধ্যে মধ্যে শুতেন। বলরামবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর থাকবার সময় একদিন খাটটা

নৌকাযোগে পাঠিয়েদি। তারপর আমি সেখানে যেতে তিনি বললেন, "হ্যাঁরে রামলাল, তুই এটা পাঠিয়ে দিলি কেন? আজ যে অশ্লেষা মঘা"। আমি বললুম; আমি ত তা জানি না; বা পাঁজি খুলে দেখিনি! ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, শুনছি যে আজ ভাল দিন নয়, যাইহোক তুই এটাকে এখানে রাখিস নি, পাঠিয়ে দে"।

ঠাকুরের বায়ু বৃদ্ধি

৩০-৮-১৯৩১—১৩ই ভাদ্র, রবিবার, দ্বিতীয়া ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর রামলালদাদার বাড়ী, কমল উপস্থিত।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে বায়ু-বৃদ্ধি হত। আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ (বাঙাল), ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন। ঠাকুর কবিরাজকে বলেছিলেন, "হ্যাগা, তামুক খেলে কি হয়? কবিরাজ বললেন, ওটাতে বায়ু কম হয়, আপনি যখন তামাক খাবেন, তখন চিলিমের উপর কিছু ধনেরচাল ও মৌরী দিয়ে খাবেন, তাতে উপকার পাবেন। রামলালদাদা। তা ঠাকুরকে দেখেছি তিনি ওরকম করে তামুক খেতেন।

(সংযোগ)। দৈব ঔষধ ও কর্ম্মফল

একদিন বুনি ও হিমাংশু (স্নে) ঠাকুরের দেশে (কামারপুকুর) গিয়ে সেখানথেকে শ্রীশ্রীমায়ের দেশে (জয়রাম বাটী) যায়। ফেরবার পথে 'মা সিংহবাহিণী' দেবীর মন্দিরে গিয়ে দর্শনাদি কোরি। শোনাগেল মা সিংহ-

বাহিণীর মাটি আছে। ঐ মাটি বহু উপকারে লাগে। সাপ বিছে কামড়ালে ও ব্যাধিতে লাগালে ও খাওয়ালে সব ভাল হয়ে যায়। কিছু মাটি অতি কষ্টে সংগ্রহ কোরে আনি।

একদিন মাষ্টারমহাশয়ের লালস্কুল-বাড়ীতে তাঁর নাতিকে (প্রভাসবাবুর ছোট ছেলে) একটা কাঁকড়াবিছে কামড়ায়, সে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কার্ত্তিক ডাক্তার তিনি ঔষধ আনতে গেলেন। তখন মনে পড়ে গেল সেই মা সিংহ-বাহিণীর মাটির কথা, মাষ্টারমহাশয়কে সব বল্লুম। তিনি শুনে বল্লেন, শীঘ্র গিয়ে আন। ঐ মাটি এনে ছেলেটির ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দি আর খাইয়ে দিলুম। সত্যিই দেখলুম, ছেলেটির কান্না বন্ধ হয়ে গেল সে ভাল হল। ডাক্তার ঔষধ এনে দেবার আগে সে ভাল হল।

আর একদিন, হিমাংশুর বোনের কোলের ছেলে তার গায়ে বিচকুড়ি বিচকুড়ি ডুমো ফোলার মত হয়েছিল। ঐ মাটি ছেলেটিকে কিছু খাইয়ে দি আর গায়ে বুলিয়ে দেওয়াতে ছেলেটি বেশ ভাল হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীমার কথায় আছে :—

শ্রীশ্রীমা। "ঠাকুরের আমাশা, আমবাত ছিল আর আমারও ছিল। শরীর ফোলা, নাক, কান দিয়ে রস পড়ত। চক্ষে জল পড়ে দেখতে পেতুম না। মরিচাদা তেল মালিস ও প্রদীপে আঙ্গুল তাতিয়ে রোজ ২১ বার ফুলাতে দেওয়ায় কমতো"।

..."ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস। তপস্যার মত

ব্যাধিতেও কর্ম্ম ক্ষয় হয়। নতুবা জন্মান্তরে সঙ্গে যায়। (সাধুদের নয়")।

"জয়রাম বাটি যেতে 'মা সিংহবাহিণী'র মাটি রোজ খাই ও কাছে রেখে দি। দৈব চোখের ঔষধ পেলুম—'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে ফুট্ দিতে ভাল হয়। ঐ মাটির গুণ খুব সব সারে কেবল খোস, পাঁচড়া সারে না"।

ভুদেবকে বিষধর সাপে কামড়ায়। শ্রীশ্রীমা বল্লেন :—"সিংহবাহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে যদি হাঁচি টিক্‌টিকি না পড়ে ত ছুরি দিয়ে জমা রক্ত চিরে দাও। দংশন স্থানে ঐ মাটি প্রলেপ দাও, চরণামৃত খাওয়াও"। ঐ সমস্ত করাতে ভুদেবের পরদিন সংজ্ঞা ফিরে আসে।

বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর (স্বামীশিবানন্দ) অসুখের সময় দেখেছিলুম তিনি খুব হাঁপাতেন ও মুখ দিয়ে নাল পড়ত্। তাঁর গলায় একটা দৈব মাতুলী ছিল তা ধারণে অনেকটা সুস্থ ছিলেন। আর রামলালদাদার অসুখের সময় তাঁকে একদিন কয়েকটা যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম তা এই :—

কমল। (রামলালদাদা)। আপনার বায়ুবৃদ্ধি, হাফ্ ও মাথার যন্ত্রণা দেখে মনে বড় কষ্ট হয়। ভাবি একি কপালের ভোগ! দৈব ঔষধ মাতুলী ধারণ করলে হয় না?

রামলালদাদা। (কমল)। ছাখ, ঠাকুর বলতেন, 'মানুষের কপালের ভোগ বা কর্ম্মফল যাই বল, যার যা সঞ্চিত আছে তার তা হবেই, তবে কম আর বেশী। দেহ ধারণ করলেই

ভোগ ভুগতে হবেই। কেমন জান? বাড়ীর টেক্স যেমন দিতে হয়, দেহের টেক্স তেমন ভোগে কাটায়। আহা! ঠাকুরকে কত বিষয় ভুগতে হয়েছে। অবতারাদি মহাপুরুষগণ কষ্ট বা দেহেরভোগ গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা হাসতে হাসতে চলে যান আর সাধারণ মানুষরা নানান কষ্টে কেঁদে যায়'।

কমল। (রামলালদাদা)। স্বামীজির কথায় আছে, "অবতার কপাল মোচন'।

রামলালদাদা। (কমল)। হ্যাঁ, তিনি, ঠাকুর বলতেন, "ভগবানের নামে যদি পাকা বিশ্বাস থাকে তা হ'লে তাঁর নামে বিধাতার কলমও কাটা যায়'। রামলালদাদা গাইলেন, 'নামেরি ভরসা কেবল কালী মা তোমার'। 'বল তারা তবে তোমার ভরসা কে করে'।

রামলালদাদা। (কমল)। কোথাথেকে কখন কি হয় একি বোঝা যায়! তাঁর ইচ্ছায় যা হবার তাই হবে কি বল? ভেবে আর কি করবে।

কমল। আচ্ছা দাদা, আজ থাক, কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। বুনি দাদাকে প্রণাম কোরে চলে গেল। পরে, কর্ম্মফল বিষয় চিন্তা করতে লাগল্।

শ্রীশ্রীঠাকুর বোলেছেন, "যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক। আত্মজ্ঞান হলে ওসব স্বপ্নবৎ বোধ হয়"। 'ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ তস্মিন দৃষ্ঠে পরাবরে'।

'মহর্ষি পাতঞ্জলি' কৃত যোগসূত্রে ঐ বিষয়ে যা মত তা এই :—

(আপনাকে নিত্যানন্দ স্বরূপ আত্মা মনে না করিয়া শরীর মনে করাই অবিদ্যা। আত্মা নিরপেক্ষ দ্রষ্টা-যন্ত্রী। আত্মা হইতে পৃথক ইন্দ্রিয় সমূহ মনের সাহায্যে বাহ্য জগৎ দর্শন ও অনুভব করিবার যন্ত্র। আমরা সাধারণতঃ যন্ত্রীর সঙ্গে যন্ত্র গুলিকে একীভূত করিয়া বোলি, 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি। যখনই আমাদের জ্ঞান হইবে যে আমাদের আত্মা নিত্য মুক্ত, সুখ, দুঃখের বন্ধন তাঁহাতে কোন কালেই নাই তিনি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তখনই এই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ফলদানোন্মুখী সকল বীজ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে)।

যোগীগণ বলেন :—(আমাদের ভাল মন্দ সব চিন্তা ও কার্য্য মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সংস্কাররূপে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং যখন আমরা উহা পুনরায় স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই ছবির ন্যায় উহা আমাদের মনে উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান জীবন ও ইহার কার্য্যাবলী পূর্বার্জ্জিত সংস্কারের ফল এবং এইগুলি আবার ভবিষ্যৎ জীবন ও উহার কার্য্যবলীর কারণ স্বরূপ। সৎ কার্য্যের ফল সুখ এবং অসৎ কার্য্যের ফল দুঃখ এই নীতির বাহিরে কেহ যাইতে পারেন না।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে কর্ম্মফল বা সংস্কার মানুষেই সৃষ্টি করে এবং মানুষ উহাকে নাশও করিতে পারে। আমরা বর্ত্তমানে যে কর্ম্মফল ভোগ কোরিতেছি উহা আমাদিগকে ভোগ কোরিতেই হইবে। কারণ, যে ইষ্টক বা তীরটী নিক্ষেপ করা হইয়াছে উহাকে আর ফিরাইয়া আনা নিক্ষেপ কারীর

পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের যে সকল কর্ম্ম ভবিষ্যতে ফলদানোন্মুখী হইয়া আছে, উহাদিগকে আমরা চেষ্টা কোরিলে নাশ কোরিতে পারি। হস্তে যে ইষ্টক বা তীর রহিয়াছে সেটী ইচ্ছা কোরিলে নিক্ষেপ কোরিতে পারি বা নাও পারি)।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়। ঠাকুর ভক্তাধীন

১৩-২-১৯৩১—১লা ফাল্গুণ, শুক্রবার, একাদশী ১৩৩৭ সাল। কমল শ্রীমরের লালস্কুল বাড়ীর চার তোলার সন্ধ্যার সময় গেল। তিনি ঠাকুরের বিষয় কিছু বোলছেন আর কমল বসে শুনছিল।

শ্রীম। (ভক্তগণ প্রতি)। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর, স্বামীজি ও ভক্তগণেরা আছেন। কয়েকজন ভক্ত যাহারা বাড়ী ভাড়া, খাওয়ার খরচ দিত, তারা একদিন ভক্তদের বোললেন, তোমাদের বাড়ীভাড়া, খাওয়ার খরচ এত দিতে পারবো না. তোমরা বাড়ী থেকে খেয়ে এস। এই সব কথা ঠাকুরের কাণে গেল, তিনি শুনে বোললেন, "তোরা আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানে যাব"। শ্রীম। তারপর ভক্তরা দেখলেন যখন ঠাকুর চলে যাবেন তখন তাঁর চরণে গিয়ে কেঁদে বোললে, আপনাকে ত আমরা কিছু বোলিনি, ও ভক্তদের ঠাট্টা কোরে বোলছিলুম। শ্রীম। ঠাকুর শুনে বোলেছিলেন, "না না, তোমাদের কিছু বোলিনি তোমাদের দোষ কি? তোমরা ছেলে মানুষ"। শ্রীম। ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিনি জানেন যে যারা আমায় আন্তরিক চায় তারা গৃহত্যাগ কোরে এসেছে। আর গৃহী ভক্তরা কেবল জাঁক-গুমর করে।

১-১-১৯৩০—১৭ই পৌষ, বুধবার, দ্বিতীয়া ১৩৩৬ সাল। কমল ও হিমাংশু (স্কুলে) সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেলুড় মঠ হতে কুটিঘাট এসে সেখান থেকে হেটে রামলালদাদার বাড়ী গেল। রামলালদাদা উপরের ঘরে ছিলেন, তিনি কমলকে তাঁর পায়ে মোজা পরিয়ে দিতে বললেন। কমল পরিয়ে তাঁর পা টিপে দিল।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুরের কল্পতরুর বিষয়টা একটু দয়া কোরে বলুননা।

রামলালদাদা। আজ সকালে একজনকে বোলেছিলুম তা ফের শুনবে? আচ্ছা শোন—

ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া

একদিন Ist. Januaryতে কাশীপুর বাগান বাড়ীতে ঠাকুর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমায় বোললেন, "ছাখ রামলাল, আজ ভাল আছি বোলে মনে হচ্ছে, তা চল একটু নীচে বেড়িয়ে আসি"। রামলালদাদা। আমি বোললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ত ভালই আছেন চলুন যাই। ঠাকুর একটা কানটোপ্পা টুপি পরলেন, হাতে একটা ছড়ি নিলেন। আমি তাড়াতাড়ি গায়ে একটা চাদর দিয়ে হাতে গামছা, গাড়ু আছে ঠাকুরকে উপর থেকে ধরে নিচে নিয়ে এলুম। ঠাকুর কয়েক বার বেড়াতে বেড়াতে পাইচালি কোরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর ভক্তেরা যে যেখানে ছিল সকলে এসে, কেউ পুষ্পবৃষ্টি কোরতে লাগল, কেউ স্তব— কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুর কাকেও ডেকে আশীর্ব্বাদ কোরলেন,

কাকেও বুকে হাত দিলেন। আবার কাকেও বোললেন, "তোমার দেরী আছে"। তারপর বোললেন, **"তোমাদের আর কি বোলব, তোমাদের চৈতন্য হুউক"**। আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, যে সকলের ত এক রকম হল, আমার কি গাড়ু গামছা বওয়া সার হল। এইকথা যেমন মনে হওয়া, তিনি অমনি পিছন ফিরে বোললেন, "কিরে রামলাল এত ভাবছিস কেন ? আয় আয়"। এইবলে আমায় সামনে দাঁড়করালেন গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, "ছ্যাখ দিকিনি এইবার"। রামলালদাদা। আহা, সে যে কি রূপ, কি আলো জ্যোতিঃ সে আর কি বলব।

দাদা এইকথা বলতে বলতে তুই চক্ষের জলে বদন ভাসিয়ে দিলেন। এইদেখে আমরা বললুম, থাক দাদা, আর বলতে হবে না।

দাদা পুনরায় আর একটী ঘটনা বললেন।

হাত পা জ্বলে গেলরে

রামলালদাদা। ঠাকুরের অসুখের সময় কাশিপুর বাগানে, নিরঞ্জনমহারাজ সিঁড়িতে পাহারা দিতেন, যেন উপরে কেউ না যায়। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ ছিল, যখন রামলাল আসবে, তাকে আস্‌তে দিও। একদিন আমি তাঁর কাছে গেলুম, তিনি হঠাৎ উঠে আমায় বল্‌লেন, "ওরে রামলাল, হাত পা জ্বলে গেল রে, গঙ্গাজল আন, শীগ্‌গীর আন"। এই বলে ছট্‌ফট্ করছেন।

আমি বললুম, কি হয়েছে? তিনি বললেন, "হ্যাখনা আমি এসেছিলুম গোপনে, দু'চারজন অন্তরঙ্গ নিয়ে, আর রাম (৺ রামচন্দ্র দত্ত) এসে কেবল প্রচার করছে। যাকে তাকে নিয়ে এসে বলে একে ছুঁয়ে দিন, ভাল করে দিন। কত লোকের ভার আর নোব। এইসব নিয়ে ত আমার এই হ'ল, আমি আর থাকবোনি, জানিস্"। আমি শুনে বললুম, না না, আর আপনার কাছে কেউ আসবে না, ছোবেনা এইসব বলে তবে ঠাকুরকে শান্ত করি। তারপর গঙ্গাজল এনে তাঁর হাত পা বেশ করে ধুয়ে দিলুম, তবে থামেন।

রামলালদাদা। কি জান ভাই, তিনি করুণাময়, পতিতপাবন। ঠাকুরের পবিত্র হৃদয়! কত লোকে তাঁর চরণ স্পর্শ কোরে, কত কি আকাঙ্ক্ষা করেছে। আবার তাঁকে কত লোকে কত কি বলেছে, এইসব ভার ঠাকুর তখন নিয়েছিলেন। তাঁর গলা হতে রক্ত পড়ছে দেখে, ডাক্তার কথা কইতে বারণ করে গেল, কিন্তু ঠাকুর ভক্তের হিতের জন্য বরাবর কথা কয়ে এসেছেন।

কমল ও হিমাংশু এইসব শুনে তারপর কলকাতায় রওনা হলো।

পদছাপ ও খড়ম পূজায় নিষেধ

১-১০-১৯৩০—১৪ই আশ্বিন, বুধবার ৺দুর্গানবমী ১৩৩৭ সাল। কমল সকালে মন্দির হয়ে রামলাল-দাদার বাড়ী গেল। দাদা ৺পুরীর গল্প বোলতে বোলতে পা দুটী ছড়িয়েদিলেন, কমল টিপতে আরম্ভ

কোরল। কমল দাদাকে মহাপুরুষের পদছাপের বৃত্তান্ত সব জানাল।

১৬-৯-১৯৩০—৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, অষ্টমী ১৩৩৭ সাল। বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামীশিবানন্দ মহারাজের (মহাপুরুষজী) পায়ের ছাপ নিতে গিয়েছিলুম। যেই ছাপ নিতে যাচ্ছিলুম তিনি বললেন, 'বেরো শালা পায়ের ছাপ নেবে, আমি কি মরতে যাচ্ছি, তাই ছাপ নিবি ? ওসব মরবার সময় নেয়। আভি নিকালো শালা, হুরহ শালা। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়ে নিগে যানা, তাঁর নিয়েছিস' ? আমি বললুম্ আজ্ঞে না। তিনি বললেন্, তবে ত শালা আরও নাস্তিক। (রাঁচির জিতেনমহারাজকে দেখে) দেখ দিকিনি এ শালা বলেকি, একে চেন' ? জিতেনমহারাজ। হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি। মহাপুরুষজী। 'কোথায়' ? জিতেন-মহারাজ। এখানে মঠে। মহাপুরুষজী। 'এ মষ্টারমহাশয়ের খুব প্রিয়, শুধু তাই নয় সকলের প্রিয়, বেশ গান করতে পারে, ওর গান শুনেছ' ? জিতেনমহারাজ। হ্যাঁ, মঠে অনেকবার শুনেছি। তারপর আমি তাঁকে বললুম, গত রবিবার দিন সকালে রেডিওতে "সুন্দর তোমার নাম" গানটী গেয়েছিলুম। তিনি শুনে বললেন্, 'বটে, আর ওটা গাসনি, "আর জাগাসনে মা জয়" ? আমি বললুম্, আজ্ঞে না।

রামলালদাদা শুনে বললেন,

রামলালদাদা। ঠাকুর যখন কাশিপুরের বাগান বাড়ীতে

ছিলেন, একদিন আমি তাঁর খড়মে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করেছিলুম। ঠাকুর শুনে আমায় বলেছিলেন, "সেকিরে ওসব এখন কোরিস্‌নি, শরীর যখন চলে যাবে তখন করিস"।

রামলালদাদা। আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে এমন কাজ করেছি, কাজটী ছেলে মানুষী হয়েছে।

তারপর রামলালদাদা কমলকে জগন্নাথের প্রসাদ দিলেন কমল পেয়ে চলে আসে।

(সংযোগ)। **তিন জনকে কৃপা করা**

একদিন—৺পুরীধামে শ্রীগিরিন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে রামলালদাদা ও কমলের নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে রামলালদাদা যা বলেছিলেন তা এই ঃ—

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুরকে বাবা বলতে দু'জনের মুখে শুনেছি। ৺মথুরা নাথ বিশ্বাস (রাণী রাসমণির জামাতা) ও রসিক মেথর। রসিক মেথরের বাড়ী ছিল আমার বাড়ী যেখানে (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে যে বাড়ী করে বাস করি) তার কাছে। সে কালীবাড়ীতে মেথরের কাজ করতো, আর বাহিরের কাজ করত না। একদিন রসিক পঞ্চবটীর কাছে ঝাড় দিচ্ছে আর ঠাকুর বেড়িয়ে আসছেন। ঠাকুরের পায়ে চটি জুতো, খালি গা, কোঁচার খোটটি কাঁধে ফেলা। রসিক ঠাকুরকে দেখে গলায় কাপড় দিয়ে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লে। তারপর বল্লে, বাবা, আমায় শেষ দিনে

কৃপা করতেই হবে। এইবলে কান্না সুরু করলে। ঠাকুর তার কান্না দেখে অভয় দিলেন। আহা! রসিকের কি ভক্তি বিশ্বাস ছিল, সে আর কি বল্‌ব। যাহউক, রসিকের শেষ দিনে শুনেছিলুম, অসুখের সময় তার পরিবারকে বলেছিল, আমায় তুলসীতলায় বিছানা কোরে দাও। তারপর শুয়ে বোলেছিল, আহা! দ্যাখ দ্যাখ ঐ আমার বাবা এসেছেন, আমায় ডাকছেন। বাবা, এস এস। এইবোলে শরীর স্থীর হয়ে গেল। ঠাকুর তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন।

৺ মথুরবাবুর শরীর যাবার সময় শুনেছিলুম, ঠাকুর সমাধিস্থ হোয়েছিলেন আর ঠাকুর বোলেছিলেন, 'সেজ্‌বাবু (মথুরবাবুর) শরীর ছেড়ে চলে গেল। আমাকে স্মরণ কোরছিল। খুব ভাল জায়গায় রাজা হবে'।

হাজরাকেও ঠাকুর শেষ দিনে কৃপা কোরেছিলেন। তিনি শেষ দিনে বোলেছিলেন, এই যে প্রভু, এসেছ মাও এসেছ। ওরে আসন দে, বসতে দে। তারপর নাম কোরতে কোরতে স্থীর হয়ে যান।

সপ্তদশ অধ্যায়। Onder ও গুরুবাক্য

ইং ১৪-২-১৯৩১—শ্রীনয়ের লাল স্কুলবাড়ীর চার তোলার ছাত। ২রা ফাল্গুন, শনিবার, দ্বাদশী ১৩৩৭ সাল।

শ্রীম। (ভক্তগণের প্রতি)। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন আর আমরা মেজেতে বসে আছি। ঠাকুর হেসে হেসে বোলছেন,

"যে হাজার বিচার করো আর যাই বলো তবু তাঁর onder (under কথাটীকে ঠাকুর অনডার বলতেন) এ আমরা আছি"।

শ্রীম। আমি সেই দিন হতে under কথাটি শিখেছি। ঠাকুর বলতেন, "আমরা ভগবানের হাতে পড়েছি তিনি ত আমাদের হাতে পড়েন নি। তাঁর ইচ্ছায় সমস্ত হচ্ছে এমন কি একটি গাছের পাতা তাও তাঁর ইচ্ছায় নড়ছে"।

গান—'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি'॥

শ্রীম। একজন দুপুর বেলায় এসে ঠাকুরকে বললেন, মহাশয় আমার কি উপায় হবে বলুন? শ্রীম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "বাপু গুরুবাক্য বিশ্বাস করা একমাত্র উপায়। গুরুকে মানুষ ভাবলে হবে না স্বয়ং ভগবান ভেবে তাঁর সেবা করতে হবে, তাঁর কথা অনুযায়ী কার্য্য করতে হবে"।

"সচ্চিদানন্দই গুরু। গুরু, কর্ত্তা, বাবা, ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান এইসব একে তিন আর তিনে এক"।

আমিই সেই

শ্রীম। (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে বলেছিলেন, "আমায় দেখাও যা আর স্বয়ং ভগবানকে দেখাও তা"। শ্রীম। স্বামীজিকে তিনি বলেছিলেন, "ওরে নবদ্বীপের যে গৌরাঙ্গ আর বৃন্দাবনের যে শ্রীকৃষ্ণ দেখেছিস এই সেই (নিজের

শরীর দেখিয়ে) যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এখন একাধারে রামকৃষ্ণ"।

শ্রীম। স্বামীজি একদিন আমার কাছে এসে বলছেন, 'ঠাকুর আমায় এইসব নানান কথা বললেন। আচ্ছা উনি কি পাগল ? না মাথা খারাপ হয়েগেছে কিছুই ত বুঝতে পারছি না'। শ্রীম। ঠাকুর অনেক ভক্তকে বহুরূপে দেখা দিয়েছিলেন। কালী, মহাদেব, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপে। যারা তাঁকে আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাস বা অবতার বলে পূজো করতেন ও ভালবাসতেন তারাই তাঁকে নানারূপে দর্শন করেছিলেন।

(সংযোগ)। ভগবান মনু বলেছেন—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মনোরূপ কল্পনা'। ভক্তের হিতের জন্য ব্রহ্ম বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। উপনিষৎ—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। প্রকৃত সাধুগণের দর্শনে, ধ্যানে, পূজায় ও সেবায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বা পূজা হইয়া থাকে। 'মামানন্দ ময়ং জ্ঞাত্বা হ্যানন্দী ভবতি-ধ্রুবম্। তস্য শোকং ভয়ং নাস্তি প্রলয়ে শত কোহপিকা'। ভগবান বলছেন—'আমি আনন্দময়, আমাকে জানিলে লোকে নিশ্চয়ই আনন্দময় হয়। শত প্রলয় ঘটিলেও তাহার শোক কি ভয় উপস্থিত হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে, ঠাকুর বলেছেন, 'যিনি পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই মা'। ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়া—ছিলেন—যে, তু'ই আর আমি এক। তুই ভক্ত নিয়ে থাক, জীবের মঙ্গলের জন্য। যখন ভক্তরা সকলে আসবে তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত

আছে তারা আসবে'। আবার ঠাকুর বলেছেন, 'তাঁহাকে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) চিন্তা করলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। আর সাধন যদি দরকার হয় ত তিনিই সমস্ত করিয়ে নিবেন'।

ঠাকুরের কথায় আছে:—'অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু শিষ্য বোধ থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই'। যখন গুরুর কৃপায় ইষ্টকে দর্শন হয়, তখন গুরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান'।

শেষ দিন

দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের ঘর। একদিন রামলালদাদা, একটি ভক্ত ও কমল উপস্থিত ছিলেন। দাদা ঠাকুরের কথা বলতে সুরু করলেন।

ভক্ত। (রামলালদাদা)। ঠাকুরের শেষ সময়ে কি আপনি ছিলেন? রামলালদাদা। না, একদিন রাত্রি ২টার সময় আমি ঠাকুর ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময় কাশিপুর হতে বুড়োগোপাল ও কয়েক জন এসে দরজা ঠেলছে। তারা বললেন, যে স্বামীজি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শীগগির চল। ঠাকুরের গভীর সমাধি হয়েছে কি শরীর গেছে, তা কেউ জানতে পারছে না। তারা আরও বললে, স্বামীজি বলে পাঠালেন যে, দাদা ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা থাকতেন, দাদা বুঝতে পারবেন এ সমাধি কি মহাসমাধি। আমি শুনে কেঁদে ফেললুম, তখনই তাদের সঙ্গে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি ঠাকুর লম্বাভাবে শুয়ে রয়েছেন, চক্ষের দৃষ্টি সোজা আর যেন মুচকে

হাসছেন। আমি বললুম, সমাধির লক্ষণ দেখছি, তা একবার কাপ্তেনকে (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) আনাহোক, সে কি বলে শুনি, সে অনেক বিষয় জানে। স্বামীজি কাপ্তেনকে আনাতে লোক পাঠালেন, তিনি এসে বললেন, যে সমাধির লক্ষণ। ঠাকুরের মেরুদণ্ডতে (শিরদাড়ায়) যখন গাওয়া ঘিয়ে মালিস করে দিলেন তখন গরম ঠেকল। ঠাকুর রাত্রি ১২টার সময় হতে এইভাবে সমাধি হয়ে ছিলেন। পরে কাপ্তেন যখন দেখলেন, যে ঠাকুরের শিরদাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন বুঝলেন যে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়েছে। তারপরদিন বেলা বোধ হয় ১২॥টার সময় বিলীন হয়ে যান। তারপর তাঁর বদনমণ্ডল শুষ্ক ও চক্ষু বন্ধ হয়ে গেল। শেষ সময়ে শুনেছিলুম, কেবল তিনি "মা" বলেছিলেন।

ইং ১৬-৮-১৮৮৬—৩১ শ্রাবণ সংক্রান্তি রবিবার, ১২৯৩ সাল।

রাত্রি ১টার সময় কাশিপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুর শরীর ত্যাগ কোরে মোক্ষ ধামে যান। তাঁর বয়স ৫২ বৎসর হয়েছিল।

(সংযোগ)। **ঠাকুরের পুনঃ আসা**

রামলালদাদার জ্যেষ্ঠ কন্যা কৃষ্ণময়ী দেবী, (কমল তাঁকে বড়দিদি বোলে উল্লেখ করে) তাঁর নিকট ঠাকুরের পুনঃ আগমন বিষয় যা শুনেছে তা এই :—

বড়দিদি। (কমল)। পিসিমার (লক্ষ্মীদিদি অর্থাৎ রামলাল দাদার ভগ্নী) মুখে আমি শুনেছিলুম, যে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি শত বৎসর পর আবার খুব গোপনে আসব। কাকেও

ধরা দোব না, গাছের তলায় বসে 'গুপিযন্ত্র' নিয়ে 'বাউল' গাইব। আর ও (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাঠাকুরণ) তামুক সেজে আমায় খাওয়াবে দেখবে। আর তুই (লক্ষ্মী) চাল, সাগ সব ভিক্ষে কোরে আনবি, কি বলিস ?. লক্ষ্মীদিদি। আমি আর আসব না বাপু, যাইবল, আমায় তামাক কোটা করলেও আর আসছি না। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, 'কেনরে, কি হল' ? লক্ষ্মীদিদি। 'জীবের—সংসারিদের দুঃখ কষ্ট আর দেখতে পারি না। এলেই ত আবার ওসব দেখতে শুনতে হবে'। ঠাকুর। তা ত বলছিস্, কিন্তু আমি আস্‌লে তুই কি আর গোলক-বৈকুণ্ঠে থাক্‌তে পারবি ? বারমাস থাকলে একবার না একবার মর্ত্তে আসতে সাধ হবেরে হবে। আমি এলে তুই থাকতে পারবি না'।

বড়দিদি। আমি দেখেছি পিসিমা কারুর দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা এসব দেখতে পারতেন না, বড়ই কাতর হতেন। মধ্যে মধ্যে দেখতুম, তিনি হাতে মালা জপছেন আর আপন মনে বলছেন, 'আহা! ওর কি দোষ ? যা কিছু সব ত তোমার হাতে, তুমিই সব করাচ্ছ'।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪০ সাল। সারদেশ্বরী আশ্রমে, গৌরীমার মুখে প্রায় ঐ রকমই শুনেছি। আর ঐ বিষয় শ্রীশ্রীমায়ের কথায় যা আছে তা এই :—

শ্রীশ্রীমা। 'ঠাকুর শত বৎসর সূক্ষ্ম শরীরে ভক্ত হৃদয়ে বাস কোরবেন বোলেছেন। আর তাঁর অনেক শ্বেতাঙ্গ ভক্ত

আসবে। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, খুব দাড়ি থাকবে। বোললেন, 'বর্দ্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব। ঐ দিকে দেশ, পথে কাদের ছেলে হাগবে, ভাঙ্গা কুড়ায় রান্না হবে। ভাঙ্গা পাথর বাসন হাতে, ঝুলি বগলে। যাচ্ছেন, খাচ্ছেন, দিক্‌বিদিক্ খেয়াল নেই। তোমার (শ্রীমার) হাতে হুকোঁ কোলকে থাকবে। লক্ষী বোলেছিল, 'তামাক কোটা কোরলেও আসবে না। তিনি হেসে বোললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথায় ? প্রাণ টেকবে না। কলমীর দল এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে'।

বুনি। (স্বগত)। ঠাকুরের কথায় আছে তিনি বোলেছেন, "বায়ু কোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে"।

শ্রীশ্রীঠাকুর শত বৎসর পর আবার বাউলবেশে আসবেন নিজ মুখে বোলেগেছেন। ইংরাজি ১৯৮৬ সাল, বাঙ্গলা। ১৩৯৪ আরম্ভ হো'লে শত বৎসর পূর্ণ হবে। ঠাকুর নিজ মুখে বাউলের মত বিষয় কিছু আভাস দিয়েগেছেন, যা কথামৃত ৪র্থ ভাগে ১৫৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যথা :—

ঠাকুর। বাউলদের শাক্ত মতের সিদ্ধকে 'কৌল' বলে। বেদান্ত মতে 'পরমহংস' বলে। বৈষ্ণবদের মতে বাউলকে বলে 'সাঁই'। সাঁইয়ের পর আর নাই। বাউল সিদ্ধ হোলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্দ্ধেক মালা গোহাড়, অর্দ্ধেক মালা তুলসীর। হিন্দুর নীর মুসলমানদের পীর। সাঁইয়েরা বলে 'আলেখ'। বেদ মতে বলে ব্রহ্ম, ওরা বলে

LIBRARY
No..............
BANARAS
Ashram

আলেখ। জীবদের বলে আলেখে আসে আলেখে যায় অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়। তারা বলে হাওয়ার খবর অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হোলে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ওদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর। 'পৈঠে' মানে চক্র, যেমন ছয়টা পইটে মানে ষড়চক্র। 'পঞ্চমে' আছি মানে বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। 'খোলা নামবে কখন অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে? যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। ওরা (বাউলরা) অনেক রাধা তন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে'।

ঠাকুর। কর্ত্তাভজার দল, এরা ঠাকুর, প্রতিমা পূজা পছন্দ করে না। জীবন্ত মানুষ চায়। অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে গুরুকে, ঈশ্বরবোধে ভজনা করে, পূজা করে। সিদ্ধবস্থাকে বলে, 'সহজ' অবস্থা। দুটী লক্ষণ বলে, প্রথম 'কৃষ্ণ গন্ধ' নাই ওর মানে ঈশ্বররের ভাব সমস্ত অন্তরে, বাহিরে কোন চিহ্ন নাই। হরিনাম পর্য্যন্ত মুখে নাই। দ্বিতীয় 'কামিনীতে আসক্তি' নাই, মানে জিতেন্দ্রিয়। পদ্মের উপরে অলি বসবে কিন্তু মধু পান কোরবে না"।

বৌদ্ধের পরও বৌদ্ধ সাধকের আবির্ভাব হোয়েছিল। যাহারা 'নাথ', অর্থাৎ যুগী বলে খ্যাতি লাভ কোরেছেন। তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে তাহারা হিন্দু বোলে পরিচয় দেন। মুসলমান সুফীগণও ঐ মত পোষণ করেন। ১৪০০ শতাব্দীতে বাংলায় বাউল

সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এইসময় শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভাবিত করে।

বৌদ্ধদের আলখাল্লা লম্বা গেরুয়া রঙের পোষাক, লম্বা বাবরি চুল গোঁফ ও দাড়ি। বাউলরা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ। হিন্দুদের ভক্তি ও সুফীদের প্রেম, এই তিনটীর সমন্বয় কোরে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন কোরেছিলেন।

বাউলেরা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে আশ্রয় কোরে বহু গান রচনা করেন। রাউলেরা বলেন, যে বাউল গানে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর ভিতর হ'তে গান নির্গত হয়। বাউল গায়কের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, পাঁচু ফকির ও অন্যান্যের রচনা হতে জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের মধ্যে আব্দুল্লা, আব্দুর রহিম, রশিদ, মনোমোহন প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত। বাউল গান কোন স্থলে 'মাকরতী গান' নামে পরিচিত। বাউল গানের সঙ্গে 'ভাটিয়ালী' গানেরও মিল দেখা যায়। বাংলার লোক-সঙ্গীতে মুরশিদ, ফকির ও দরবেশর গানের অনুরূপ।

(শ্রীগোপীনাথ সেন মহাশয় ঐ বাউল বিষয় কিছু ইতিহাস জানিয়াছেন) যাহউক, ঠাকুর যখন বাউল বেশে আসবেন তখন শত শত লোক তাঁকে দেখে আবার পূর্ব্বের স্মৃতি জেগে উঠবে বোলে মনে হচ্ছে। তিনি যাকে কৃপা কোরে ধরা দেবেন, তিনিই ধন্য হোয়ে মুক্ত হবেন। এখন থেকে ঠাকুরের যারা ভক্ত হয়ে আছেন ও পরে যাহারা জন্মগ্রহণ

কোরে এই পৃথিবীতে আসবেন আর ঠাকুরের 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে ভক্ত হয়ে সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখবার জন্য যার প্রাণ ব্যাকুল হবে ও তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য অপেক্ষা কোরে থাকবেন তাঁরা সেই বাউল বেশ ধারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যেন না ভুলে যান বা না ছাড়েন।

ঠাকুরের সঙ্গে পূর্ব্বে যাঁরা 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন তিনি যাঁদের দেখবার জন্য, তুটো ভালো কথা কইবার জন্য ব্যাকুল হোতেন, এবারও তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে আবার আসবেন। আবার পূর্ব্বের মত সকলকার সঙ্গে পরস্পর দেখা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(সংযোগ)। পূর্ব্বস্মৃতি ও মুক্ত পুরুষ

স্থান—স্বামীজির বাড়ী। একদিন—কমল ও ২।৫টী ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। সাধকের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ না হ'লে জীবন্মুক্ত পুরুষ হো'তে পারে না। ঠাকুর, বুদ্ধদেব ও মহাপুরুষদেরও হয়েছিল। ভাবাবেশকে বৈষ্ণব গ্রন্থে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। এই অবস্থায় বহু দিন থাকলে দেহ নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি লোপ কোরতে হো'লে 'মহা-শক্তি'র দরকার। ইহার বিপরীত অবস্থাকে 'পূর্ব্বস্মৃতি জাগরণ'—ইহাকে বিপর্য্যস্ত ভাব বলে। বুদ্ধদেবের হয়েছিল।

তন্ত্রেতে আছে যে 'কুণ্ডলিনী' শক্তি' সুষুম্নার ভেতর দিয়ে সহস্রারে গেলে প্রথমে সেখানে অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়ে

নেবে আসে দ্বিতীয়বারও ঐ রকম ; তিনবার যাওয়া আসা করবার পর কুণ্ডলিনীশক্তি 'সহস্রার' সঙ্গে সংলগ্ন হোতে পারে।

কনখলের 'মথুরাদাস' নামে সিদ্ধপুরুষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—মুক্তপুরুষ কাকে বলা হয় ? তিনি বোললেন, 'সমাজ বন্ধন, বেদবন্ধন, গুরুবন্ধন, এই তিন বন্ধন যে ত্যাগ কোরতে পারে'। অর্থাৎ শাস্ত্রে কি বোলেছে কি বিধি, কি নিষেধ, নানারূপ তর্ক বিতর্ক কোরলে উচ্চ বস্তুর উপলব্ধি হয় না। এইভাব লক্ষ্য কোরে ভগবান বুদ্ধ বোলেছেন—'বেদ আবৃত্তি কোরে লাভ কি ? উৎকোচ ও মধ্যস্থ ব্যক্তি (দালাল) ব্যক্তিরও মুক্তি লাভ করা সম্ভব'। স্বামিজী বোলেছেন—'অধিকাংশ লোক শাস্ত্রকে মাথায় কোরে রেখে শাস্ত্রের চাপে মারা গেল। আর দু' একটা লোক শাস্ত্রকে পায়ের তলায় রেখে তারউপর দাঁড়িয়ে নিজের চক্ষে জগতকে দেখতে লাগল'।

গুরুবন্ধন—নিজের গুরু কি বলেছেন, নিজ সম্প্রদায় কি বলেছেন, এইসব নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে থাকা। নিজের মনকে উচ্চস্তরে তোলবার চেষ্টা করবার তার সামর্থ হয় না।

(সংযোগ)। **অষ্টাদশ অধ্যায়। উপকার ও সেবাদি**

২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার, অমাবস্যা ১৩৩৬ সাল। রামলালদাদা ও কমল দক্ষিণেশ্বর মন্দির হয়ে কথা কইতে কইতে ঠাকুরের ঘরে এসে বসেছেন।

রামলালদাদা। (কমল)। একদিন, কালী মন্দিরে হাড়ী-কাঠের কাছে একজন পাগল বলেছিল, 'ওমা দুর্গে ভক্তবর্গে, সমান দয়া কৈ তোমার? তুমি কারেও হাসাও কারেও কাঁদাও, এই কি তোমার ব্যবহার'? তারপর মায়ের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কঞ্চি নেড়ে নেড়ে বোলছে, 'ওমা কালীকে মুণ্ড মালিকে'। এই কথা এমন ভাবে বার বার বোলতে লাগল যেন মনে হল, মন্দিরটি দুলছে। পরে, ঠাকুর ওকে (পাগলা) দ্যাখেন, সে গঙ্গার ঘাটে কুকুরের সঙ্গে প্রসাদ কুড়িয়ে খাচ্ছে। ঠাকুর বোল্লেন, "ওরে, ওর খুব উচ্চ অবস্থা। ও পাগল নয়, আসল মায়ের জন্য পাগল"।

পরে, রামলালদাদা বোললেন, 'রাণী টানে কোলপানে ভক্ত টানে বন পানে। বাঁকা টানে নয়নে নয়নে, যার ধন সে ছাড়বে ক্যানে'।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন—অনেক কাঙ্গালী গরীবরা খেতে বসেছিল। রামলালদাদা, কমল ও কয়েকজন ভক্ত মিলে দর্শন করেন। আর ঠাকুর, স্বামীজির 'উপকার ও দরিদ্র সেবার' মতামত বিষয় যা ছিল সেইগুলো আলোচনা করা হয়।

রামলালদাদা। (কমল)। আহা! দ্যাখ কত গরীব কাঙ্গালী বেশ আনন্দ কোরে খেতে বসেছে। দেখে বেশ আনন্দ হচ্ছে। এদিকে ভোজনানন্দ ওদিকে ভজনানন্দ, এই সব না হলে কি মানায় কি বল?

কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ; এইত কাজ, তেলা মাথায় তেল না

দিয়ে যার তেল বিহনে যাদের মাথা ফাটছে, তাদের দিলে ত পূণ্য হবে!

রামলালদাদা। (কমল)। ওতো ঠিক কথা, কিন্তু ক'জনের আর গরিবদের জন্য প্রাণ কাঁদছে। যে যার সব বেশীর ভাগ স্বার্থপর। লোকে কত দিকে কত বাজে খরচ করছে কিন্তু যদি কেউ কাণা, খোঁড়া, গরিব এসে একটা পয়সা যায় ত অমনি বোলবে নেই, হবে না যা—।

কমল। (রামলালদাদা)। আমায় যদি ভগবান অনেক টাকা দিতেন, গরিবদের দিয়ে উপকার করতুম।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর বোলতেন, 'মানুষের নিজের মঙ্গল কিসে হয় তাই সে জানে না, সে আবার জগতের মঙ্গল কি উপকার কি কোরে কোরবেন? যাঁর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিনিই একমাত্র জীবের মঙ্গল করতে পারেন। জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা করতে হয়। আর জীব শিব হলে, তাঁর আদেশ পেলে তবে সে লোক শিক্ষা, লেকচার যাই বল সব করতে পারে। তাঁর (ভগবানের) আদেশ ছাড়া ও সব করতে গেলে টেকবে না জেন।

বুনি পরে দেখল, যে ঠাকুর পরোপকারের বিষয় ঠাকুরের কথায় আছে তিনি বোলেছেন; 'তোমার সাধ্য কি যে পরোপকার কোরো? মানুষের এত নফর চপর কিন্তু যখন ঘুমায় তখন যদি কেউ মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় থাকে?

সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, পরোপকারের জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন তাই সেবা হয়"।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুর ৺মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থে যাবার পথে গরীবদের দুঃখ দেখে কেঁদেছিলেন। বইতে ঘটনা গুলো সব পড়েছি। এ ছাড়া আপনি কি দেখেছেন, শুনেছেন একটু বলুন শুনি।

রামলালদাদা। (কমল)। তুমি কি পড়েছ শোনাও দেখি।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুর গরীবদের দেখে মা কালীকে বোলেছিলেন, "মা, তোর একি বিচার মা, কারুর ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই কেউ বা অন্ন অভাবে মারা যাচ্ছে"। ৺মথুর বাবুকে বোলেছিলেন, "গরীবদের দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ওদের (গরীবদের) সমস্ত দাও"। ৺মথুর বাবু শুনে বোললেন, দিতে অনেক খরচ এখন কোথায় পাব। ঠাকুর রেগে বোলেছিলেন, "তুমি কি মনে কর এই ঐশ্বর্য্য তোমার, আজ মরে গেলে কাল তোমার থাকবে? এ দুনিয়ায় এক পয়সা কারুর নয়, সব মায়ের। বড় মানুষরা মার ভাণ্ডারী, তাঁর (মায়ের) কাজে সেবায় খরচ করবে। তোমাদের আত্ম তৃপ্তি করবার জন্য ভাণ্ডারী হওনি। মা কি আলাদা, মা এই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আজ্ঞা এই দুঃখী গরিবদের সেবা করলে (মার) সেবা করা হয়"।

রামলালদাদা। (কমল)। বাঃ, এই তো বেশ বোল্লে; আমিও ঐ রকম শুনেছিলুম।

কমল। (রামলালদাদা)। স্বামীজির কথায় আছে, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ'। যে মানুষ মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারে না, এক বুদ্ধিতে হয়ে একটা হিতকর কার্য্য করতে পারে না, সে আবার মোক্ষ নিতে দৌড়ায় কেন? ঝাঁটা, লাথি খেয়ে চুপটি কোরে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ পরকালেও তাই'।

আবার যীশুখ্রীষ্টের কথায় আছে, প্রশ্ন। শাস্ত্রের কোন বাণী (শ্রেষ্ঠ? যীশু। 'ঈশ্বর এক ভেবে সমস্ত হৃদয়ে আত্ম, মনশক্তি দিয়ে তাহাকে প্রীতি করতে হবে। তোমার প্রতি-বাসীকে নিজের মত ভালবাসবে। এছাড়া ধর্ম্মোপদেশ আর নাই'। স্বামীজির কথায় আছে, "জগতে এসেছ দিতে, নিতে নয়। যখন বলো দোবনা তখনি আঘাৎ পাও। তাই বলছি স্ব সম্মানে তোমার যা ক্ষমতা আছে তা দিয়ে যাও। নইলে প্রকৃতি তোমার গলদেশে পা দিয়ে বার কোরে নেবে'। 'ঘণ্টা নাড়া ফেলে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানব দেহ ধারিকে হরেক মানুষের পূজা করগে। তাঁর পূজা মানে তাঁর সেবা। এদিকে জ্যেন্ত ঠাকুরের ছেলে পুলে অন্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম বিনা মারা যাচ্ছে। শুধু জল তুলসীর পূজা কোরে

ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে তা'হলে সব কল্যাণ হবে'।

রামলালদাদা। (কমল)। অতি চমৎকার কথা আজ শোনালে। ছ্যাখ, ঠাকুর স্বামীজিকে খুব শক্তি ও আদেশ দিয়েছিলেন বোলেই ত আজ সারা জগতে এমন শক্তি বলে কর্ম্ম কোরে দেখিয়ে ও সব বোলে গেলেন, যা এ পর্য্যন্ত কেউ তেমন পারে নি।

(সংযোগ)। **মানুষ ও গর্ভধারিণী মার পূজো**

একদিন—স্বামীজির বাড়ী বিকেলে গিয়ে দেখি মহিম মহারাজ ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। কমলের দিকে দৃষ্টি কোরে বললেন :—

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। মহাপুরুষজী (স্বামী শিবানন্দ) একদিন বেলুড় মঠে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা পূজা কোরে কিছু বেল পাতা, ফুল জলে না ফেলে, জলে এক ব্যক্তির মাথার উপর ফেলতে লাগলেন আর ছুটো রসগোল্লা গঙ্গাকে নিবেদন কোরে ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'হাঁ কর, তার মুখে ফেলে দিলেন। ঐ ব্যক্তি জল থেকে উঠে এসে তাঁকে প্রণাম কোরে বললে, আপনি কি করলেন, আমার যে অপরাধ হবে—তিনি (মহাপুরুষজী) দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মুখ কোরে তাকে বললেন, **'ওরে গঙ্গা পূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়'**।

মহিমমহারাজ আবার বোললেন। যদি কোন ব্যক্তি বিপন্ন হয় কি অন্ন কষ্ট হয় তার দিকে কেউ চেয়ে দেখে না।

সবাই বলে, ওর কর্ম্মফল ভোগ কোরছে। ঠাকুর দেবতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে কিন্তু মানুষের প্রতি ভালবাসার সে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গেছে। নিজের আত্মাকে সকলের ভেতর দর্শন করা—এই অবস্থা এলে, একে পরাভক্তি ও কৈবল্য প্রেম বলে।

বুনি। (স্বগত)। যীশুর কথায় আছে, 'আমার শিষ্যদের তৃষ্ণার সময় এক বাটী জল পান করাবে, সে জল আমাকেই পান করানোর সমান হবে'।

মহিমমহারাজ। (কমল ও লক্ষ্মীর প্রতি)। স্বামীজির তিরোধানের পর জন্মতিথী উপলক্ষে প্রথম বার মঠে খুব খাওয়া হয়। একজন ঢেড়া পিটিয়ে এল। দলে দলে অনেক লোক এল। শরৎমহারাজ, কালিকেষ্ট মহারাজ, আমি সব্বাই মিলে একসঙ্গে পাতে খুব আনন্দ কোরে খাওয়াহল। তারপর আমি হাতে ঝাটা, বালতি নিয়ে লোকের খাওয়া পাতা গুলো সাফ্ (পরিস্কার) কোরতে যাচ্ছি। আর শিবানন্দমহারাজ বহু লোকের জুতো এক জায়গায় পড়েছিল সেই গুলো নিয়ে হাতে কোরে উঠিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসলেন, পাতা দিতে লাগলেন। শরৎমহারাজ কিছু উচ্ছিষ্ট পাতা কুড়িয়ে মাথায় রেখে 'ঊনসাত্তিক জাতের প্রসাদ মহাপ্রসাদ' কয়েক বার বোলে স্থির হোয়ে গেলেন। পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, উচ্ছিষ্ট পাতা থেকে একটু খেলেন। ভাত, কড়ায়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, আলুর দম, সব ছিল। আগেকার সেই সব শক্তি সঞ্চয় কোরে রাখাছিল—আর এখন খরচ—।

একটু পরে, রাজেন এল। মহিমমহারাজ। (কমল)। ওরে রাজেনকে সব বল, আমি যা এখন বোললুম। কমল রাজেনকে ঘটনা গুলো বোললে, লক্ষ্মীবাবুও কিছু বোললেন।

বুনি। (স্বগত)। উনি (মহিমমহারাজ) কি আমায় বলবার ক্ষমতা বা আদেশ দিচ্ছেন?

মহিমমহারাজ। ভালবাসা স্বাধীনতা, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায় বিচার এই গুণ চতুষ্টয় মানব জাতির সভ্যতার ভিত্তি স্তম্ভ স্বরূপ।

বুনি। (স্বগত)। 'গঙ্গা পূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়'। এই কথাটির সঙ্গে আর ঠাকুরের ঐ রকম কথার একটা তুলনা হোতে পারে যে 'নরনারায়ণ সেবা', একই জিনিষ। ঠাকুরের কথায় আছে, "মানুষের ভেতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ, দেখিয়ে দিচ্ছে। যেন বোলছে, 'আমি মানুষের ভেতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধ ভক্তের ভেতর বেশী প্রকাশ, তাই নরেন্দ্র (স্বামীজি) রাখাল, এদের জন্য এত ব্যাকুল হই। আমি মানুষকে দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। দু'টুকরো কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে তেমন মানুষেও ঈশ্বর দর্শন হয়। জলাশয়ের কিনারায় ছোট গর্ত্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে জমে; তেমনি মানুষের ভেতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী। এমন আছে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ। নর নারায়ণ। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষ হবে না"?

.........'প্রথমে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর ও সত্য উপলব্ধি কর।

তোমার জীবন দিয়ে দেখাও যে ধর্ম্ম অর্থে কেবল শব্দ ব নাম বা সম্প্রদায় বোঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্ম অনুভূতি যারা অনুভব কোরেছে ধর্ম্ম লাভ কোরেছে, তারাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। যতদিন মানুষের মধ্যে অধিকার ভেদ আছে ততদিন ধর্ম্মের ও বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য ; তাই বোলে যে শুধু ধর্ম্মের খোলসটা দেখে ভেদ বুদ্ধিতে আছন্ন হয়, সে নিজেরই অনর্থ করে'।

'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'। অর্থাৎ যে এই জগতে নানারূপ দর্শন করে সে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে। গীতা ও উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যেসকল নর নারীর স্বরূপতঃ একই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার বিভিন্ন রূপ। ঈশোপনিষদে আছে, যিনি সকল ভূতে আত্ম দৃষ্টিতে দেখেন এবং আপনার আত্মাকে সকলের আত্মা মোনে করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা কোরতে পারেন না'।

ঠাকুরের কথায় আছে, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসী তাই কর"। কবীর দিল্লীর বাদশাহ সিকান্দারশা লোদীর কাছে বোলেছিলেন, 'আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতের পুতুল আমার এ দেহে অসীমের খেলা আছে। আমি সেই দেশের বাসিন্দা, যেখানে জাতি, বর্ণ কুলের বিভেদ নাই। একেই বলে অদ্বৈতজ্ঞান আর অনুভব করা। কবীর একেই বোলেছেন 'ভারত পন্থা'।

বুনি। (স্বগত)। ইংরাজি ১৯১৯ সালে শ্রীবৃন্দাবন গিয়ে

দেখে এসেছি সেখানে 'রামলীলা, রাসলীলা', হয়। ব্রজবাসী গয়লার ছেলেদের রাধাকৃষ্ণ, গোপীগণ বেশ সাজিয়ে প্লে করবার পূর্ব্বে ঐ রাধাকৃষ্ণকে বসিয়ে বেশ কোরে সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের মত পূজা, আরতি করে। তারপর রাধাকৃষ্ণকে খাইয়ে দেয়, সেবা করে, চামর করে, পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় বুকে দেয়। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ রাধাকৃষ্ণকে খাইয়ে প্রসাদ করিয়ে সেই প্রসাদ কাপড়ে বেঁধে বাড়ীর জন্য রেখে দেয়। দর্শকগণ রাধাকৃষ্ণকে দেখছেন আর কাঁদছেন, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, কি ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস তা বর্ণনাতীত। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন সত্য কি মিথ্যা। এমনভাবে নর-নারায়ণকে সাক্ষাৎ দেবতার মতন পূজো ও আরতি প্রভৃতি কোরতে আর কোথাও দেখিনি।

স্বামীজির বাড়ী। ৬—১২—৪৬—২৩শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ত্রয়োদশী ১৩৫৩ সাল। রাত্রি ৮টা। কমল, বরেণ প্রভৃতি উপস্থিত।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদেরপ্রতি)। গরীবদের দেশে, গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে তাদের যে সব কষ্ট দেখেছি, শরীরের, খাওয়ার, শোওয়ার, পরনের অবস্থা কি আর বোলব (উঃফ্, চমকিয়া) আজ রাত্রে ঘুম হবেনা। দেশের কি অবস্থা, কি বোলব। আজকাল অনেকে—রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাদা কত কি যোগাড় কোরেছে—। (উত্তেজিত হোয়ে) সবাইকে Toylus Rebulic কাছে join, কোরতে হবে। বড় বড় জায়গা—সব Bread,, Education ও Medicineএর কাজে লাগান হবে।

কমল। (মহিমমহারাজ)। আমি অনেক দিন থেকে গরীবদের নানান কষ্ট দেখে ভাবতুম, এমন কেউ নেই যে তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে। বড় বড় ধনি লোকেরা গরীবদের ব্যবস্থা কোরতে পারেন না! ঠাকুরের কথায় আছে, ঠাকুর ৺মথুর বাবুকে গরীবদের সাহর্য্যের জন্য বোলেছিলেন—

মহিমমহারাজ। (কমলের প্রতি)। যা যা, দোহাই দিতে হবে না, নিজে কিছু করবার থাকে ত কর। ঠাকুর শক্তি দেবেন, দেশের কাজে মরগে যা, না হয় জিতগে, ভাবগে যা।

(ইং ১৮-১২-৪৬—কথার পর) মহিমমহারাজ কিছুপরে বসে চুরুট খেতে খেতে কমলকে বল্লেন, 'তুমি 'ক্ষাত্রভাব' আনবে, তা না হলে জগতে ট্যাকা মুস্কিল হবে'।

১৯—১২—৪৬—৩রা পৌষ,বৃহস্পতিবার একাদশী ১৩৫৩ সাল।

আজ মহাপুরুষজীর জন্মতিথী পূজা। রাত্রি প্রায় ৭টা। কমল মহিমমহারাজের পায়ে মালিশ ও সেক্ দিতে দিতে ভাবতে লাগল, এঁর পায়ে হাটুর গাঁটে গাঁটে বাত ও বেদনা হয়ে বড় কষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে বাঘের চর্ব্বি' মালিশ দিচ্ছি তবুও কেন যাচ্ছে না। কত দিন ঠাণ্ডায়, কত তপস্যা বোসে করেছেন, সেই সব এখন বাতে ধরে গেছে। 'স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী' বইতে জানিয়েছেন যে, স্বামীজি বাহিরে ভ্রমন কালে স্যাঁৎ স্যাঁতে জায়গায় শুয়ে থেকে গেঁটে বাতে ধরে গেল। নেবু চুষতুম তাইতে অসুখটা অনেক কমে গিয়েছিল। স্বামীজির পেটের অসুখ ও পাথুরী রোগে কষ্ট পেয়েছিলেন। আর গলায়

আলজিভ্ ফুলে ছিল, ব্যাধিটা তাঁর আত্মীয়ের সকলেরই আছে। ডাক্তার বলেন, ঔষধের দরকার নেই ঠাণ্ডা জল দিয়ে কুল-কুচি করবে আর গলায় ঠাণ্ডা জল লাগাবে, তা'হলে কুঁচকিয়ে যাবে ও শক্ত হয়ে যাবে। মহিমমহারাজের রক্ত পিত্ত হয়েছিল, মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত উঠ্ত।

কমল। (মহিমমহারাজ)। কাল যে বললেন, 'ক্ষাত্রভাব' বিষয়, শুনেছিলুম, আমার জন্ম তারিখে লেখা আছে যে, ২৮শে আষাঢ় সোমবার, ক্ষত্রিয়বর্ণ, দেবগণ, শুক্রের দশায় জন্ম। তা ক্ষত্রিয়বর্ণ মানে কি ক্ষাত্রভাব ?

মহিমমহারাজ। (কমল)। না ক্ষাত্রভাব আলাদা, তেজ ভাব। তোমার এখন দুঃখ কষ্ট কি না তাই ও ভাব নেই। পরে আসতে পারে।

কমল। (মহিমমহারাজ)। একদিন—মহাপুরুষজীকে (স্বামী শিবানন্দ) পত্রে জানিয়ে ছিলুম যে আমার ইচ্ছা দেশের কাছে নরনারায়ণ সেবাদি আশ্রম কোরে কোরব কি না ? 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ৩—৩—১৯৪১—১৮ই ফাল্গুন রবিবার, ১৩৪৭ সালে "শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাশ্রম" নামে বার কোরেছিলুম। মহাপুরুষজী আমায় পত্রে জানান যে, তাঁর ইচ্ছা বা মত নেই। যেমন আছ তেমনি থাক।

মহিমমহারাজ। (কমল)। আচ্ছা আচ্ছা, ও পরে হবে আসুন।

৭—৯—১৯৪৭—২১শে ভাদ্র রবিবার ১৩৫৪ সাল। (রাত্রি ৭।৩৮

মিঃ জন্মাষ্টমী পড়বে) স্বামীজির বাড়ী। বিকেল বেলা, কমল, লক্ষ্মী, শরৎ ও দক্ষিণ ঘরে ধীরেন, বরেন, মানস, কেষ্টবাবু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

মহিমমহারাজ। (শরৎ)। ভগবান দেখেছ, দেখবে?

শরৎ। (মহিমমহারাজ) আজ্ঞে না, দেখিনি, দেখতে যাই। মহিমমহারাজ। (শরৎ)। ঠিক বলছ, সত্যি দেখতে চাও? শরৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখতে চাই।

মহিমমহারাজ এই ছাখো বোলে, হাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে, কমল লক্ষ্মী ও দক্ষিণ ঘরে যারা ছিলেন তাদেরও দেখিয়ে বললেন, 'এরাই সাক্ষাৎ ভগবান, আমি এদের পূজো কোরি। আকাশেতে ভগবান আছে ও সব জানি না, এরা জ্যান্ত ভগবান'।

শরৎ আজ্ঞে হ্যাঁ, বোলে প্রণাম করতে লাগল। একটু পরে ২।৪ জন ভক্ত এলেন।

মহিমমহারাজ। (সকলের প্রতি)। আজ জন্মাষ্টমী পূজো। আজ মা, বাবাকে পূজো করতে হয়। মার পায়ে ফুল দিয়ে পূজো কোরবে। (কমলের প্রতি) মার হাতে 'ব্রজধাম দর্শন' বইটা দিবি আর মাকে পূজো কোরিস।

একজন। (মহিমমহারাজ)। আমার ত মা, বাবা নেই মারা গেছেন কি কোরবো? মহিমমহারাজ। (একজন)। কেন উদ্দেশ্যে স্মরণ কোরে ত হয়। লোকে শ্রাদ্ধে পিণ্ড দেয় ওটা ত একই জিনিস।

পরদিন, নন্দোৎসব, সোমবার—আজ মহিমমহারাজের জন্ম-

তিথী পূজা। কমল মহিমমহারাজের কাছে প্রায় দেড়টার সময় যায়। বৈকাল বেলা কয়েক জন ভক্ত আছেন।

মহিমমহারাজ। (কমল)। মাকে পূজো কোরে ছিলে ?

কমল। (মহিমমহারাজ)। আজ্ঞে হ্যাঁ, মার (গর্ভ-ধারিনী মা) পায়ে ফুল দিয়ে পূজো কোরেছিলুম ও হাতে মিষ্টি আর আট আনা পয়সা দিয়ে ছিলুম।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। ভাখ, এ (কমল) কেমন মাকে পূজো করেছে, মা, বাপকে পূজো করলে একটা মনের ভাব বদলে যায়, বুকে একটা বেশ আনন্দ ও জোর আসে। সঙ্কোচ ভাবটা ত্যাগ কোরতে হবে।

কমল। (মহিমমহারাজ) আজ্ঞে হ্যাঁ, গঙ্গা পূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়। ঐ রকম ঘরে ঘরে পূজাটা যদি চলে সকলের মনের ভাব, শক্তি বেড়ে যাবে।

মহিমমহারাজ। (কমল)। হ্যাঁ, সকলের মঙ্গল হবে। যদি তোমরা নির্ভয়ে বিশ্বাস এনে ভক্তি কোরে পূজো কর ত দেখবে মনে একটি ভয়ের ভাব বা নিস্তেজ ভাব দূর হয়ে যাবে—বিশেষ হিন্দু পর্ব্ব দিনে, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, জগদ্ধাত্রী পূজায়, শিব-রাত্রিতে, মা, বাবার পূজা করা খুব ভাল।

মহিমমহারাজ। (কমল, লক্ষ্মী, শরৎ প্রতি)। কোন একটা বইতে পড়েছিলুম ঠিক মনে হচ্ছে না। যাহউক, বুদ্ধদেবের তপস্যার সময় একদিন, তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে ঢলে ঢলে পড়ছেন। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বুদ্ধদেবের কাছে

এসে বল্লেন, আহা ! বাবা, তোমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে যে আর তোমার 'কষ্ট দেখতে পারছিনা---বুদ্ধদেব বোল্লেন; কে তুমি এ সময়ে এসে আমার কষ্ট দেখছ ? বৃদ্ধা বোল্লেন, বাবা, আমি যে তোমার মা। স্বর্গ হতে তোমার কাছে আসছি। বুদ্ধদেব শুনে বোল্লন, আমার মা ত নেই, শৈশব হতে আমি মাতৃ হীন হয়েছি। তুমি এত বৎসর পর আমার কষ্ট দেখে স্বর্গ হতে আসছ—ধন্য তোমার করুণা ও টান।

বুনি। (স্বগত)। মা, বাবা আদি গুরু। যা হতে জগৎ দেখলুম, ভগবান আছেন বোলে ধারণাদি করতে যা কিছু শিখেছি। যদি মা, বাপ, দীক্ষাগুরু ও সাক্ষাৎ ভগবান এরা যদি একসঙ্গে বসে থাকেন ত আগে মা, বাবাকে প্রণাম কোরে তবে গুরু ও ভগবানকে প্রণাম করতে হয়। যদি মা, বাবাকে আগে প্রণাম না কোরে কেউ আগে গুরুকে, ভগবানকে প্রণাম করতে যায় ত ত্যঁরা সে প্রণাম আগে নেবেন না। তাঁরা নিশ্চয়ই বোলবেন, আগে তোমার মা বাপকে প্রণাম কর তারপর আমাদের কর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা যখন দক্ষিণেশ্বরে মারা যান, তখন ঠাকুর তাঁর মার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ধোরে কেঁদে বোলেছিলেন, "এই শরীর হোতে এই শরীর (নিজ শরীর দেখিয়ে) হোয়েছে"। এই কথাটি তিন বার বোলেছিলেন। আর শ্রীশ্রীমার কথায় আছে, 'গর্ভধারিণী মার পথের সঞ্চয় করবার সাহার্য্য কোরতে পার, তবেই তো ঠিক ঠিক ছেলের কাজ কোরলে। তাঁর

(মার) বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হোয়েছে। তাঁর (মার) সেবা করা ছেলের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে”।

আমরা সচরাচর দুর্গা মহাষ্টমীর দিনে বা অন্য মানসিক পূজোয় ছোট ছোট কুমারী কন্যাদের পূজো করতে দেখে থাকি এইমাত্র। কিন্তু নিজের গর্ভধারিণী মাকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে মায়ের চরণে ফুল দিয়ে পূজো করতে শিখিনি; এর চেয়ে আপশোষ আর কি আছে! মাতৃ ভক্তির পরিচয় ‘জনা ও প্রবীর’ এই আখ্যানটি থেকে বেশ শিখতে পারা যায়। এ ছাড়া, ভারতে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে বা ইতিহাসে দেখতে, শুনতে পাওয়া যায় যে, কারা মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠ দেখিয়ে গেছেন।

ইং ৯—৩—১৯৪৮—২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার, শিবরাত্রি পূজো, ১৩৫৪ সাল। স্বামীজির বাড়ী। লক্ষ্মী, কেষ্ট, কমল, মানস, বরেণ, শরৎ, কেশব, ফটিক (ডাক্তার) প্রভৃতি উপস্থিত। আজ শিবরাত্রি, বহু ভক্তগণ ও মেয়েরা এসে মহিমমহারাজকে দর্শন করতে আসছেন। কেউ কেউ ফল, মিষ্টি, ফুল মিষ্টি আনছেন। মুচীরা একটি হিন্দুস্থানী থালাতে ফল, ফুল, মিষ্টি, ডাব ও কিছু আবীর এনেছে।

কেষ্ট। (মহিমমহারাজ)। মুচিরা প্রসাদ দিয়ে গেছে।

মহিমমহারাজ। আন আন, আগে তাদের জিনিষ আমার মাথায় ঠেকিয়ে দাও। তিনি ঐ প্রসাদের থালা নিয়ে মাথায় ঠেকালেন।

মহিমমহারাজ। (ভক্তদের প্রতি)। তোমারা আজ

মাকে পূজা করেছিলে? মানস। হ্যাঁ, আমি আমার দাদারা বাড়ীতে মাকে বেশ কোরে পূজা করেছি। ফটিকবাবু ও কেউ কেউ বল্লেন, আমরাও মাকে পূজো করেছি। কমলের ভাগ্যে আজ মাকে পূজা করা হয়ে উঠেনি। কারণ মা চন্দননগরে ও বাবা মধুপুরে গেছেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুবোধ ও বাড়ীর মেয়েরা, ধীরেন, উপেন, প্রভৃতি ভক্তগণ এলেন। উমেশ বাবু এসে কমণ্ডল থেকে গঙ্গা জল নিয়ে সকলের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে শিব শিব—বোলে দিলেন। দক্ষিণ ঘরে সকল ভক্তগণ বসেছিলুম, উমেশ বাবু এসে আমাদেরও মাথায় গঙ্গা জল দিয়ে শিব শিব—বোলে বল্লেন, এই ত শিব পূজা হল—। কমল ঠাকুর, স্বামীজির ছবিতে ফুল ও ধুপ দিয়ে মহিমমহারাজের পায়ে বেল পাতা, আকন্দ ও অন্যান্য ফুল দিয়ে পূজা করাতে তিনি বল্লেন, 'তোকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—তোর Nerves গুলো খুব Steady হয়ে যাক—।

লক্ষ্মী, কেষ্ট ও কয়েকজন সন্ধ্যার পর প্যারী বাবুর বাড়ী গেলেন। আজ সেখানে ভক্তগণ শিব রাত্রি পূজা কোরবেন। মহিমমহারাজ যীশুর মা মেরীর যশোদা ভাব প্রভৃতি বিষয় বল্লেন।

ইং ১১—৩—১৯৪৮—২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার, দ্বিতীয়া ১৩৫৪ সাল। আজ ঠাকুরের জন্মতিথী পূজা। বুনি সকালে বেলুড় মঠে যায়। বেলা ২॥টার সময় মহিমমহারাজের কাছে গিয়ে মঠের প্রসাদ দেয়।

বুনি শুনল্ যে আজ সকালে মহিমমহারাজের কাছে বহু ভক্তগণ ও মেয়েরা এসেছিলেন। বরেনের বাড়ীর মেয়েরা এসেছিলেন। তিনি (মহিমমহারাজ) ঠাকুরের গলার মালা নিয়ে আজ মেয়েদের সকলকে দিয়েছেন। তিনি আজ সকলকে আশীর্ব্বাদ করেছেন ও কমলকেও আশীর্ব্বাদ করলেন—। সুরেন বাবু এলেন, কমল তাঁকে মঠের প্রসাদ দেয়।

(সংযোগ)। স্বদেশ প্রতি স্বামীজির বাণী

বুনি। (স্বগত)। (শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির যে সমস্ত কথা বা উপদেশ দিয়ে বোলে গেছেন তার মধ্যে যদি কাহারও ধারণা হয় যে তাঁরা যে গুলি শিক্ষা দিয়ে গেছেন সে গুলি কি এক না ভিন্ন মত কিছু আছে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এক মত, যে দিক দিয়েই দেখা যাউক না কেন। বরং ঠাকুর স্বামীজিকে সকল দিকেই শ্রেষ্ঠ কোরে বোলে গেছেন, "নরেনের সঙ্গে কারো তুলনা হবে না"। ইংরাজি ১৮৮৬ সালে কাশিপুর বাগান বাড়ীতে ঠাকুর পীড়িত অবস্থায় একদিন একটি কাগজে লিখেছিলেন, "নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে"। আরও বোলেছিলেন, "আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান কোরি। আমি ওর (নরেন্দ্রের) অনুগত। ওর পুরুষ ভাব, আমার প্রকৃতি ভাব। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর' অখণ্ডের ঘর"।

একদিন ঠাকুর স্বামীজিকে বোলেছিলেন, "আমি তোকে সব দিয়ে ফতুর হলুম"। আর শ্রীশ্রীমাঠাকুরণ একদিন ভাবাবেসে দেখেছিলেন, যে ঠাকুর স্বামীজির শরীরের মধ্যে

প্রবেশ করেন। স্বামীজি নিজ মুখে বার বার বোলে গেছেন যে, 'বিবেকানন্দ পরমহংসদেবেরই শক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ হ'তে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ হ'তে পারে। আমি আমার প্রভুর (শ্রীরামকৃষ্ণের) প্রতিধ্বনি মাত্র"।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্য সাচিন'।

যাহউক, তাঁহারা জগতে এসে যে সমস্ত শিক্ষা বা উপদেশ প্রচার কোরে গেছেন সে গুলি সারা জগৎবাসীর হিতের বা মঙ্গলের জন্য। আমাদের কর্ত্তব্য, যে তাঁহাদের অমূল্য শিক্ষা-বাণী যতই ঘরে ঘরে প্রচার কোরতে পারি আর কার্য্যে অগ্রসর হ'তে পারি ততই মঙ্গল ও শান্তি, সকল বিষয়েই হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নচেৎ কি ফল দাঁড়াবে তা তাঁরাই জানেন—ঠাকুর ও স্বামীজি যা বোলে গেছেন, তাই হচ্ছে বা ঘটছে আর পরে ও তাই ঘটবে বোলে মনে হচ্ছে; এ যুগ 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নূতন ভারত', ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ঠাকুর একটী কথার আভাস দিয়ে বোলেছিলেন, "শুদ্ধ ভক্ত যারা শুধু তারাই থাকবে"।

'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইতে আছে ঃ—

স্বামীজি। (মিসমুলার)। এবার শরীরটা শত বৎসর রাখিব। আমার এবার অনেক দুরূহ কাজ কোরিতে হবে। এবার শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজ কোরিব। পূর্ব্বে আমি বুদ্ধ দেহ ধারণ কোরিয়াছিলাম। কাজ ত সবে সুরু কোরেছি

একটা মহাতরঙ্গ তুলতে হবে—জাতিটাকে উলটে ফেলতে হবে। জগতে নূতন সভ্যতা দিতে হবে। শক্তি কি জগৎ বুঝবে। পূর্ব্ববারে আমি যে শক্তি দেখিয়েছি এবার তার চেয়ে ঢের বেশী দেখিয়ে যাব'।

ঠাকুর ও স্বামীজি কার ভেতর শক্তি দিয়ে কি রকম ভাবে দেশের কাজাদি করিয়ে নিচ্ছেন তা বোঝা শক্ত—স্বামীজির কথায় আছে, 'চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না, প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়'।

তাঁহারা যা অপছন্দ কোরতেন তা কোন মতেই টেকবে না বা ট্যাকে না।

স্বামীজি স্বদেশ প্রতি কি রকম কাজ কোরতে হবে, ভাবতে হবে, দেখতে হবে—তা কিছু স্বামীজির বই থেকে উদ্ধৃত কোরে এখানে দেওয়া হল।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী :—

স্বামীজি। ভারতের ধূলিও আমার নিকট পবিত্র. পূণ্য দেশ, দেবস্থান—তীর্থক্ষেত্র। হিন্দুর দ্বারা জগৎ জয়ই আমার অভিপ্রেত। ভারতবর্ষকে আবার পৃথিবী জয় কোরতে হবে। বিদেশীরা যদি ভারতে আসিয়া তাহাদিগের সেনাবলে দেশ প্লাবিত করে তাহাতে কিছু আইসে যায় না।

ভারতীয় বিশ্ব বিজয় অস্ত্রের ঝনাৎকারের দ্বারা হয় না। শান্তি প্রিয় ভারত শান্তি ও প্রেম দিয়াই চীন, জাপান ও তিব্বতকে জয় কোরিয়াছিল।

তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় কর। প্রথমে প্রেমের দ্বারা ঘৃণা জয় কোরিতে হইবে ; ঘৃণা আপনাকে জয় করিতে পারে না প্রতীচিকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় করিতে হইবে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গঠিত না হইলে সমস্ত পাশ্চত্য সভ্যতা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। সামাজিক উন্নতি লাভ করিতেই হইবে।

'প্রথমে আমাদিগকে দেবত্ব লাভ করিতে হইবে তাহার পর সকলকে দেবত্ব লাভ করিতে সাহায্য করিতে হইবে। আশু বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রথম আয়োজন আমাদের আত্মবিদ্যা। আমাদিগকে সকল জগৎ ব্যাপিয়া সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ গুলি প্রচার করিতে হইবে। জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। আত্ম উপলব্ধি কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও হইতে পারে। তপোবনই তাহার একমাত্র উপযুক্ত স্থান নহে। সঞ্চিত শক্তিকে স্বচ্ছন্দে কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে"।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন—সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ('যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গম ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'। আসক্তি ত্যাগ না কোরিলে আত্ম জ্ঞান হয় না এবং আত্ম জ্ঞান না হইলে যোগ হয় না। 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্'—আপনি আপনার উদ্ধার কর। অপরকে

ঘৃণা হিংসা করাও যা আর আপনি আপনাকে ঐরূপ করা একই কথা।

স্বামীজি পাশ্চত্য সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে দাঁড়িয়ে সদর্পে বলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। বুদ্ধিমান বুঝিয়া লহ'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই হচ্ছেন এই ভাব-প্রবাহের কেন্দ্র শক্তি। স্বামিজী আরও বলেছেন, 'আর্য্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন 'ডম্ ডম্ বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি! যাদের চলমান শ্মশান বলে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা"।

নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র জনসাধারণকে লইয়া দেশ, তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড, জাতির প্রাণ শক্তি, তাহাদের অভ্যুদয়েই দেশের অভ্যুদয় জাতির উত্থান।' এই জন্যই তিনি নিম্ন শ্রেণীদের জন্মগত সকল অধিকার তাহাদিগকে যত শীঘ্র ফিরাইয়া দিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীকে সম্বোধন করিয়া মর্ম্ম স্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন:—

স্বামীজি। এত দিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজ রাজ্য, অবাধ বিদ্যা চর্চ্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক-চাষা, জেলে মুচি, মেথর, মুদি, কারখানা, হাট-বাজার ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহেছে, নীরবে সহেছে তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা,

সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।

এরা (নিম্ন শ্রেণীগণ) এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধ-খানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে ওদের তেজ ধরবে না।

তুমি যাও অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমরা যেই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি-জিম তস্থন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।

স্বামীজি। হে বৎসগণ, তোমরা মহৎ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হও। প্রভু আমাকে এই জন্য আহ্বান করিয়াছেন। একমাত্র আশা তোমাদের উপর যাহারা নিরহঙ্কার, নম্র স্বভাব, নীচ, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাসী। **তোমরা দীন দুঃখীর দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব কর। নীচ জাতি মুচি মেথরাদি তোমার রক্ত-তোমার ভাই। সাহায্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর—তবেই তোমরা সাহায্য পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।**

হে যুবকগণ, দরিদ্র মূর্খ পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম দায় স্বরূপ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইব।

হাঁ, প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, তোমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ কর, আত্ম বলিদান কর—এই ত্রিশকোটি লোকের মুক্তির জন্য যাহারা প্রতি দিন ডুবিতেছে।

"প্রভু ধন্য, আমরা জয়ী হইবই। এই সংগ্রামে শত

শত যোদ্ধা মরিবে শত শত আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবে।

চাই বিশ্বাস, চাই সমবেদনা, জলন্ত বিশ্বাস, জলন্ত সহানুভূতি ; নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শীত অনশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হও! প্রভু আমাদের সেনাপতি প্রভুর জয়।

বল দিন রাত্ হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া, দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি।'

স্বামীজি। সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায় মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে. কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে"।

হিন্দু শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করলে প্রমান পাওয়া যায় যে, অনেক শাস্ত্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ শূদ্রগণকে সমান অধিকার দানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

যথা ঃ—যর্জুবেদ, পদ্মপুরান, স্কন্দপুরান, গৌতম সংহিতা, গীতা। এই ধর্ম্ম গ্রন্থ গুলিতে আছে ঃ—

১। আমি সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণকারিনী উপদেশ দিতেছি। তোমরা অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকে ও এই সকল উপদেশ দিবে।

২। ভাগবত ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। ভগবানের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র।

৩। শূদ্রগণ ও শালগ্রাম পূজা করিলে মুক্তি লাভ করে।

'চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ'।

৪। চণ্ডালও ভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন।

৫। অসৎ কুল জাত স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমগতি, প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং যে কোন বর্ণের লোক যদি ওঁকার উচ্চারণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে সে আমাকে লাভ করে।

৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে ঃ—শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তরাজ রায় রামনন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে বলেন, কিন্তু তিনি শূদ্র বলিয়া ইহাতে সংস্কোচ প্রকাশ করায় শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী কেনে নর। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'।

৭। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে ঃ—'যেই জন বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে'।

৮। বৈষ্ণব তোষিনী গ্রন্থকার বলেন ঃ—হরিভক্ত পরায়ণ চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

৯। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আছে ঃ—'যে হরিনাম করে (অর্থাৎ যে ঠিক ঠিক ভক্ত যাহার মন ভগবানে থাকে) সে যদি গোমাংস খায়, সে গোমাংস তার হবিষান্ন তুল্য হয়। আর যে হবিষান্ন কোরে খায় সে যদি ঐরূপ ভগবানের ভক্ত না হয় তা' হলে হবিষান্নটা তার গোমাংস তুল্য হয়''।

যাহউক, সকল বিষয় স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ—ইহাই যোগের আদর্শ। আজ ভারতের রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতার যে নূতন মন্ত্রে ভারতকে 'জয় হিন্দ' শব্দে দীক্ষিত করিয়াছেন তাহার অর্থ—'হিন্দ' শব্দে আধ্যাত্মিকতাই সূচিত হয়! 'জয়'—অর্থে বুদ্ধির জীবনের সর্ব্ব কাজে আত্ম শক্তির প্রয়োগ ও সুপ্ত আত্মার জাগরণ ও বিশ্বকে ভগবৎ প্রেমে প্লাবিত করা।

স্বাধীনতা অর্থে শুধু নয় যে পৃথিবীতে বসিয়া ভোগের বিস্তার করা। নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে জীবন গঠন করিবার সুযোগ। যদি বিদেশীয় অনুকরণে জীবন কাটান হয় ত আমাদের 'মহতী বিনষ্টি'।

স্বামিজীর কথায় আছে ঃ—'হে স্বদেশভক্ত সংস্কারকবৃন্দ,—জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ, স্বজাতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

আগামী ৫০ বৎসর এই মাতৃ ভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হউন। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিতা, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—মাতৃ ভূমি গভীর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতি রোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃ শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে'।

'আবশ্যক চিত্ত শুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা। চিত্ত শুদ্ধ কি করিয়া হইবে? সর্ব্ব প্রথমে বিরাটের পূজা দ্বারা, যাহারা

তোমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান তাঁহাদের পূজা দ্বারা। তোমাদের স্বদেশ বাসিগণ এখন তোমাদের উপাস্য দেবতা হউন। হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্বের পরিবর্ত্তে তোমাদের স্বদেশ বাসিগণের পূজা কর। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষরূপ মহা-পাপের ফলে তোমরা দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবু ও কি তোমাদের চক্ষু খুলিবে না ?

মহৎ কার্য্যের জন্য তিনটি জিনিসের আবশ্যক। প্রথমটি হৃদয়বত্তা। আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া থামিয়া যায়, কিন্তু হৃদয় হইতেই প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যে প্রবেশ করিবার দ্বার।

সব ত্যাগ করে অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ভগবানের ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে ত মায়া হইল ; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা' তাই ওদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের 'সেবা' করিব ; 'তোমারই একাজ' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রত পালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান ; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।

নিজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতবর্ষকে প্রবল হইতে হইবে, ঐক্য বদ্ধ হইতে হইবে, তাহার সমস্ত জীবন শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে"।

'সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, জীবনের মেরুদণ্ড ও ভিত্তি, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। এই ব্রত পালনের পথ হইতে ভারত কখনও এক চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হয় নাই,—

মোগলই দেশ শাসন করুক, অথবা পাঠান অথবা ইংরাজ শাসন করুক।

'আমাদের মাতৃ ভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্ম রূপে এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয়-দেহ একমাত্র আশা। আমার মাতৃ ভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায় যাহাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সব গুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ ইহাদের দোষ গুলি থাকিবে না, তাহা হইলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।

আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত"।

—o—

অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়। শ্রীরামলালদাদার বাড়ী

একদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মন্দির হতে বুনি আমবাগানের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব দিকে যে বড় খিড়কি ফটোক আছে, সেই রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে তারপর বাঁ উত্তর দিকে একটু গিয়ে দেখল্ দোতলা একটি বাড়ী। দরজার পাচিলের উপর লেখা রয়েছে "জয় প্রভু রামকৃষ্ণ" এই রামলালদাদার (শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (দাদার) (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) বাড়ী।

বুনি গিয়ে দাদাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। রামলাল দাদা মাথায় হাত দিয়ে বোললেন, 'জয় ভগবান, জয় প্রভু রামকৃষ্ণ'। রামলালদাদা। (কমল)। কখন এলে ? কমল মন্দির হতে এই আসছি। রামলালদাদা। বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন ? কমল। সকলে ভালই আছেন। রাম-লালদাদা কমলের কপালে মা কালীর সিঁদুরের ফোটা দিলেন ও কিছু প্রসাদ, তারপর এক ঘটি গঙ্গা জল ও কিছু হরিতকীর কুচো। কমল। (রামলালদাদা)। আপনাকে কিছু দুঃখ কষ্ট জানাব দয়া করে শুনবেন কি ?

রামলালদাদা। কি বলনা শুনি।

রামলালদাদাকে দুঃখ জানান

কমল। (রামলালদাদা)। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে আর সর্ব্বদা হিচি কিচি কলরব শুনে প্রাণে একটা অশান্তি ভোগ করি। নানান কারণে মনে হয় মরলে ভাল হয়। একভাবে ১০।১৩ বৎসর জীবন কাটান আর সহ্য হয় না। বলে, "সময় হলে হয়, ফুল ফুটলে আপনি ভ্রমর এসে জোটে"। আমার আর কবে কি হবে, মলে কি আর হবে? রামলালদাদা। সব ত শুনলুম ভাই, কার না সাধ হয় শান্তিতে থাকতে, কিন্তু হয় কই। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় ত আপসে সব হয়ে যায়। ভারে ভারে সব জিনিষ এসে জোটে। মার পাঁচটী ছেলে মা জানেন কার পেটে কি সয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড তিনি সব বোঝেন হাক প।ক করলে কি হবে বল। ওসব অজ্ঞানে হয়, যেমন বিকারের রুগি বলে এক জালা জল খাব। তারপর ভাল হলে সে আর কি ও কথা বলে, তখন সে বুঝতে পারে সব অজ্ঞানে বলেছি। সময়ের সাপেক্ষ করতে হয় তবে তাঁর ইচ্ছা হলে কি না হয়। সময় অসময় কিছুই থাকে না। তাঁর নাম করে যাও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর তিনি মঙ্গলময় ইচ্ছাময় তোমার মঙ্গল করবেন এই আমার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছায় তোমার সব হয়ে যাবে বৈকি। ভাই, কি আর করবে বল, সকল সংসারে দুঃখ কষ্ট লেগেই আছে। ১০।১২ বৎসর কি বলছ এমন কত বৎসর লোকের কেটে যাচ্ছে। বিধাতা প্রসন্ন না হলে কি আর কিছু হয়, তিনি যার প্রতি প্রসন্ন হন সে যদি ধুলো মুটো করে ত কড়ি মুটো

হয়ে যায়। আত্ম হত্যা করবো বলা মহা পাপ ও সব ভেবোনা। সংসারে অনেক কথা শুনতে পাবে দেখতে পাবে তা বলে বিষন্ন হোয়ো না। সুখ হোগ, দুঃখ হোগ, মন তুমি আনন্দে থাক বুঝলে? কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামলালদাদা। (কমল)। তোমার এ সব কথা মাষ্টার-মহাশয়, মহাপুরুষজীকে বলনা তাঁরা কি বলেন শুনি।

কমল। শোনাতে কি আর বাকী রেখেছি সব বোলেছি।

রামলালদাদা। কি বোলেছিলে?

কমল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার রামলালদাদাকে জানাল :—

৮—৭—১৯২৯—২৪শে আষাঢ়, রথযাত্রা, সোমবার দ্বিতীয়া, ১৩৩৬ সাল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এই :—

শ্রীমহাপুরুষজী ও কমল

মহাপুরুষজী। (কমল)। কি 'কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভুলেছে ন মাস ন দিন? কমল। আপনার শরীর কেমন আছে? মহাপুরুষজী। দেখতে পাচ্ছ ত, খুব ভাল নয়, মাষ্টারমহাশয়ের মত বাবা আমার ও শরীর তদ্রূপ, যেতে পারলেই হয়'। কমল। আমি কি কোরব মনটা সব সময়ে ভাল থাকে না, মনে কত রকম উদয় হয়, ইত্যাদি। মহাপুরুষজী। কিসে ভাল থাকে? বে কোরতে ইচ্ছা হয়? কমল। আজ্ঞে বিয়ে কোরতে এমন কি ভাল লাগে। মহাপুরুষজী। 'একটা কাজে লেগে থাক দিকিনি। কমল। উপস্থিত মাষ্টার-

মহাশয়ের স্কুলে পড়াচ্ছি। মহাপুরুষজী। কতদূর পড়েছ? কমল। আজ্ঞে তাঁর স্কুলে 3rd Class পর্য্যন্ত পড়েছি। তিনি আমায় বহু যত্ন কোরেছেন, পড়িয়েছেন ইত্যাদি। তাঁর ঋণ বোধ হয় শোধ কোরতে পারবো না। মহাপুরুষজী। বটে বেশ বেশ তবে ত খুব ভাল, তুমি ত গান ও ছেলেদের শেখাও? কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু বলুন কি করে জীবন কাটাব? মহাপুরুষজী। কি আর বলব, বেশ ত মাষ্টারমহাশয়ের সঙ্গ ১০।১২ বৎসর ধরে করছ, একি কম কথা। তোমার খুব ভাগ্য ভাল, জন্ম জন্মান্তরের ভাল সংস্কার না থাকলে কি ওসব হয়। সত্যি বলছি, তুমি খুব ভাগ্যবান, তা না হলে কোথায় ভেসে চলে যেতে, এই ত বেশ আছ। সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে থাক, ঠাকুরের বই পড়বে। ধ্যান, জপ কোরবে যা কোরলে ভাল হয় সে ত নিজে বুঝতে পার। আর বেশী কি বোলব। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই সমস্ত দেখবেন।

কমল। (রামলালদাদা)। আপনার মত সকলেই বলেন, যে ঠাকুরকে সব জানাও ইত্যাদি।

রামলালদাদা। তা হলে সব শেয়ালেরই এক রা।

কমল। আজ্ঞে তাই ত শুনছি। রামলালদাদা। তোমার দীক্ষা হয়েছে? কমল। সে অনেক ব্যাপার ঘটে তবে হয়েছে। রামলালদাদা। কি রকম ব্যাপারটা একবার শুনি

কমল সমস্ত ঘটনা গুলো একে একে বোলতে সুরু করল।

১৩-৪-১৯২৮—৩১শে চৈত্র, চড়কপূজা, শুক্রবার অষ্টমী

১৩৩৫ সাল। সকালে আমি ও হিমাংশু বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করি। তিনি গায়ে তেল মাখ ছিলেন, হিমাংশু প্রথমে তাঁকে ঠাকুরের দেশে আমরা গিয়েছিলুম সেই সব গল্প বো্লতে স্বুরু করলে।

১(সংযোগ)। ৬—৪—১৯২৮—২৫শে চৈত্র,শুক্রবার,দ্বিতীয়া ১৩৩৫ সাল। good friday এর দিন আমরা তিন জন ঠাকুরের দেশে ('কামারপুকুর') যাত্রা করি। বর্দ্ধমানের দামোদর নদী পার হোয়ে বাস ও গরুর গাড়ীতে গিয়ে রাত্রি ৩টার সময় পৌঁছাই। শিবুদাদা (রামলালদাদার মধ্যম ভ্রাতা)। ছিলেন। শনিবার দ্বিতীয়া সকালে ঠাকুরের জন্ম স্থানাদি দর্শন কোরি। শিবুদাদা আমাদের হু'জনকে সমস্ত দর্শনাদি করিয়ে গল্প ও গান শোনালেন। কমলও কয়েকটী গান শোনাল।

রবিবার দিন সকালে 'জয় রামবাটী' (শ্রীশ্রীমার দেশে) যাই। সোমবার সকালে কামার পুকুর এসে জলযোগ কোরে আমরা 'আরামবাগে' এসে ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী অন্ন খেয়ে ও রাত্রে একটী ভক্তের বাড়ী আহার কোরে ১০৷৷০ টার সময় যাত্রা কোরি। মঙ্গলবার সকালে ১টার সময় কলকাতায় আসি।

তারপর তাঁকে বোললে যে, কমল আমার আত্মীয় হয়। মহাপুরুষজী শুনে বোললেন, 'হ্যাঁ, ওকে আমি জানি, অনেক বার দেখেছি'। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা কোরলেন, 'এখন কোথায় আছ? কি কোরছ'? আমি বললুম, উপস্থিত মাষ্টারমহাশয়ের কাছে আছি, আগে পাটনায় ছিলুম। তারপর

এসে রেলে কাজ কোরলুম ইত্যাদি। শেষে তাঁকে বললুম, মহাপুরুষজী আমি একদিন রাখালমহারাজকে মন্ত্র ও স্বপ্নের কথা সব বলি, তিনি শুনে আমায় বোলেছিলেন যে, 'তোর হবেরে হবে তার জন্য এত ভাবনা কেন। তুই একদিন মঠে গিয়ে শিবানন্দমহারাজের কাছে আমার নাম কোরে যাস তিনি মন্ত্র দিবেন। অমার শরীরটা এখন ভাল নেই নইলে আমি দিতুম'। তা আপনাকে সব জানালুম আমায় মন্ত্র দিতে হবে। এই সব কথা মহাপুরুষজী শুনে আমায় বোললেন, 'তবে আর কি তিনি যখন তোমায় ও সব বোলেগেছেন সেই সব মন্ত্র হোয়েছে। তিনি তোমায় যা বোলেছেন তা হবেই, সে কি আর মিথ্যা হয়'।

তারপর তিনি যে দিন দীক্ষা দিলেন সেই দিন কয়েকটী ঘটনা ঘটে শুনুন :—

দীক্ষা ও ফুল পড়া

২৪—৪—১৯২৮—১১ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ষটপঞ্চমী ব্রত ১৩৩৫ সাল।

আমি সকালে ১০টার সময় বেলুড় মঠে যাই, তারপর গঙ্গাস্নান করে ঠাকুর ঘরে যাই। মহাপুরুষজী আমাকে ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়ে প্রার্থনা করালেন ও দীক্ষা দিলেন। সেই দিন সুনের (হিমাংশুর) কাকা ও কয়েকজন দীক্ষা নিয়েছিলেন। মঠ হ'তে প্রসাদ পেয়ে বেলা ৩টার সময় দক্ষিণেশ্বর যাত্রা কোরলুম।

আমি ঠাকুর ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বসে প্রার্থনা

ও চিন্তা কোরতে লাগলুম। ঠাকুরের ছোট খাটটিতে ফটোর উপর মালা ছিল ও মাথার উপর একটি জবা ফুল ছিল। ঠাকুরকে জানালুম যে, ঠাকুর তোমার মাথার উপর হ'তে যদি ঐ জবা ফুলটি পড়ে যায় ত জানব তুমি আমায় কৃপা কোরবে, আমায় কিছু ভাবতে হবে না, ইত্যাদি। তারপর ১০ মিনিট হবে, ফুলটী পড়ে গেল, এই দেখে খুব আনন্দ হল।

রামলালদাদা। (কমল)। তা বেশ, তা হলে এ সব অনেক ঘটেছিল। কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। রামলালদাদা। তুমি কি এখন মন্দিরে যাবে? কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। রামলালদাদা। চল আমি ও একবার দর্শনাদি করে আসি। কমল ও রামলালদাদা বাড়ী হতে মন্দির যাত্রা করলেন।

শ্রীরামলালদাদার চরিত্র

রামলালদাদা তেঁতুল গাছের নিকট এসে চটি জুতা খুলে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর, ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটী রেখে, বেলতলার দিকে দৃষ্টি কোরে, চক্ষু দুইটী বন্ধ কোরে, মনে মনে নাম করতে লাগলেন। তারপর পঞ্চবটী বনেতে ঠাকুরের স্ব হস্তের রোপিত অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায়, ঐরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। তথা হ'তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা নিয়ে খেলেন, বুকে ও মাথায় দিলেন।

রামলালদাদা ঠাকুর ঘরে এসে প্রথমে হাটু গেড়ে বোসলেন। দুটি গোড়ালির উপর কোমরের পাজা, তারপর দুটী হাত হাটুর উপর রেখে, চক্ষু বন্ধ কোরে, মিনিট ৩৷৪ থেকে তারপর ভূমিষ্ঠ

হয়ে মাথার সামনে, তুটী হাতে কর জপ কোরে, বার বার মাথা টিপ টিপ কোরে প্রণাম করলেন। শেষে নাকটী ভুমে লম্বা কোরে টানলেন।

এইবার, রামলালদাদা ও কমল ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে চললেন। তথায় গিয়ে দাদা পূর্ব্বের মতো ক্রিয়া গুলি করলেন ও টাঙ্গান ঘণ্টাটী ১৩ বার বাজালেন। তারপর সিড়ি হো'তে নেমে এসে, পুনরায় ৺শ্যামসুন্দরজীকে দাঁড়িয়ে দর্শন করলেন, ও নাম করতে করতে মা কালীর মন্দিরে গেলেন।

এইবার, দাদা ও কমল মা ভবতারিণীর মন্দিরে আসলেন। দাদা পূর্ব্বের মতো ক্রিয়া গুলি কোরে মাকে প্রণাম কোরলেন, ও ভূমি হ'তে ধুলা নিয়ে মাথায়, বুকে দিলেন। তারপর, মন্দিরে ঢুকতে বাঁম দিক (পশ্চিম) হোতে মাকে প্রদক্ষিণ করতে গেলেন। তুই হাতে তালি দিয়ে আর মুখে কেবল 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গৌরী শঙ্কর সীতা রাম, বলতে বলতে চাতালের শেষ কোণে দক্ষিণ মুখ হয়ে ঐ রকম পা কোরে দাঁড়িয়ে, ৺শ্যামসুন্দরের মন্দির ও ঠাকুরের ঘরের দিকে দৃষ্টি করতে লাগলেন। তারপর প্রদক্ষিণ কোরে এসে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হোয়ে মাকে প্রণাম কোরলেন। আর বোললেন, 'জয় মা শঙ্করী, জয় মা ভগবতী, জয় মা গণেশজননী, জয় কালী'। রামলালদাদা মায়ের প্রসাদ ও সিঁন্দুর দিলেন, কমল এসে ঠাকুর ঘরে বসল। রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুর ঘরে থাকবে না যাবে? কমল। মনে করছি মার প্রসাদ

পেয়ে যাব। রামলালদাদা। বেশ বেশ। দাদা বাড়ী গেলেন কমল বসে রইল।

কমল। (স্বগত)। এর পূর্ব্বে রামলালদাদার বহুবার দর্শন পেয়েছি ও দাদার ঐরূপ ভক্তির ক্রিয়া-কলাপ গুলি দর্শন কোরেছি। কিন্তু কোন দিন দেখলাম না যে দাদা ঐরূপ ভাবে কিছু করতে ভুলে গেছেন। ঠিক একই ভাবে দাদাকে ঐরূপ কোরতে দেখে আসছি।

রামলালদাদার স্বভাবটী অতিশয় স্থির ও নম্র, সর্ব্বদাই ভগবৎ নামে তন্ময়। আবার রসিকতায় ভরপুর, দেখলে মনে হয়, অতি সৌম্য মূর্ত্তি ও বালক স্বভাব। কথা গুলি অতি বিবেচনা কোরে আস্তে আস্তে বলেন, কোনরূপ বে-ফাস বা মিথ্যা কথা বলেন না। শুনতে পাই, ঠাকুর দাদাকে বোলেছিলেন যে, "সত্যতে থাকবি তা' হলে ভগবান পাবি, সত্যই কলির তপস্যা"।

আবার শুনেছি, ঠাকুর দাদাকে অতিশয় ভাল বাসতেন, তিনি দাদাকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। কি কোরে পূজা কোরতে হয়, গান কোরতে হয়, সেবা কোরতে হয়; ইত্যাদি। রামলালদাদা ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদাই থেকে তাঁর সেবা কোরতেন। বোধকরি, দাদার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপটী ঠিক ঠাকুরের মতো। দেখেছি রাখাল মহারাজ দাদাকে নিয়ে অনেক সময়ে খুব রগড় ও খাতির যত্ন কোরতেন, সে সব দৃশ্য যারা দেখেছেন, তারাই সে সব দৃশ্যের মাধুর্য্য অনুভব কোরেছেন।

দাদার শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'শম্ভূশঙ্কর হে, জয় শিব কেদার, হরি ওঁ, গৌরী ওঁ, জয় কালী, জয় মা ভবতারিণী, জয় প্রভু রামকৃষ্ণজী, মাগো তারা ভগবান হে, এই গুলি উচ্চাচরণ কোরতে শুনতে পাই।

আমরা ঐরূপ ভাব গুলি নিয়ে যদি হৃদয়ে অঙ্কিত কোরে চিন্তা কোরতে কি কার্য্যে রত থাকতে পারি, তা'হলে আমাদের সর্ব্বদাই তাঁদের মনে পোড়বে। একটা কথায় বলে, "বাপ কো বেটা সিপাই কো ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় তবভি থোড়া থোড়া"। আর একটী আছে, "যে যাকে ভজনা করে, ভালবাসে, সে তার সত্তা পায়"। তারপর কমল মায়ের প্রসাদ খেয়ে বৈকালে মন্দির হতে একা পদব্রজে হাটতে হাটতে চিন্তা কোরতে লাগল।

বুনির চিন্তা

বুনি। (স্বগত)। আচ্ছা, রামলালদাদা, মাষ্টারমহাশয় ও মহাপুরুষজী বলেন যে, ঠাকুরকে জানাও তাঁর উপর নির্ভর কর, প্রার্থনা কর, ইত্যাদি। তা প্রথমে ভগবানকে আপনার জন ভেবে নিতে হবে, পর ভাবলে চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বহু গান ও উপদেশ আছে শিক্ষা করবার। গান— 'হে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার'। 'তোমাদেরই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা'—। তিনি যেমন রাখবেন তেমনি থাকতে হবে। সুখে, দুঃখে, মান, অপমানে, জ্বালা যন্ত্রণায়, ইত্যাদি। সমস্ত ত তাঁরই সৃজন এবং তাঁর খেলা হচ্ছে। তবে তিনি মানুষকে প্রথমে নানা বিষয় ভুলিয়ে রাখেন, পরীক্ষা কোরে মন দেখেন।

তাঁর মহামায়ায় জীব বদ্ধ হোয়ে থাকে, ভগবানের কৃপা পেলে তবে জীব শান্তি ও মুক্তি পায়। একটী কথা শুনা যায়, ভগবান বোলেছেন, "যে করে আমার আশ, তার কোরি সর্ব্বনাশ, তবু ও যে করে আশ তার হই দাসের দাস"। সর্ব্বনাশ মানে প্রথমে ভগবান তাকে নানা বিষয়ে ভয় দেখাবেন, ভোলাতে চেষ্টা কোরবেন। তবু ও যে সব সহ্য কোরে থাকে তাঁর দর্শনের জন্য, তখন তিনি তাকে দেখা দেন ও তার সব মনোবাসনা পূর্ণ করে থাকেন।

মনে কর, একজন রাজাকে দর্শন করবার জন্য তার দ্বারে গেল, প্রথমে সকলে বললে যে রাজার দেখা হবে না। তাকে নানা কথা ও ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলে। সে বোললে, আমি রাজার দুয়ারে বোসে রইলুম দর্শনের জন্য, "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন" করবো। দুয়ারে বোসে কেবল রাজার নাম গুণগান গাইব আর কাঁদব, দেখি রাজার কত কঠিন প্রাণ, আমায় না দেখা দিয়ে তিনি কেমন থাকতে পারেন। শেষে রাজা এই সব ব্যাপার দেখে, শুনে তাকে দর্শন দিলেন ও তার মনোবাসনা পূর্ণ কোরলেন। ঠিক এই রকম যদি আমরাও ভগবান দর্শনের জন্য তাঁর মন্দিরে কি নির্জ্জনে গিয়ে ভক্তি কোরে তাঁর নাম গুণগান গাই, তাঁকে আন্তরিক চাই, ত আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। তার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ কোরবেন কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের খোসামোদ কোরলে, তার গুণকীর্ত্তন কোরে

বেড়ালে, সে যদি সন্তুষ্ট হতে পারে, তা' হলে ভগবান হবেন না ? তিনি যে এ সংসারে বাপ, মা আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও তিনি অতি আপনার জন হচ্ছেন, এইটী বিশ্বাস করা চাই, নচেৎ কিছু হবে না মনে হয় !

আমাদের যত কষ্ট তার কারণ হচ্ছে যে, ঈশ্বরকে আমরা ভুলে থাকি, তাঁকে পর ভাবি, আর ভয় করি। ভগবান দেখেন যে, আমার সমস্ত জিনিষ নিয়ে এরা সংসার করছে, তার উপর আবার কেউ কেউ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে, আমায় ভুলে থাকে ইত্যাদি। তা এদের কষ্ট হবে না ত কার হবে !

আবার দেখা যায়, সাধু ও ভক্ত জনরা যদি নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করেন ত বদ্ধ জীবরা বলে, এখন ভগবান ডাকা কেন ? বুড়ো হয়ে মরবার সময় ডাকবি, এখন চুটিয়ে সংসার কর। এই সব অজ্ঞানীদের কথা শুনে হাসি পায়, তারা জানে না যে, কখন মহাকাল এসে ধরবে কে জানতে পারে ? নচিকেতার গল্পটি পড়লে ঐ বিষয় জানা যায় যে তিনি কি করেছিলেন। ঈশ্বরকে ডাকতে সময় অসময় নেই, এই বেলা যদি ডাকতে অভ্যাস না রাখি ত মৃত্যুর সময় ভুলে যাব। মরণের সময় যে যা ভেবে মরে, সে তাই হয়ে যায় শুনি। ভরত রাজা, "হরিণ হরিণ" বলে মরেছিলেন, তিনি তাই হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন। "জপ তপ কর কি, মরতে জানলে হয়"। যে জ্ঞানী হয় সে কি অজ্ঞানীর ঐসব কথায় ভোলে ? সে

কোন কথায় কাণ দেয় না, আপনার ভাবে সে থাকে। তাকে লোকে পাগল বলবে, কি নিন্দা করবে, তাকে সমাজে বসতে দেবে কি না—সাধু ভক্তরা ওসব তোয়াক্কা করেন না।

সাধারণ লোকের সঙ্গে, সাধু ভক্তদের ও প্রেমিকের কোন বিষয় মিল হয় না। 'প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র' এই গানটি ঠাকুর গাইতেন শুনি। এটি পড়লে জানা যায়, যে প্রেমিক হয় তার আচার ব্যবহার কি রকম হয়।

আবার মানুষ দুই প্রকার শুনি, মানুষ আর মানুহুঁষ। আজকাল, বহু দুষ্ট লোক দেখা যায়। বদ্ধ জীবের স্বভাব দ্বাদশ প্রকার দেখা যায় মনে হয়। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মিথ্যা কথা, চুরি, কিসে পরকে ঠকিয়ে বড় হবে, কিসে তার নাম হবে, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কামিনী কাঞ্চনে সর্ব্বদা রত। ভণ্ড-তপস্বী সেজে সমাজে ভদ্রতা পানা দেখাতে, আর ভাবের ঘরে চুরি। তারা মনে করে যে, আমরা যা করে জীবন যাপন করি এই ঠিক। আর সাধু ভক্তরা ভণ্ড সেজে যা করে তাতে জগৎটা উচ্ছন্নে গেল।

আবার দেখা যায়, ঐরূপ ব্যক্তিরা সাধু ভক্তের সাধন পথে বাঁধা দেয়। কিন্তু সাধুরা সব সহ্য করে থাকেন। "যে সয় সেই রয় যে না সয় সে নাশ হয়। সকল বর্ণের স তিনটি শ, ষ, স"। সাধু ভক্তদের নিন্দা করলে দেখা যায়, তারা হেসে উড়িয়ে দেন। "হস্তী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার, সাধুন কো দুর্ভাব নেই, যব নিন্দে সংসার"।

হাতী বাজার দিয়ে আপন মনে চলে যাচ্ছে আর কুত্তারা পেছু পেছু ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। হাতী জানে যে, এরা ক্ষুদ্র অজ্ঞানী প্রাণী এদের আর কি বলব, যদি একবার ফু দি ত কোথায় উড়ে যায়। ঐরূপ অজ্ঞানীরা সাধু ভক্তদের প্রতি কোরো থাকেন। যখন দেখেন, মহাবিপদ উপস্থিত, তখন এসে বলেন প্রভু আমায় রক্ষা করুন।

আচ্ছা, উক্ত প্রকৃতির লোকেরা একবারও ভাবে না যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? সারা জীবনটা এ ধরায় এসে করলুম কি? আমি কে, কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় পরে যাব। যখন মরতে হবে তখন একটা সৎ কার্য্য করে মরা ভাল নয় কি? নচেৎ পশুর মত হয়ে মরাটা কি ভাল? পশুরাও খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে, ধর্ম্ম-কর্ম্মের নামও নেই অজ্ঞান হয়ে থাকে। ভগবান মানুষকে যেমন ভাল মন্দ বিচারের শক্তি ও জ্ঞান দিয়েছেন তেমনটি আর কাকেও দেন নি। কিন্তু মানুষ মনুষ্য জীবন ধারণ কোরে জ্ঞানী হয়েও জীবনের উদ্দেশ্য হারাচ্ছেন। দুঃখের বিষয় ঐরূপ ব্যক্তিরা দেখেও শিক্ষা করছেন না, ঠেকেও শিক্ষা করছেন না, এই আমার দুঃখ হয়।

মা কালী যেমন দুষ্টের দমন আর শান্তদের পালন ও অভয় দিচ্ছেন দেখা যায়, তেমনি মনে হয় যে ভগবান বহু স্থানে প্রাণীদের বিনাশ করছেন। তাই আপদ-বিপদ রোগ, শোক হাহাকার, ক্ষতি ইত্যাদি হয়ে বহু প্রাণী নষ্ট

হচ্ছে। তাইত, কারই বা দোষ দি, যে যেমন স্বভাব প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে সে ত তাই কোরবে!

"সুমতি কুমতি তুমি ভগবতী" আবার "যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রসই তোমারি, তবে রসে থেকে রস ভঙ্গ কেন রসেশ্বরী"। তবে ঐ উক্ত প্রবৃত্তি গুলো বা সংস্কার কি প্রকৃতি যাই মানুষের থাকুক না কেন ঐ গুলো ত ভগবানের সৃজন বটে? কিন্তু তেম্নি আবার ভগবান মানুষকে জ্ঞান বিবেক ভাল মন্দ বিচার করতে দিয়েছেন এ ও সত্য।

যাইহোক, প্রভু, যারা অজ্ঞানী হয়ে উক্ত কার্য্যে রত আছেন তাদের তুমি ক্ষমা কোরে রক্ষা কর। তাদের মতি গতি ভাল কোরে দাও, তারা যেন নিজে ভাল হয়ে অপরকে ভাল করেন। তাঁরা যেন ভাই ভাই হয়ে মিলে মিশে থাকে। কোনরূপ দ্বেষ, হিংসা বা ভাবের ঘরে চুরি না করেন। দুষ্ট লোকের স্বভাব গুলি তুমি কেড়ে নাও, আর তোমার মনের মত তাদের গড়ে নাও।

যদি আমরা সকলে মিলে তোমার নাম কোরে ভক্তিভরে ডাকি ও সৎ পথে থেকে জীবন যাপন কোরি। তা' হলে শীঘ্র আমরা বহির রাজ্য ত্যাগ কোরে অন্তর রাজ্যে তোমার সনে বাস কোরবো। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলে গেছেন, "হেলায় শ্রদ্ধায় যদি রসনায়, গোবিন্দ নাম নেয় রে, সে হোক দুরাচার, জগতের সার ভব পারাপার পায় রে"। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি"।

এইবার বুনি একটি শ্রীগুরুর বন্দনা কোরতে করতে আলমবাজারে এসে মটর বাসে চড়ে কলকাতায় যাত্রা করল।

“বন্দে স্ব শক্তি শ্রীগুরু যুগল পদ পঙ্কজম্।
দেহি মে ভক্তি, নির্ম্মল আনন্দম্, সন্তান স্বভাবজম্॥
ন যাচে শক্তিম্, অনিমাদি তব, বিভূত মনন্তম্।
দেহি মে শক্তিম্, পালিতুম্, তব ইচ্ছা শক্তি আদেশম্॥
ন যাচে স্বর্গম্ মুক্তিঞ্চাপি, দেহি মে তব মুক্তি স্বরূপ দর্শনম্।
মহেশ বামে মহেশ-মোহিণী, পুরুষ প্রকৃতি রূপ অনুপমম্” ॥

(সংযোগ)। **ভক্তগণের আগমন**

রামলালদাদার কাছে যাওয়া আসা করবার সময় দেখতুম, তাঁর শিষ্য ও শিষ্যা বহু জন তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে আসতেন। তাঁদের সকলকার নাম জানা নেই। এই কারণ নাম গুলি লিপিবদ্ধ কোরে রাখতে পারিনি—।

কতক নাম জানা আছে :—হরেন বাবু, গোচারণ, প্রভাস শিশির (ও তার মা কনক ও তাঁর কন্যা)—। আর লক্ষ্মী দিদির অনেক শিষ্য ও শিষ্যা আছেন। আর শিবুদাদার ও শিষ্য আছেন।

(সংযোগ)। **দ্বিতীয় অধ্যায়। মহাপুরুষজীর পত্র (পোষ্টকার্ড)**

শ্রীমান কমলকৃষ্ণ, বেলুড়মঠ। 9/2/1929.

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ভালবাসা ভিতরের জিনিষ। উহা লইয়া পরীক্ষা

করা তত ভাল নয়। তিনি যে কৃপাময় এবার তোমাদের কল্যাণ বিধান্ কোরবেনই এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে।

তুমি মাষ্টারমহাশয়ের সঙ্গ করছ, ঠাকুরের নাম করছ, একি খারাপ ভাবে জীবন যাপন হল। বাবা, আসল হচ্ছে তাঁর প্রতি প্রেম ভালবাসা, উহা লাভ হইলে যেখানেই থাক না শান্তি পাইবে। যাহাতে তোমার উহা লাভ হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। নচেৎ ঘরেই থাক আর অরণ্যেই থাক সর্ব্বত্র সমান। তাঁকে ধরে থাকলে জানি কখনও বিফল হইবে না জানিও। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে তাঁর কৃপায় কল্যাণ হইবেই। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী শিবানন্দ।

শ্রীমান কমলকৃষ্ণ, বেলুড়মঠ। 9/6/1929.

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম ও সকল বিগয় অবগত হইলাম। তুমি ঠিক ঠিক ঠাকুরের উপর নির্ভর কোরে যদি থাকতে পার তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার ভার লইবেন। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে উহা বড় শক্ত কথা; তুমি নিজেই তাহা বিচার কোরিলে বুঝিতে পারবে। এ ছাড়া তুমি মাষ্টারমহাশয়ের কাছে যাও তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত, তাঁর উপদেশ মত চলিলে তোমার কল্যাণ হইবেই। তোমাদের কল্যাণের জন্য খুবই প্রার্থনা করি তোমার জন্য ও করিতেছি—

তোমার যাহাতে মঙ্গল হয় ঠাকুর তাহা করুন। তাঁর যেরূপ ইচ্ছা তাহা হইবে!

বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুর বোলতেন, উহা বিধাতাধীন কার্য্য—আমার ও তাই বিশ্বাস। কাকে কখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দিবেন তিনিই জানেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। তবে বিবাহ না কোরে যদি থাকতে পার তা' হলে ভালই হয় একথা আমরা বলিব। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী শিবানন্দ।

শ্রীমান কমলকৃষ্ণ, বেলুড়মঠ। 4/4/1930.

তুমি যাহা লিখিয়াছ—তাহাতে আমার মত নাই জানিবে নিশ্চয় জানিবে।

বিবাহের সম্বন্ধে তোমার যদি অদৃষ্টে থাকে তবে বিবাহ হইবে। ঠাকুর বলিতেন—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। মাষ্টার মহাশয়কে আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানাবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।

শ্রীমান কমলকৃষ্ণ, বেলুড়মঠ। 1/5/1932

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তুমি বিবাহ করিও না। তারপর যেমন আছ থাক। ঠাকুরের নাম ধ্যান ভজন যেমন কোরিতেছ করিবে। তিনি আছেন ভেবো। তোমার যাতে মঙ্গল হইবে তাহা তিনিই জানেন—তুমি কি জানিবে বল।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় এক প্রকার ভাল। রামলাল দাদা কেমন আছেন? তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ভালবাসাদি দিবে ও তুমি আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী শিবানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরনং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

বেলুড়মঠ। 29/10/1932

শ্রীমান কমল,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে, বেশ ত বই ছাপাও না। তোমাকে ত আর টাকা দিতে হচ্ছে না। উপকার নিশ্চয়ই হইবে। তাঁর ইচ্ছায় হয় ত তোমার ও হবে।

ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ।

স্বামী শিবানন্দমহারাজের প্রণাম :—

রামকৃষ্ণান্তরঙ্গায় জ্ঞান ভক্তি স্বরূপিনে।
শিবরূপায় শান্তায় শিবানন্দায়তে নমঃ ॥

(সংযোগ)। স্বামীশিবানন্দ (তারক নাথ ঘোষাল)। মহাপুরুষজীর জন্মস্থান, দমদম বারাসাত। —অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা একাদশী।

পিতার পুত্র না হওয়ায় ৺তারকনাথের উপাসনা মানস করিয়া পুত্র হয় এইজন্য ইহার নাম 'তারক' রাখা হয়। অল্প দিন রেলে চাকরী ও কোরেছিলেন। গৃহ ত্যাগের অল্প দিনের পর তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। পিতা পূর্ব্বে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত কোরতেন এবং সাধক লোক বোলে তিনি স্নেহ করতেন।

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলরার ১৩৪০ সাল। ২০-২-১৯৩৪ অপরাহ্ন ৫-৩৫ মিনিটের সময় মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে দেহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষ ধামে চলে যান। তাঁর বয়স ৮০ বৎসর হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়। বিবাহ ও ভোগাদি

ইং ২৬—১০—১৯৩১—৯ই কর্ত্তিক, রবিবার পঞ্চমী ১৩৩৭ সাল। বৈকালে কমল ও হরেন বাবু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলেন। একটু পরে রামলালদাদা এলেন আর শিষ্যের সঙ্গে ব্যবসার ও বিয়ের কথা বোলছেন।

রামলালদাদা। (হরেন)। বিবাহ দেবে বলছ দাঁড়াও, আগে হাতে লক্ষ্মী আসুক তার পর গৃহ লক্ষ্মী আসবে। আজ

কাল যে বাজার পড়েছে, শেষে বিবাহ-বিভ্রাট না হোয়ে পড়ে। সবুর কর্ত্তে বল—সবুরে মেওয়া ফলে। ইত্যাদি।

(সংযোগ)। অর্থাৎ হরেন বাবু কমলকে একটি ঔষধের ব্যবসা কোরে দেবেন ও বিয়ে দিয়ে দিবেন এই তার ইচ্ছায় ঐ কথা দাদার কাছে পেড়েছিলেন আর দাদা শুনে ঐ কথা গুলি বোলেছিলেন ! দাদার সঙ্গে একদিন কমলের বিয়ের মতামত কি সমস্ত যা জানিয়েছিল তা এই ঃ—

কমল। (রামলালদাদা)। আমার বিয়ের বিষয় এই মত যে, যদি মনোমত ভাল সংস্কার সু লক্ষণ যুক্ত পাই ত বিয়ে কোরব নচেৎ নয়।

রামলালদাদা। ছ্যাখ, ভগবান যদি জুটিয়ে দেন ত অবশ্য হয়ে যাবে। আর কি জান, ঠাকুর বোলতেন, 'কামনা, লালসা থাকতে ভগবানের দিকে এগুতে দেয় না, তাই আগে ও সব সেরে নিতে হয়। কাম ভাবটা একেবারে যায় না, ভগবান দর্শন হলে যায়, যদিও একটু থাকে তাতে হানি হয় না'।

কমল। বেদে আছে ঃ—'ন ধনেন প্রজয়া ত্যাগে নৈ কোনামৃতত্ব মনিশু'। ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। আর স্বামীজির কথায় আছে ; 'মহাত্যাগই ধর্ম্ম' লাভের একমাত্র গুহ্য উপায়। সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণই ঐ কথা বলিয়া গেছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। মনের যথার্থ শান্তি

ইন্দ্রিয় জয়ের দ্বারাই হয়। ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা ত্যাগী জীবেই দীর্ঘজীবি হতে পারে'। আর ঠাকুরের কথায় আছে. "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ"।

রামলালদাদা। ঠিক খাঁটী কথা, তবে কি জান, সংসারীদের পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা কি মুখের কথা? ও সব সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে খাটে।

বুনি। (স্বগত)। 'ধন হি পরমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্। নির্ধনং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্ত মকিঞ্চনৈঃ'॥

তবে ঠাকুর বোলতেন, 'স্বামী বর্ত্তমান থাকতে যে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সে ভগবতী, আর মহাসুন্দরী হলে জানবে তাঁর (ভগবানের) অংশে জন্ম'। সংসারে ২।১টী ছেলে মেয়ে হবার পর সংযমী হয়ে স্বামী স্ত্রীতে ভাই বোনের মত থাকতে বোলতেন।

বুনি পথে আস্তে আস্তে চিন্তা করতে লাগল :—

'মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারনাং'। অর্থাৎ বীর্য্য-ক্ষয়ই মৃত্যু, ধারনেই জীবন। যে লোক কৃতবীর্য্য উর্দ্ধরেতা সে মানব নয় দেবতা। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাতিক উন্নতি সমস্তই ব্রহ্মচর্য্যের উপর নির্ভর করে। ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন কোরলে একটী মেধা নাড়ী জন্মায় উহা হ'তে খুব মনের শক্তি প্রভৃতি হয়, স্বামীজি বলেছেন শুনতে পাওয়া যায়।

বুনি পরে দেখল যে ঠাকুরের কথায় আছে, তিনি বোলছেন, 'গৃহস্থের ঋণ আছে,' দেবঋণ, পিতৃঋণ,

ঋষিঋণ, আবার মাগঋণ ও আছে। ১।২টী ছেলে হওয়া, আর সতী হলে প্রতিপালন করা। সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল কে মন্দ স্ত্রী, কে বিদ্যাশক্তি কে অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তির গুণ—কাম, ক্রোধ, ঘুম, কম। স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা। সকলেরই সেবা বাৎসল্য ভাবে করে। স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়।

আবার পুরুষ মেয়েদের অন্য অন্য খারাপ লক্ষণ আছে, 'টেরা, চোখ-কোঠর' উন-পাজর, বিড়াল চোখ, বাছুর মত গাল'।

আর স্বামীজি এক জায়গায় বোলেছেন যে, 'মনু' বলেছেন, 'কন্যা প্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্ন তঃ'। ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য কোরে বিদ্যা শিক্ষা করতে হবে, তেমনি মেয়েদের ও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করতে পার? তবে আশা আছে, নতুবা পশু জন্ম ঘুচবে না'।

.......মনু মহারাজ বোলেছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু নন্দনে, তত্র দেবতা'। যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা। আর 'নার্য্যস্তু পুজন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'। যে গৃহে নারীর মর্য্যাদা রক্ষিত হয় সে গৃহে দেবতাদির প্রিয় বাস স্থান।

শাস্ত্রে আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকল জগৎসু'। আবার স্বামী-স্ত্রী বিষয় আছে, 'নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমাগতি। নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ে ধর্ম্ম সংগ্রহে'॥ অর্থাৎ জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশোদ্ভূতা। আর সাধ্বী ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা, 'সহধর্ম্মিনী', তন্ত্র শাস্ত্রে শক্তি-পদবাচ্যা।

আবার নারীকে বোলেছেন, 'তপ্তাঙ্গার সম পুমান ঘৃত কুম্ভ সমা নারী'। অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় বর্ণনা কোরেছেন। তুলসীদাস বোলেছেন, 'দিনকা বাঘিনী, রাতকা মোহিনী, পলক্ পলক্ লেহু (রক্ত) চোষে। ছুনিয়ামে কৈ বৌড়াহা (বোকা) হো ফর ঘর ঘর বাঘিনী পোসে'। এই জন্যই সু লক্ষণা, ভাল সংস্কার যুক্ত উভয়ের থাকা দরকার, তা' হলে সংসারে শান্তিতে থাকা যায়। আর উপভোগের দ্বারা কামনার উপশম হয় না, বরং প্রবল হয়। এই জন্যই ঋষিগণ বোলেছেন, 'নিবৃত্তিস্তু মহা ফলম্'। ইন্দ্রিয় সংযম এবং আহার ও বাক্যের ও সংযম থাকা দরকার।

যাহউক, স্বামীজি দীর্ঘজিবীর বিষর যা বোলেছেন তাত ঐ আর দীর্ঘজিবীর বিষয় শ্রীশ্রীমার কথায় আছে :—

শ্রীশ্রীমা। বিশ্বনাথ দর্শনে স্পর্শনে পাপ ক্ষয় তাতেই দীর্ঘজীবি হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায়ে দেয়, প্রসাদ খাওয়ায় বলে দীর্ঘজীবি হয়। প্রসাদ ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই।

"রবিবারে অন্নপ্রাসন হলে একটু গরিব হয়। তা একটু ঘি পুড়িও"

প্রশ্ন। ছেলে বাঁচবেনা ভাত কোরে কি হবে ?

শ্রীশ্রীমা। সেকি ? ধনের অগড়া ভেসে যায়, মানুষের অগড়া থেকে যায়, করবে বৈকি।

একদিন মহিমমহারাজ কথার পিঠে বল্লেন, 'মিন্সেরা সব কুটনো কুটবি, বাটনা বাটবি, পীঁড়েয় দিবি আলপানা। মেয়েরা সব কলেজ যাবে, নলেজ পাবে, করবে সাধের বাবুয়ানা'॥ তিনি ঐ কথা বোলতে একটা জেলেপাড়ার সংয়ের গান মনে পড়ে গেল। গানটা এই :—

বাউল—খেমটা।

(ভাইরে ভাই) কলির মানুষ চেনা ভার।
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার॥
ট্যাকে ঘড়ি হাতে ছড়ি ফুলবাবু সেজে (বাবু) চল্লেন সমাজে।
(আবার) অন্তরেতে সাজছে কত বাবুর যত পরিবার॥
নটীর গলায় মতির মালা মায়ের অন্ন নাই,
স্ত্রীর পরণে ট্যানা ভাই।
আবার বাহিরেতে করছে মজা, নিয়ে বাবু দশ ইয়ার॥
ইংলিশ বুটে ইংলিশ কোটে বিস্কুটে রত, বাবু ইংরাজের মত।
বাবুর পেটে হাত বুলোলে পরে, এ, বি, সি, ডি, পাওয়া ভার॥
(অন্যমতে)। ব্রাহ্মণে খ্রীষ্টান শূদ্রে পড়ে পুরাণ,
ব্রাহ্মণ বৈদ্য যারা হলো হত জ্ঞান।
নাই জাতির বিচার সব একাকার, বিধবার হয় পুত্র তার॥

ও কেউ গুরু মানে না, পিতার কথা শোনে না,
মাকে প্রণাম ও করে না।
(আবার) ভায়ের মুখ দেখে না, শালার ভেড়ো হয় নর ॥
এরা লয় না সাধুর খোঁজ সদা নেশা খোরে ভোজ,
বাপের কন্যা পায় না মুড়কী শালীর মোণ্ডা রোজ ;
(আবার) পুরুৎকে দেয় জেলেকাচা, মদের ইয়ার গরদ তার ॥
এখন যুবক যুবতী চশমা এঁটে, ঘাড় নেড়ে ঝাপসা দেখে।
আই এ, বি এ, তকমা এঁটে, হচ্ছে দাস বিলাসিতার ॥
আগে গুরুজন দেখতো কণে এখন পাত্রী ছ্যাখে পাত্র,
দু'য়ের গুণ গান দেখে শুনে চায় না কোন গোত্র ;
এখন মাথায় আঁচল পাছায় বেঁধে চলে বেড়ায় চারিধার ॥
নারী প্রগতি ছুটছে গতি, গেছে পর্দ্দা প্রথা,
সবাই চায় লুটতে মজা, তাই কয় নাক কথা ;
এখন লজ্জা সরম ভয় গেছে টুটে, সমাজ করে হাহাকার ॥
সদা মনে রোখো, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ',
চলো সোজা পথে, ভুল না সে পুরান প্রথা ;
মানহুঁস হও কানুষ হয়ো না তাই বোলি বারংবার ॥

(মাসিক 'সংসার শ্রী' তে ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে একটা প্রবন্ধ "বিমলার পরিবর্ত্তন" (নক্সা) নামে লিখে বার করা হয়েছিল)।

(সংযোগ)। চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীমার পত্র

জয়রামবাটী। ইং ১৯১৭ সাল।
১৪ই আশ্বিন ১৩২৭ সাল।

কল্যাণ বরেষু—

বাবাজীবন, তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি ভাল আছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদিকা
"তোমার মা"।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন

৪—১০—১৯১৮—১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী পরে অমাবস্যা, ১৩২৫ সাল। কমল ফকির বাবুর সঙ্গে বাগবাজারে ১, মুখার্জ্জির লেন (উদ্বোধন আফিসে) গিয়ে শ্রীমার দর্শন স্পর্শন ও তাঁহার প্রসাদ পায়। ঐ দিন ওখানে শ্রীযুত রামলাল-দাদার দর্শন ও পেয়ে ছিলুম, এর পূর্ব্বে দাদার সঙ্গে বহুবার দেখা হয়।

৮—১০—১৯১৮—২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৩২৫ সাল। বৈকালে কমল, শ্রীম ও গিন্নীমা (শ্রীময়ের স্ত্রী) উদ্বোধনে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন।

কমল। (শ্রীশ্রীমা)। মা, আমায় মন্ত্র দিবেন?
শ্রীশ্রীমা। বাবা, এখন মন্ত্র হবেনা অল্প বয়েস—ইত্যাদি। তারপর শ্রীশ্রীমা কমলকে হাত তুলে একটী রসগোল্লা দিলেন,

কমল তাঁর প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফিরল। এর পরও ৪।৫ বার কমল মায়ের দর্শন পায়।

(সংযোগ)। শ্রীশ্রীমার জন্ম

শ্রীশ্রীমার পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ছিল শ্যামাদেবী। শ্রীশ্রীমার কথায় আছে তিনি বলেছেন :—

শ্রীশ্রীমা। আমার জন্ম ও ঠাকুরের মত।

আমার মা শিউড়ে ঠাকুর দেখতে যান। ফেরবার সময় জয়রাম বাটীর পশ্চিম সীমানায় যাত্রা সিদ্ধিদেবীর মন্দিরের কাছে এক বনের ধারে বকুলতলায় শৌচে যান। কিন্তু শৌচের কিছুই হল না, বোধ করলেন, একটি বায়ু তাঁর উদরে প্রবেশ করল। মা দেখেন যে লাল চেলী পরা একটি ৫।৬ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে, গাছ থেকে নেমে তাঁর গলা জড়িয়ে বলল্, আমি তোমার ঘরে এলুম মা। মা তখন অচৈতন্য হয়ে পড়েন সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে তা থেকেই আমার জন্ম"।

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, ১২৬০ সাল। 22—12—1853 ৩০পল রাত্রি, সিংহ রাশি, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র।

বাঁকুড়া জেলা জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীমার জন্ম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় আছে, তিনি শ্রীশ্রীমাকে বোলতেন, "সরস্বতীর অংশ" আর রামলালদাদার ভগ্নী লক্ষী দিদিকে ঠাকুর বোলতেন, "মা শীতলার অংশ"। ঠাকুর শ্রীশ্রীমার বিষয় আর ও বোলেছেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) কিন্তু এবার বাইরের রূপ

লুকিয়ে অন্তরের রূপ সজ্জা করেছেন। পাছে কোন হতভাগা মন্দ ভেবে অপরাধি হয়। আমার চেয়ে তাঁর শক্তি বেশী"।

স্বামীজি পত্রে এক জায়গায় লিখে জানিয়েছেন যে, 'মা ঠাকুরাণী যে কি বস্তু তা আজ ও বুঝতে পারিনি, এখন ও কেহই বুঝতে পারছে না, ক্রমে পারবে ভায়া! শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তি হীন কেন? শক্তির অপমান সেখানে হয় বলে। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে'।

স্বামীজি আরও বোলেছেন, 'জেন্তো দূর্গা ছেড়ে মাটীর দূর্গা পূজা করতে বসেছে। বিশ্বাস বড় ধন; জেন্তো দূর্গার পূজা দেখাব তবে ছাড়বো, তবে আমার নাম। যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও'।

ঠাকুরের কথায় আছে, "যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মার খবর নিতে হবে। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করলুম। সেই জগতের মাই মা হয়ে এসেছেন"।

শ্রীশ্রীমার প্রণাম:—ওঁ যথাগ্নে দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিথা হি যা। সর্ব্ব বিদ্যা স্বরূপাং তাং সারদা প্রণমাম্যহং॥

জননী সারদা দেবীং রামকৃষ্ণ জগদ গুরু।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিতা প্রণমামি মূহুঃ মূহুর্'র॥
মহাবিদ্যা রূপাং দেবীং পূর্ণ জ্ঞান বতীং সতীম্।
রামকৃষ্ণ প্রিয়াং বন্দে শারদা সারদা মণিম্॥

শ্রীশ্রীমার গায়ত্রী :—ওঁ সারদায়ৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ জগন্মাতৃস্বরূপিণৌ শ্রীসারদা দেব্যৈ নমঃ।

২০—৭—১৯২০—৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী ১৩২৭ সাল। বাগবাজার উদ্বোধনে রাত্রি ১৷৷টার সময় শ্রীশ্রীমা দেহ ত্যাগ কোরে মোক্ষধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যান।

কালীর মূর্ত্তিতে দুর্গা ও ঠাকুর

(সংযোগ)। ২রা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৮ সাল হতে কমল দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে থাকা কালীন দর্শনের কথা রামলাল দাদাকে বলা হয়।

কমল। (রামলালদাদা)। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মা ভবতারিণীর আরতি দর্শন কোরতুম। একদিন মায়ের নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছি। আমার পার্শ্বে সেক্রেটারি কালী বাবু ও বহু লোক দাঁড়িয়ে আছেন। আর মন্দিরের সামনেও বহু লোক ছিল। নকুল (দাদার বড় ছেলে) মায়ের আরতি কোরছিল। হঠাৎ দেখি মা কালীর মূর্ত্তি বদলে দুর্গার মূর্ত্তি, সোনার রং সমস্ত উজ্জ্বল। তারপর দেখলুম, মায়ের কাছে ঠাকুর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখে কালী বাবুকে বোললুম, দেখুন দেখুন, মা কালীর মূর্ত্তিটী দেখা যাচ্ছে না, দুর্গা ও ঠাকুরকে দেখছি, ইত্যাদি। সকলে বোললে, কৈ কৈ দেখিতেছি না ত। ভাবলুম আমার কি চোখের ভুল হল, আচ্ছা সামনে গিয়ে দেখি, এই বোলে মায়ের মন্দিরের সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। তখনও সেই পূর্ব্বের মত দর্শন হল। যতক্ষণ আরতি হচ্ছিল ততক্ষণ ঐ রূপ দর্শন হল। আরতি যেমন শেষ হ'ল পূর্ব্বের মত মা কালী রূপ যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল। ঐ রূপ দর্শন তুই দিন হয়েছিল।

রামলালদাদা। (কমল)। ঠিক দর্শন কোরেছ কোন ভুল নেই। তুমি মাকে ও ঠাকুরকে কত গান শোনাও, তিনি তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন হোয়েছেন। মন্দিরে কত লোক মায়ের আরতি দর্শন কোরছিল, কারুর ভাগ্যে হল না, কেবল তুমিই ঐ রকম দর্শন পেয়েছিলে একি কম সৌভাগ্যের কথা। তিনি (মা ও ঠাকুর) কখন প্রসন্ন হয়ে কি ভাবে কবে কাকে দর্শন দেবেন তা কি কেউ জানতে পারে ?

কমল। (রামলালদাদা)। পাটনায় যখন ছিলুম তখন আশ্রমে রোজ যেতুম। জ্ঞানেশ্বর ও রামানন্দমহারাজ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ভজন গান করে বেশ আনন্দে কাটান হত। একবার মরণাপন্ন টাইফয়েড্ অসুখ হয়। স্বপ্নে দেখি, মা কালী মাথায় হাত দিয়ে অভয় দিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখি, একটি সাদা হাতীর পিটে চড়ে খুব শূন্যে উঠে যাচ্ছি। চন্দ্র সূর্য্য ভেদ করে গিয়ে দেখি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজি বসে আছেন। সে কি মনোরম স্থান সাজান, সুগন্ধ,। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করাতে ঠাকুর হাসলেন ও আশীর্ব্বাদ করে বোললেন, "যা কীর্ত্তন করগে"। তারপর আমি ও জ্ঞানেশ্বর মহারাজ সামনে থেকে কীর্ত্তন কোরতে কোরতে চলেছি ও পাছু পাছু

বহু লোক কীর্ত্তন কোরতে কোরতে আসছেন। এই ঘটনাগুলি একদিন মাষ্টারমহাশয়কে বোলেছিলুম। তিনি শুনে বোললেন, বাঃ বাঃ বেশ ভাল স্বপ্ন দেখেছ. আমি ও একদিন ঐ রকম স্বপ্ন দেখেছিলুম।

(সংযোগ)। পঞ্চম অধ্যায়। অতিথী সেবা

দক্ষিণেশ্বর—১৩ শ্রাবণ. শনিবার, ১৩৪০ সাল।

ঠাকুর ঘরে রামলালদাদা, কমল, হরিবাবু (পর্ব্বত), তুনিবাবু উপস্থিত আছেন।

রামলালদাদা। (কমল)। ভবনাথের বাড়ী ছিল কুঠীঘাটের কাছে। তিনি না আসাতে ঠাকুর আমায় একদিন তার বাড়ী পাঠান।

রামলালদাদা। (ভবনাথ)। কই ঠাকুরের কাছে গেলে না?

ভবনাথ। দাদা, আমি সময় অভাবে যেতে পারিনি—।

রামলালদাদা। ঠাকুর আমায় বোললেন, 'কইরে ভবনাথ এল না' ? আমি বোললুম, আজ্ঞে না, তার কাজ আছে পরে আসবে। তারপর ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হল ঃ—

ঠাকুর। "সে তোকে কি খাওয়ালে" ? আমি বোললুম, কই কিছু ত খেতে দিলে না। ঠাকুর। "সে কি রে" ?

আমি বোললুম। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুর। তুই ওর চেয়ে (অর্থাৎ ভবনাথের চেয়ে) বয়সে বড়, তুই কত করিস আর তোকে খাতির যত্ন কোরে কিছু খেতে দিলে না। আচ্ছা সে আসুক, শালার কি আক্কেল। (সকলের সামনে) আচ্ছা

ও দেশের লোকেরা কি ভদ্রতা জানে না! ও দেশের চলন কি এই? ও দেশে (কামার পুকুর) কিন্তু বাপু লোকের বাড়ী লোক চেনা আর অচেনা হোক্ গেলে বাড়ীতে যা থাকে মুড়ি, বাতাসা, কি মিছিরী তাই একটু দিয়ে জল, পান কি মশলা খেতে দেয়। **অতিথি হচ্ছে নারায়ণ, যদি খালি মুখে কেউ ফিরে যায় ত গৃহীর অমঙ্গল হয়।** কেউ যদি কারুর বাড়ী যায় আর তারা যদি কিছু খেতে না দেয় ত **নিজে চেয়ে অন্ততঃ এক গ্লাস জল ও পান খেয়ে আসা ভাল।**

কমল। (রামলালদাদা)। যীশুর কথায় আছে, 'যে আমার শিষ্যদের তৃষ্ণার সময় এক বাটী জল পান করাবে সে জল আমাকেই পান করানোর সমান হবে'।

রামলালদাদা। ঠাকুর ও বোলেছিলেন, 'আমি শত বৎসর ভক্তদের মুখে আহার কোরবো'।

বুনি। (স্বগত)। যীশুর কথায় আছে, 'যদি কোন স্থানের লোক সমাদর না করে তবে তথা হইতে প্রস্থান কালে তাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ স্বরূপ তোমাদিগের পদতল লগ্ন ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিও'।

রামলালদাদাকে সেবা করা

৭—৬—১৯৩১—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, সপ্তমী ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর রামলালদাদার বাড়ী। সকাল ৭টা কমল ও প্রবোধ উপস্থিত।

প্রবোধ। (রামলালদাদা)। আপনি কি স্বামীজির মৃত্যুর সময় ছিলেন, তাঁর নাক দিয়ে নাকি রক্ত পড়েছিল?

রামলালদাদা। না, সে সময়ে ছিলুম না, তবে মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলুম, তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে কিনা, তাত মনে হচ্ছে না। আমি স্বামীজির মৃত্যুর ৪।৫ দিন আগে একদিন নৌকা করে মঠে যাই। সেদিন নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু হয়েছিল, আমার গায়ে জল লেগে সমস্ত জামা কাপড় ভিজে গিছ্‌ল। সেই অবস্থায় মঠে গিয়ে হাজির হয়ে দেখি, স্বামীজি আমগাছের তলায় চেয়ারে বসে, আর ভক্তরা মেজে বসে কথা শুনছে। স্বামীজি আমায় দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরলেন, আর বোললেন, "গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতেষু"। ভক্তগণকে বোললেন, 'নে নে, সকলে প্রণাম কর'। আমি বোলে উঠলুম, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। তারপর কথাবার্ত্তার পর, স্বামীজির সঙ্গে উপরে গেলুম। তিনি ভক্তদের বোললেন, 'ওরে দাদাকে কাপড় জামা এনে দে। দাদা, তুমি শিগগীর ভিজে কাপড় জামা গুলো খুলে ফেল'। স্বামীজি ভক্তদের বোললেন, 'ওরে দাদার বিছানা করে দে, কই বিছানা হয়েছে'? ভক্তরা বোললেন, হ্যাঁ, হয়েছে। স্বামীজি বোললেন, 'কই কোথায় হয়েছে'? ভক্তরা বোললেন, এই ঘরে হয়েছে। স্বামীজি আমায় বোললেন, 'আচ্ছা দাদা, তুমি আমার সঙ্গে ঘরে এস'। এই বোলে তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে স্প্রীং খাটের বিছানাতে বসালেন। আমি আপত্তি কোরতে লাগলুম, না না, এ কি হয়, ঐ ঘরে বিছানা ত হয়েছে সেই ঘরে যাই। স্বামীজি। 'না না, এই খাটে একবার শোও'। আমি শুতে নারাজ দেখে তিনি আমার বাহু ধরে শুইয়ে দিলেন।

আমি বোললুম, দাদা কি কর কি কর ? স্বামীজি মেজে বসে আমার পা টিপতে সুরু কোরলেন। এই দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম আর স্বামিজী ধমকে বোললেন, 'চুপ কর, চেঁচালে মারবো, মুখ বুজে থাক বোলছি। কিছু দোষ হবে না; ভয় কি দাদা, তুমি আমার জন্য কত কোরেছ, বিছানা করা, মশারী তোলা, তামাক দেওয়া, পাইখানা যাবার জন্য গাড়ুতে জল পর্য্যন্ত দিয়েছ। তোমার ঋণ কি শোধ কোরতে পারবো ? তা, কখনও পারবো না বলে মনে হয়'। এই সব কথা তিনি দুঃখ কোরে আমায় বোললেন।

স্বামীজি ফুল নিয়ে সমাধি

রামলালদাদা। (প্রবোধ)। আর একদিন শুনলুম, স্বামীজি মতি শীলের ঝিলে (১নং কুঠী এখন যেটা Electric ঘর হয়েছে) বক্তৃতা দিতে গেছেন। হাজরা আমায় বোললে, দাদা, চলনা স্বামীজিকে একবার দেখে আসি। আমি বোললুম, বেশ ত চলনা, তা কি নিয়ে যাই, তাঁকে কত লোকে কত কি নিয়ে দেখতে যাচ্ছে আর আমরা খালি হাতে যাব ? হাজরা বোললে, আমাদের আর কি আছে, পয়সা টয়সা নেই কি করি। আমি বোললুম, আচ্ছা বেশ, এই বাগান থেকে বেচে বেচে কিছু ভাল ফুল নিয়ে যাই চল। এই বোলে দু'জনে কাপড়ের খোটে কিছু ফুল নিয়ে যাত্রা কোরলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, স্বামীজি বাগানের মধ্যে চেয়ারে বসে, আর নিচে শিষ্যরা ও বহু সাহেব

মেম ছিল, তিনি তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছেন। আমাদের দূর থেকে দেখে তিনি শিষ্যদেয় বসতে বোলে উঠে এসে আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরলেন। আর হাজরাকে দেখে বোললেন, 'কি ফ্যারেণডো (friend, ঠাকুর যেমন বলতেন) যে'।

রামলালদাদা। এই সব দেখে শুনে, সাহেব মেম ও ভক্তরা অবাক হল। আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা কোরলুম, কেমন আছেন, আপনার বক্তৃতায় বাধা দিলুম না ত, এই সব বোলছি। স্বামীজি বোলে উঠলেন, 'সে কি দাদা, আপনি আমায় 'ছেন ছেন, ন' দিয়ে কথা বোলছেন কেন'? স্বামীজিকে বোললুম, না ভাই, তুমি বিলেত ফেরৎ এসেছ কিনা, তাই সম্মানের জন্য তোমায় আপনি আপনি কোরে কথা কইছি। স্বামীজি বল্লেন, 'না না, আপনি আমার সেই রামলালদাদা, আর আমি সেই নরেন দত্ত—নগণ্য ছোড়া। এই কথা বোলতে বোলতে আমায় টেনে ডান দিকে গলা জড়িয়ে ধরলেন। আর বাঁ দিকে হাজরা মশাইকে নিয়ে কথা কইতে কইতে গঙ্গার ধারে গেলেন। স্বামীজিকে বোললুম, দাদা, তোমার জন্য আর কি আনব, কত লোকে তোমায় ভাল ভাল জিনিষ নিয়ে দেখতে আসছে। আমরা এই দক্ষিণেশ্বর হ'তে ফুল নিয়ে দেখতে এলুম, এই নাও গ্রহণ কর। স্বামীজি ফুল গুলি নিয়ে মাথায় ও বুকে দিয়ে সমাধিস্থ হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলেন। পরে বোললেন, 'দাদা, তুমি আজ এ কি জিনিষ এনেছ, ওর কাছে কি আর বহু মূল্যের দ্রব্য খাটে, আজ মায়ের আশীর্ব্বাদ ফুল পেলুম'।

স্বামীজির কল্পনা

রামলালদাদা। তারপর স্বামীজি বোলতে লাগলেন, 'দাদা, মনে অনেক গুলি সাধ আছে। ইচ্ছে আছে, ঠাকুরের দেশে গিয়ে একটা ঠাকুরের জন্য মস্ত বড় মন্দির করাবো। আর আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা কোরে দোব, তা থেকে প্রচুর আয় হবে, তাতে আপনাদের সংসার সাচ্ছল্য ভাবে চলে যাবে। তারপর একটা মস্ত বড় পুকুর হবে, বেশ উঁচু পাঁচিল দেওয়া থাকবে, সেই পুকুরের জল কেবল ঠাকুর সেবার জন্য ব্যবহার হবে। কেউ তাতে স্নান কোরতে পারবে না, চাবি দেওয়া থাকবে, ঠাকুরের কাজের জন্য খুলে জল আনবে। তারপর বাগানে নানাপ্রকার ফল ফুলের গাছ থাকবে, এই সব করবার ভারি ইচ্ছে আছে'। এই সব স্বামীজির কল্পনা ছিল, কিন্তু ভক্তরা তাঁকে বোললেন, যে আমরা ভাড়া বাড়ীতে রয়েছি, আপনি আগে মঠ প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর ও সব হবে। এই সব নানালোকে বলাতে স্বামীজি তাই আগেই মঠ করালেন। (এই কথা গুলি দাদা ৭—৬—১৯৩১ 'ঠাকুরের সাধনার' কথার পর বলেন)।

(সংযোগ)। ষষ্ঠ অধ্যায়। চাওয়া ও দেওয়া

রামলালদাদার বাড়ী, দক্ষিণেশ্বর। কমল ও দুটী ভক্ত উপস্থিত আছেন। একদিন—রামলালদাদার কাছে দুই জন ভক্ত আসেন। কয়েকটী কথার পর তিনি বললেন :—

রামলালদাদা। (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুর বোলতেন,

ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকা ভাল তিনি যখন যা দরকার বুঝবেন তখন তাই দেবেন। মানুষ ভগবানের কাছে অনেক কিছু চায় কিন্তু তিনি জানেন কাকে কি দিতে হবে। তবে ভগবান কল্পতরু হচ্ছেন, তাঁর সাধন কোরে ঐশ্বর্য্য মানাদি চাইলে সবই লাভ হয়; শেষে বাঘের ভয় থাকে, তারমানে বিষয় নাশ, শোক, রোগ কত কি ও সব বাঘের চেয়ে ও খুব কষ্ট হয়।

বুনি। (স্বগত)। শ্রীশ্রীমায়ের কথায় আছে, "কারুর কাছে কিছু চেও না। বাপের কাছে তো নই স্বামীর কাছেও নয়"। আর ঠাকুরের কথায় আছে, "মাঙ্গনেসে ছোটা হোনে হোতা হ্যায়"।

রামলালদাদা গান ধরলেন, 'আমি আর কিছু ধন চাইনে কেবল ঐ চরণের ভিক্ষারী হে হরি'।

রামলালদাদা (ভক্তদের প্রতি)। ঠাকুর বোলতেন যে, "যাদের টাকা পয়সা আছে তাদের সাধু ভক্তদের দেওয়া খাওয়ান খুব ভাল। তবে সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। কৃপণের ধন চোর ডাকাতে, মোকদ্দামায়, নানা বিষয়ে খরচ হয়ে যায়"।

বুনি। (স্বগত)। শ্রীশ্রীমার কথায় আছে, 'যার ধন আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো"। আর যীশুর কথায় আছে, 'যে মাপে তোমরা মাপিবে সেই মাপে তোমাদিগকে মাপিয়া দেওয়া হইবে। আছে যাহার পাইবেও সেই। নাই যাহার তাহার যাহা আছে সে তাহাও হারাইবে'।

(সংযোগ)। **পূজার দ্রব্য পাওনা**

স্থান :—১৩—১০—১৯৩১—২৬শে আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৩৩৮ সাল। দক্ষিণেশ্বর রামলালদাদার বাড়ী। কমল, সকালে রামলালদাদার কাছে গেল।

কমল। (রামলালদাদা)। মহাপুরুষমহারাজ হরি বাবুর (পর্ব্বত), হাতে দশ টাকা ৺রঘুবীরের সেবার জন্য দিয়েছেন, আপনি কি পেয়েছেন ?

রামলালদাদা (কমল)। হ্যাঁ, কাশীতে যখন আশ্রম তৈয়ারি হয় তখন আমি রাখালমহারাজকে বোলেছিলুম কিছু কোরে দিতে; তাই তিনি শিবানন্দজিকে মাসে ৫৲ টাকা কোরে দিতে বোলেছিলেন।

কমল। (রামলালদাদা)। আপনাদের সংসারে কি কিছু কোরে দেন ?

রামলালদাদা। (কমল)। আরে ভাই, আমাদের আর কে পোছে বলো। মঠে যখন ৺দুর্গা পূজা হতো, কাপড়, চাদর নানা দ্রব্য, সে গুলো স্বামীজি মা ঠাকুরণকে দিতে বোলতেন। কারণ তাঁর নামে সংকল্প কোরে পূজা হতো। মা ঠাকুরণ বোলেছিলেন যে, আমায় দিতে হবে না, রামলাল, শিবুদের দিও। তা স্বামীজি থাকতে সে সব দ্রব্য পেতুম। তারপর অর্দ্ধেক কোরে পেতুম তারপর কম কোরে, এমনি ভাবে এখন একেবারে বন্ধ হয়েছে। আমি শিবানন্দজিকে বোলেছিলুম যে, বরাবর যে দ্রব্য গুলি পেয়ে আসছি সে গুলো কি

এখন পাওয়া যাবে না? তিনি বোল্লেন, দাদা, এখন মঠে অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী, তাদের কাপড় চোপড় দিতে হয় কুলোয় না। আমি শুনে বোলেছিলুম, তবে থাক, সেই অবধি আর কিছু চাইনি। আর কি স্বামীজি আছেন যে আমার জন্য কোরবেন। আহা! তিনি আমায় মতিশীলের ঝিলে ও মঠে কত দুঃখ কোরে বোলেছিলেন, সে সব তো তোমায় পূর্ব্বে বোলেছি।

কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার মুখে সব শুনে রেখেছি। স্বামীজির 'বীরবাণী' লেখা বইয়ের কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল, শুনবেন?

রামলালদাদা। (কমল)। বেশ ত বলনা শুনি।

কমল শোনাল :—"বহুরূপে সন্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলে অনিবার পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান, স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আগার"?

"যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়; হে হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান। হও সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, মুখে মধু অন্তরে গরল তবে পাবে এ সংসারে স্থান।

রামলালদাদা। আহা! চমৎকার কথা বোলেছেন। তাঁর তুলনা আর কি দোব, কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কমল। (রামলালদাদা)। এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

রামলালদাদা।........'সুখ গিয়া পিয়া সঙ্গে তুখো মেরা পাস'।

সপ্তম অধ্যায়। বুনির আশা পূর্ণ

২৯—৩—১৯২১—১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩২৭ সাল। বুনি ভোর বেলায় ৺বলরাম ভবনে গিয়ে গ্যাখে রাখালমহারাজ রাস্তার ধারে যে বারাণ্ডা আছে সেখানে বেড়াচ্ছেন। বুনি তাঁকে প্রণাম করল আর মন্ত্রের ও স্বপ্নের কথা সমস্ত জানাল।

রাখালমহারাজ। (কমল)। বেশ ভাল স্বপ্ন দেখেছিস তা তোর হবে তার জন্য ভাবনা কেন? যা একখানা পাউরুটি কিনে আন দিকিনি। বেশ সকালে বেড়ান হবে, বেড়াতে বেড়াতে যা। বুনি বেড়াতে বেড়াতে শ্যামবাজারের মোড় হতে পাউরুটি কিনে আনলে।

বুনি এসে গ্যাখে রাখালমহারাজ লম্বা হল ঘরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে শুয়ে একটি ভক্তের সঙ্গে কথা কইছেন। রাখালমহারাজ। (কমল)। 'কিরে পাউরুটি এনেছিস'? কমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, এনে সূর্য্যিমহারাজকে দিয়েছি। তারপর, রাখালমহারাজের কাছে বসে মনে মনে ভাবছি যে, মহারাজকে তামাক সেজে দিয়েছি, বাতাস কোরছি, স্ব ইচ্ছায় পা টিপে দিয়েছি। কিন্তু মহারাজ আমায় এপর্য্যন্ত নিজে বোললেন না যে, আমার পা টিপে দে। কি আশ্চর্য্য, যেমনি ভাবা অমনি মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টি কোরে বললেন, 'ওরে পা টা টিপে

দে ত বড় কামড়াচ্ছে। মহারাজ যেই বললেন, বুনি প্রাণ ভরে তাঁর পদ সেবা করতে লাগল।

(সংযোগ)। ২—১০—১৯১৯—১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ৺দুর্গাষ্টমী ১৩২৬ সাল। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলা ১টায় বেলুড় মঠে গেলুম। প্রসাদ খেয়ে উপরে রাখালমহারাজকে দর্শন করতে গেলুম।

রাখালমহারাজ। (কমল)। **ওরে আমায় একটু বাতাস করতো।** কমল বাতাস করতে লাগল। রাখালমহারাজ। **তুই বাতাস কোরছিস তাই বাঁচলুম।** (পরে) তোর বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে, এই খেয়ে এলি, থাক একটু পরে বাতাস কোরিস।

কমল। (রাখালমহারাজ)। আজ্ঞে না মহারাজ, কষ্ট কিছুই নয়।

রাখালমহারাজ। (কমল)। তুই একটু ৫ মিনিট বারণ্ডায় বেড়িয়ে আয় তারপর বাতাস কোরিস। **এক চিলিম তামাক দে তো।**

একটু পরে, একদল মেয়েরা এসে মহারাজের ঘরে প্রবেশ কোরলেন। তামাক নিয়ে যাচ্ছি এমন সময়ে মহাপুরুষজি বোল্লেন, আমায় দাও, মহারাজ এখন কথা কইছেন।

সন্ধ্যার সময় রাখালমহারাজ দুর্গা প্রতিমাকে ধুনা দিলেন ও চামর ঘুরিয়ে মাকে বাতাস কোরতে লাগলেন। পরে ভবানীমহারাজকে (স্বামী বরদানন্দ) বোল্লেন, 'ওরে, কে গো

আমার মা কি এলি'। 'কালভয় বারিণী'। এ সব গান কর'।

১৮—৩—১৯২১---৫ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩২৭ সাল। সকালে বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি রাখালমহারাজ উঠানে আম গাছের তলায় একটা চৌকিতে বসে তামাক খাচ্ছেন। **ঠিক পূর্ব্ব দিনের স্বপ্ন ও কথা সব মিলে গেল।**

বিকালে উপরে গঙ্গা ধারদিকের বারণ্ডায় গিয়ে দেখি তিনি ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। তাঁকে প্রণাম কোরে প্রথমে বসলুম। কয়েকটী ব্রহ্মচারীও বসে ছিলেন। তারপর স্ব ইচ্ছায় তার পদসেবা কোরতে গেলুম।

রাখালমহারাজ। (কমল)। কিরে, তুই যে এসে বড় আমার পা টিপছিস, তুই আমার চেলা হবি না কি জ্ঞান মহারাজের চেলা হবি বল? আমি বোলেছিলুম, না মহারাজ আমি আপনারই চেলা হব। তিনি বোলেছিলেন, 'দেখ ঠিক বোলছিস ত, সত্যি ত মিথ্যা নয়'? তিনি তিনবার ঐ কথা বোলতে আমিও তিনবার বোলেছিলুম, হ্যাঁ মহারাজ আমি আপনারই চেলা হব।

তারপর তিনি কয়েক জন ব্রহ্মচারিকে উদ্দেশ্য কোরে বলেন, **'দ্যাখ দিকিনি এ কেমন আমার পা টিপছে এর আর টাকা পয়সা কিছু লাগবে না'।** ইহার অর্থ যে কি এ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না, সকলকে জানাতে কেহ ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না।

(সংযোগ)। ১২—৩—১৯২১—২৮শে ফাল্গুন, শনিবার, তৃতীয়া ১৩২৭ সাল। বেলুড় মঠে সন্ধ্যার সময় কানাইমহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) তার সঙ্গে স্বামীজির ঘরে গিয়ে **স্বামীজির পায়ের তুই জোড়া খড়ম ও চটি জুতো দর্শন, স্পর্শন করলুম।** ২৪—৩—১৯১৯—১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৩২৭ সাল, দোল পূর্ণিমার দিন স্বামীজির পাতুকা দর্শন, স্পর্শন হল।

রাখালমহারাজের প্রণাম :—নমোঽস্তু ব্রহ্মরূপায় ব্রহ্মানন্দায় নন্দিনে। নমো রাজাধিরাজায় সর্ব্ব কল্যানি কারণে॥

(সংযাগ)। **অষ্টম অধ্যায়। শ্রীরামলালদাদার পত্র**

(পোষ্টকাড্ ও পত্র)।

জয় জগন্নাথ দেব জীউ—তব চরণে শরণাগত দাসোহম।

১৩৩৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন, বৈকাল শুক্রবার।

কল্যাণাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাই কমল,

তুমি আমার অনন্ত শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। আজ কয়েক দিন অতীত হইল তোমার অতুলনীয় স্ব ভক্তি পূর্ণ প্রেরিত কাড্ লিপি খানি প্রাপ্তান্তে তৎ পাঠে সমাচারাদি বিদীতে যারপর নাই পরমাহ্লাদিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছি তাহা জানিবে।

শ্রীশ্রীপ্রভুদেব মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছায় শুভ কর্ম্ম সুন্দর রূপে নিরাপদে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আর জগবন্ধুর শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে একাগ্র চিত্তে নিবেদন করিতেছি যাহাতে তোমাকে কাইক

নিরাময়ে এবং মানুষিক সদানন্দে রাখেন। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো।

'কলিকাল কুঞ্জ কেশরী কালী নাম, জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় মোক্ষ ধাম। এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী। তথাপি তোমা বলে কালের-কামিনী। ইত্যাদি।

জয় রামকৃষ্ণ জীউ, শরণাগত, ভাই জীবনের জয় হোক গো।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ জীউ তব চরণে শরণাগত দাসোহম্।

শুভাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

১৩৩৬ সাল, ১৯ শে, আষাঢ়, বুধবার বৈকাল।

ভাই কমল কৃষ্ণ,

তুমি আমার অনন্ত কল্যানশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ভরসা করি প্রভুদেবের শুভানুগ্রহে তুমি এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টারদাদা জীবন মহোদয়াদি কাইক ইত্যাদিতে নিরাময়েই আছ ও আছেন। ৺মা ভবতারিণী দেবীর ও শ্রীশ্রীজীউর পদারবিন্দে নিরন্তর নিবেদন এই যাহাতে তোমার সতাভিষ্ট প্রদানে চরিতার্থ করেন।

৺দেবালয়ের ও ৺কামারপুকুরস্থ কুশল জানিবে।

কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো।

'চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি চায়। ভূমেতে লিখিয়ে দি নাম পদ দে মা তায়'। ইত্যাদি।

জয় রামকৃষ্ণ শরণম্। ভাই জীবনের জয় হোক গো—ইতি—

নানান কারণে পত্রোত্তর দিতে বহু বিলম্ব বিধায়, কিছু ক্ষুন্ন হইও না ভাই, ক্ষমারূপ তপস্বি নাম দাদা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমো—

শুভাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

১৩৩৬ সাল ২০শে আশ্বিন, রবিবার বৈকাল।

ভাই কমল কৃষ্ণ,

তুমি আমার সংখ্যাতীরিক্ত মঙ্গলাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ৬ মা ভবতারিণী দেবীর এবং ভগবৎ চরণারবিন্দে একাগ্র চিত্তে সর্ব্বক্ষণই নিবেদন এই যাহাতে তোমার প্রতি নিজ অপার কৃপা গুণে সুপ্রসন্ন হইয়া তোমার অভিষ্ট সিদ্ধি প্রদানে চির ধন্য করেন। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো—

'গিরী গণেশ আমার শুভকারি। পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী, চাঁদের উদয় চাঁদ আজ হোল সারি সারি'॥ ইত্যাদি।

জয় রামকৃষ্ণ জীউ—কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো।

জয় মা ভবতারিণী শ্রীমদ্ দক্ষিণ কালীকে, জয় বাবা মহাকাল, জয় প্রভু রামকৃষ্ণদেব জীউ, সবার চরণ রেণু যাচে আকিঞ্চন। কল্যাণাশীর্ব্বাদাভিলাষী---

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়---১৩৩৮ সাল ২রা শ্রাবণ, শনিবার।

ভাই কমল,

তুমি আমার প্রচুর শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। আমার অবস্থা কাইক ও মানুসিক যথা পূর্ব্বং তথা পরং, কোন প্রকারে সুখে রাম এবং দুঃখে রাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে

মাত্র। তাহাবাদ, প্রভু ইচ্ছায় বাটীস্থ একরূপ মঙ্গলই জানিবে। তোমার নিমিত্ত আমার মন প্রায়ই বিচলিত বিশেষ প্রকারে হইয়া থাকে। দুঃখ মোচনের ভার ভগবান যদ্যপি আমার করতলে দিতেন তাহা হইলে ভাই, যেমন পত্র পাঠ বিদায় তেমি, অগ্রে তোমাকে ঠাণ্ডা করিয়া তবে কথা কইতাম, কি করিব দাদা, মনের বেদন মনেই রাখিয়া গুমরে মরণ হইতেছে। ভাই যাহাহউক, ৺ মা ও ৺ প্রভুদেব করেন তো তোমার সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে। মন স্থির পূর্ব্বক তাঁকে জানাও। মাতা মহেশী ও পিতা মহাদেবের কথা এবং অভিমন্যের বিবরণাদি উপদেশ স্মরণাদি মনে পূর্ব্বোক্ত মত আনিও দাদা—।

জয় মা বিমলা দেবী, জগন্নাথ দেব জীউ উভয় শ্রীপদ ধূলি যাচে দীন জন—৺ পুরী, স্বর্গদ্বার, লক্ষ্মী নিকেতন হইতে—১৩৩৭ সাল, ১১ই শ্রাবণ, রবিবার।

মঙ্গলাশীর্ব্বাদকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

ভাই জীবন,

এখানে ৺ জগন্নাথ জীউর একমাত্র দয়াশীর্ব্বাদে শুভ পূণ্য দর্শন, ৺ স্নানযাত্রা এবং দুই রথযাত্রা ও ৺ রথরজ্জু ধারণ, আলিঙ্গনে ভ্রমণ ৺ মহাপ্রসাদ ধারণ, আবার মঠস্থ ভাই শঙ্করানন্দ, অম্বিকানন্দ ও শ্রীযুক্ত কেদার দাদা প্রভৃতি সাক্ষাৎ সম্মিলনে মণি কাঞ্চন যোগ হইয়া উঠিয়া ছিল। কমলমণি,

তুমি যে সেই একই বোল ধরিয়া রহিলে। তোমাকে কতই কথা বলিয়া ছিলাম স্ব বলে পান করিয়া বসিয়া আছ। আহা! যে ভাই কমল, কোথায় উত্তম রূপে প্রস্ফুটিত হইবে তাহা না হইয়া কেবল কুঞ্চিত ভাবাপন্ন, বেশ গড়ে সাঁট সাঁট হও। অতো এলো মেলো হইলে চলিবে কেন। বেশ করে প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক। যখনি বুঝিবে মনে শান্তি নাই তখনি জানিবে তাঁকে ঠিক মত তোমার মোটেই ডাকা হয় না। আবার ডাক, যখন দেখবে মনে, অচঞ্চল ভাবে ডাক পড়িতেছে তখনই শান্তি আসবে।

কিমধিকং মেতৎ হরি হরয়ে নমো।

ভাই জীবনের জয় হোক গো।

জয় জগদম্বে মা শরণাগতোহম্। ১৩৩৯ সাল ১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার প্রাতঃ। শুভাশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ---

পরে, ভাই জীবন, দৈবানুগ্রহে তোমার তথায় নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ পত্র খানি প্রাপ্তে ও তৎ পাঠে বারতাদি অবগত যারপর নাই পরমাহ্লাদিত এবং ভাবনা রহিত হইয়াছি তাহা জানিবে। ৺ মন্দিরের সকলকে আমার যথা বিহিত নমস্কারাদি নিবেদন করিবে। শ্রীশ্রী৺ প্রভুদেবের অভয় শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে নিরন্তর একান্ত চিত্তে নিবেদন যাহাতে ভাই জীবনের ঐহিক

এবং পারত্রিকের পরম কল্যাণ হয়। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো—ভাই জীবনের জয় হোক গো।

জয় জগবন্ধু দেব জীউ, তব চরণে শরণাগতো দাসোহম্। ৬ পুরী, স্বর্গদ্বার, লক্ষ্মী নিকেতন হইতে। ১৩৩৯ সাল ৩১শে বৈশাখ শনিবার প্রাতঃ—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

পরন্তু, ভাই জীবন,........আর ভাই তুমি চলিয়া যাইতে মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল। তাহারপর, দৈবানুগ্রহে ক্রমশঃ সুস্থির হইয়া যাইতে থামিল, বর্ত্তমানে প্রভুদেবের মঙ্গলেচ্ছায় কাইক ও মানসিক ভালই আছি। ভাই, তুমি কদাচ আমার নিমিত্ত ভাবিও না, মন কষ্টে রহিও না। দৈব ইচ্ছায় যখন একত্র সম্মিলন হইবে তখন উভয়তই অনন্তানন্দে উপভোগ করা হইবে। শিবানন্দজি এখানকার ঠিকানায় তোমাকে একখানি কার্ড দিয়াছিলেন। ঐ ঠিকানা খণ্ডন করিয়া ৬ দেবালয়ের ঠিকানা দিয়া পাঠান হইয়াছে। পরম কল্যাণ ভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবোধ চাঁদ দত্ত দাদা জীবন মহোদয়কে আমার প্রচুর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ এবং সাদর সম্ভাষণাদি নিবেদন করিবে। আর তুমি ও আমি যবে উহার বাটীতে যাইলাম তাহার রিপ্লাই যে পাইলাম না। এতোই কি দাদা মণির নিকট দোষী; এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কিনা? আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ ভাই কি, ইত্যাদি। কিমধিকং মেতৎ হরি হরয়ে নমো। গোচারণ নিজ স্থানে পৌঁছিয়াছে।

জয় জগবন্ধুদেব জীউ—শরণাগতোঽহম্। ৺পুরী, স্বর্গদ্বার লক্ষ্মী নিকেতন হইতে। ১৩৩৯ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, বিকাল। স্নেহাশীর্ব্বাদক—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাই কমল,

তুমি আমার প্রচুর শুভাশীর্ব্বাদ লইবে।.......সময়ে সময়ে এক খণ্ড কার্ড যোগে তোমার শুভ বারতাদি পাইতে একান্ত অভিলাষ জানিবে। কলিকাতায় থাকিলে গোচরণের নিকট এবং ৺দক্ষিণেশ্বরে রহিলে হরেনদের কাছে এখানকার খবরাদি পাইবে। ৺চন্দন যাত্রার দিন ৺মন্দিরে দর্শনান্তে চন্দন সরোবরে অতি সুন্দর দর্শন হইয়াছিল। নূতন মঠে একদিন লইয়া গিয়াছিল। পুনঃ আগামী পূর্ণিমায় যাইতে হইবে, ঐ দিন প্রভুদেব নিজাসনে বসিবেন। ঔষধাদি বর্ত্তমানে কিছুই আর সেবন করি না এখন 'ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্য নারায়ণ হরি'—অর্থাৎ ৺মহাপ্রসাদ ও প্রভু-জীউর তুলসী পত্র তাহাতেই করুণাময়ের কৃপা করুণায় বেশ কাটিয়া যাইতেছে। ভাই, সর্ব্বদা একান্ত ভাবে প্রার্থনা কোরি ভাই জীবনের তোমার সর্ব্বত্র কল্যাণ করুন। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো—ভাই জীবনের জয় হোক গো।

জয় মা কালী কৈবল্য-দায়িণী—মা তোমার শরণাগত সন্তানম্। ১৩৩৯ সাল, ৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

কল্যাণাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাই কমল,

তুমি আমার ৺শুভ বিজয়া দশমীর উপলক্ষে প্রচুর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। সুবিধা সুযোগ হইলে বারেক আসিও ভাই। ৺মা ভবতারিণী দেবীর ও প্রভুদেবের অভয় শ্রীশ্রীপাদপদ্মে একান্ত চিত্তে নিরন্তন নিবেদন যাহাতে ভাই জীবনের সর্ব্বত্র পরম কল্যাণ হয়। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো—

'কারে ভাঙ্গ কারে গড় মা ঐ তোমার কাজ। কারো মুণ্ডে ছত্র দণ্ড, আবার কারো মুণ্ডে বাজ॥ ইত্যাদি। জয় রামকৃষ্ণ দেব জীউ তব চরণে শরণাগত দাসোহম্। ইতি—ভাই জীবনের জয় হোক গো।

জয় মা ভবতারিণী শ্রীমদ্ দক্ষিণ কালীকে জয় বাবা মহাকাল, জয় প্রভু রামকৃষ্ণদেব—সবার চরণ ধুলি যাচে দীন জন। ১৩৪০ সাল, ২৮শে ভাদ্র, বুধবার, বৈকাল।

শুভাশীর্ব্বাদকাঙ্ক্ষী—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাই কমল,

তুমি আমার অনন্ত মঙ্গলাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। তোমার স্ব ভক্তি পূর্ণ প্রেরিত কাড্ লিপিখানি (পঠেশ্বরী ঠাকুর গাউন্ দিনাজপুর, রাণীগঞ্জ কাছারী, রাণী রাসমণির জমিদারী) প্রাপ্ত ও তথায় দৈবানুগ্রহে নিরাপদে পৌছান এবং অন্যান্য সমাচার দিতে যারপর নাই পরমানন্দ ও নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে জানিবে। তুমি ও পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিপদ সেক্রেটারী মহোদয় প্রভৃতি শারীরিক ইত্যাদিতে কেমন আছ ও আছেন

তৎ সম্বাদি সময়ানুসারে জানাইয়া পরমাহ্লাদিত ভাবনা রহিত করাইবে। উক্ত মহাশয়কে আমার যথোপযুক্ত নমস্কারাদি নিবেদন করিও।

৺মা পঠেশ্বরী দেবীকে শুভ পূণ্য জনক দর্শন ও তাঁর গুণ গান তাঁহাকে শুনাইতেছ, তুমিই ধন্য হইতেছ। কিমধিকং মেতৎ। হরি হরয়ে নমো—

'যখন যে রূপে কালী রাখিবে আমারে, সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে'। ইত্যাদি। ঐ গানটী সর্ব্বদা স্মরণ এবং মননে রাখিও ভাই। ইতি—ভাই জীবনের জয় হোক গো।

(সংযোগ)। রামলালদাদার অসুখাদি

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকার সময় দেখতুম রামলালদাদার একটু মাথার যন্ত্রণা, বায়ু বৃদ্ধি ও হাঁফ্ হতো। তিনি হোমিও-প্যাথিক ঔষধ খেতেন। তারপর, ৬ই চৈত্র, একাদশী ১৩৩৮ সালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমায় নিয়ে ৺পুরীধামে যাত্রা করেন। লক্ষ্মী নিকেতনে গিয়ে থাকতে কিছু ভাল ছিলেন।

মন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীকালিপদ চৌধুরী তিনি পত্র দেন চলে আসতে। ৺পুরী হতে আসবার সময় রামলালদাদা আমায় বোলেছিলেন, আহা! 'তুমি আমার সঙ্গে রাত দিন থেকে কত সেবা কোরেছ তা ভুলব না। তুমি যদি সৎ ব্রাহ্মন ভেবে বা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভেবে সেবা ভক্তি যা কোরেছ তা একদিন না একদিন সু ফল পাবেই পাবে যেন'।

৯ই বৈশাখ ১৩৩৯ সালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ৺পুরী থেকে

এলুম। পরে, তিনিও ৺পুরী হতে দক্ষিণেশ্বর তাঁর বাড়ীতে আসেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির হতে কল্লু বাবুর বাগান বাড়ীতে গিয়ে কয়েক মাস থাকি। আর রামলালদাদার বাড়ী গিয়ে তাঁর সেবাদি কোরে আসি ক্রমে ক্রমে তাঁর অসুখ বৃদ্ধি হতে লাগল্।

একদিন—রামলালদাদা বিছানা থেকে উঠে বসে বল্লেন,

রামলালদাদা। (কমল)। একদিন ঠাকুরকে শম্ভু মল্লিকের বাগানে একজন দেখতে আসেন। তিনি হিপনোটিজম্ অর্থাৎ মন্ত্রের গুণে লোককে অজ্ঞান কোরে অনেক কিছু জানতেন। ঠাকুর তাকে বোলেছিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি ত অনেককে কর, কই আমায় একবার ঐ রকম কোরে করনা"। তিনি কি কোরে কোরেছিলেন দেখবে, এই ছাখ। রামলালদাদা দুই হাত তুলে বুনির মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত স্পর্শ না কোরে 'পাস্ বা ঝাড়তে শুরু করলেন। আর তিনি আস্তে আস্তে মনে কি বোলতে আরম্ভ কোরলেন।

বুনি। (স্বগত)। দাদা কি আমার ভেতর মন্ত্র বোলে শক্তি সঞ্চার কোরে দিচ্ছেন না আশীর্ব্বাদ কোরছেন?

রামলালদাদা। (কমল)। ঠাকুরকে তিনি অজ্ঞান কোরতে পারলেন না। তিনি ঠাকুরকে বল্লেন, কই মশাই, হচ্ছে কৈ? কখন ত অকৃত কার্য্য হইনি। ঠাকুর বোলেছিলেন, 'কে জানে বাপু, মার ইচ্ছা নয় যে আমি অজ্ঞান হই'।

১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১লা মাঘ পর্য্যন্ত

রামলালদাদার কাছে রোজ যাতায়াত কোরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা, সেবাদি কোরে কাটাতুম।

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল। সকালে কলু বাবুর বাড়ী থেকে রামলালদাদার বাড়ী গিয়ে দেখি তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর পায়ে মোজা পরিয়ে দিলুম। গলার স্বর পূর্ব্ব অপেক্ষা ভাঙ্গা আওয়াজ। তাঁর সঙ্গে কিছু কথা হবার পর; নকুলের বউকে প্রসাদ দিতে বল্লেন। প্রসাদ খেয়ে প্রণাম কোরে বেলা ১১টার সময় কলু বাবুর মন্দির বাড়ীতে চলে আসি।

বেলা প্রায় ২টা হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল। একটু পরে, সুশীলবাবু এসে বল্লেন, দাদার শ্বাসটান হচ্ছে দেখে এলুম, শীঘ্র যাও। এইকথা শুনেই চলে গেলুম, গিয়ে দেখি সত্যি তাই। বাড়ীর সকলে তাঁকে ঘিরে বসে নাম শোনাচ্ছেন মেজদিদি (রাহু) বোললেন, বাবার শ্বাস টান যেই আরম্ভ হল, আমরা ফুল ও চন্দনের গন্ধ খুব পেলুম। মনে হল ঠাকুর এসেছেন বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। হরিহর, প্রভাস এরা অক্সিজেন গ্যাস আন্‌লে, কিছুই হল না।

রামলালদাদার পায়ের তলায় বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে ঠাকুরের নাম কোরতে লাগলুম। তারপর ঐ রকম দাদার কষ্ট হচ্ছে দেখে কলু বাবুর মন্দিরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চলে আসি। গোড়া থেকে তাঁর বিষয় পূর্ব্বস্মৃতি, কথা উদ্দীপন সমস্ত চিন্তাদি কোরতে কোরতে দিন কাটতে লাগল। কিছু দিন পরে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ীতে চলে গেলুম।

৯—১১—১৯৩১—২৩শে কার্ত্তিক, কালী পূজা, সোমবার ১৩৩৮ সাল। সকালে দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ী গিয়ে দেখি তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন।

কমল। (রামলালদাদা)। ঠাকুর কি বারে চুল কাটতেন?

রামলালদাদা। সোমবার।

কমল। (রামলালদাদা)। সোমবার, আমার জন্ম বার বোলে শনি ও মঙ্গলবারে কামাই। দাদা, আপনার জন্ম দিন কি বারে?

রামলালদাদা। (কমল)। চৈত্র মাসের শেষ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, বুধবার দিন। ওটা বৈশাখে গিয়ে পড়েছে, মাসের শেষ কিনা। তুমি রবিবারে কি মঙ্গলবারে দাড়ি কামিও।

রামলালদাদার বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর ১১ মাস। রামলালদাদার জ্যেষ্ঠ কন্যা কৃষ্ণময়ী দেবী ও মধ্যম কন্যা রাধারাণী। তিন পুত্র নকুল, জগদীশ, ও হরিহর বর্ত্তমান। শিবু দাদার একটী পুত্র, পার্ব্বতীচরণ, বর্ত্তমান।

শিবু দাদার শরীর ত্যাগের দিন উপস্থিত ছিলুম। তিনি শেষ দিনে বোলেছিলেন, 'আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে'।

রামলালদাদার শরীর ত্যাগের কয়েক দিন আগে শিবু দাদার শরীর ত্যাগ হয়।

শিবু দাদার জন্ম দিন:—১৮ই চৈত্র, ৮ দোল পূর্ণিমার দিন, ১২৭২ সাল।

নবম অধ্যায়। শ্রীম ও কমল

১২—৬—১৯১৭—২৯শে, জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, অষ্টমী ১৩২৪ সাল। কলকাতায় ৫৪ এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পঞ্চানন ঘোষ লেনের মোড়ের উপর যে চার তোলা সাদা স্কুল বাড়ী ছিল, সেখানে বুনি সকালে গিয়ে শ্রীমাষ্টারমহাশয়ের (শ্রীম, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লিখেছেন) প্রথম দর্শন লাভ করে।

শ্রীম। (কমল)। কোথা থেকে আসছ? কমল। আজ্ঞে বাড়ী থেকে। শ্রীম। বাড়ী কোথায়? কমল। এই কাছেই। শ্রীম। কি কর? কমল। মতিশীলের ফ্রী স্কুলে পড়ি। শ্রীম। তোমার বাড়ীতে কে আছেন? কমল। আজ্ঞে সকলেই আছেন। শ্রীম। তোমার এখানে কি দরকার? কমল। আপনাকে দর্শন কোরতে এলুম। জীবনে বহু সাধু সঙ্গ ও ভাল ভাল বই পড়ে কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না, আমার কি হবে বলুন। শ্রীম। তুমি এই বয়সে এমন কি কোরেছ, কি বই পড়ছ ব'ল? কমল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর পূজো হত, কীর্ত্তন হত, আমি শুনতুম ও গান গাইতুম। কি কোরে ভগবান পাব চিন্তা কোরতুম, আর ছাতের উপর বসে কেঁদে ভগবানকে ডাকতুম। আর ধ্রুব, প্রহ্লাদের বই ও অন্যান্য বই পড়তুম।

একদিন পাগল হরনাথঠাকুরকে বোলেছিলুম, আপনার আশ্রমে গিয়ে থাকব আমায় নিয়ে যাবেন কি? তারপর ৺যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বোসের বাড়ী বাগবাজার বোসপাড়ায় একটি

সাধুকে (শ্রীঠাকুর দাস বাবা) দর্শন কোরি ; তাঁর মাথায় খুব লম্বা জটা ছিল। তিনি চারি পাশে আগুন জ্বেলে মধ্যে বসে ২।৩ ঘণ্টা জপ কোরতেন। আমি তাঁকে-ও বোলেছিলুম, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন ? তিনি শুনে হাসলেন ও আমার হাতে একটু ভস্ম দিলেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে যাব ঠিক কোরেছিলুম, এমন সময়ে মুন্নিবাবু (ঠাকুরদাস বাবার শিষ্য) আমায় জিজ্ঞাসা কোরলেন, তোমার বাড়ী কোথা ? তোমার বাপ মায়ের যদি মত হয় ত নিয়ে যেতে পারি। আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ী চল, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা কোরব ইত্যাদি। আমি সব সত্যি কথা বোলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলুম। বাবা তাঁকে দেখে বোলে উঠলেন, আরে মুন্নি যে কবে সাধু হলে ইত্যাদি। উনি বাবার বন্ধু ছিলেন, যাইহোক বাড়ীতে আমায় কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। তারপর আরও অন্যান্য সাধুর দর্শন পেয়েছি ও সাধুদের জীবন চরিত পড়েছি। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে প্রাণে খুব শান্তি পেলুম আর ভাবলুম, যে যেমন চায় ঠাকুর ঠিক তেমনটি বোলে গেছেন, সকলকারই মনের কথা রয়েছে। তাই জেনে আপনার কাছে ছুটে এসেছি এখন আমার কি উপায় হবে বোলে দিন। শ্রীম। (কমল)। তোমরা ক' ভাই ? কমল। আজ্ঞে পাঁচ ভাই। শ্রীম। তুমি কি বড় ? কমল। না মধ্যম। শ্রীম। তোমার নাম কি, বাবা কি করেন ? কমল। শ্রীকমল কৃষ্ণ মিত্র, বাবা কাজ

করেন। শ্রীম। 'ছাখ তোমার বাপ মা ভাইরা সব রয়েছেন এখন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেও না। এখানে মধ্যে মধ্যে আসবে আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কোরবে, তিনিই তোমার প্রাণে শান্তি আনন্দ দেবেন। ঠাকুর তোমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তোমায় তিনি কত ভালবাসেন, তোমার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা আছে জেন। আচ্ছা তুমি এখন এস আমার একটু কাজ আছে'। কমল তাঁর চরণ স্পর্শ কোরতে গেল তিনি বোললেন, 'থাক থাক মনে মনে করো'।

(সংযোগ)। একদিন শ্রীম, সন্ধ্যার সময় তাঁর ঘরে বোসে আছেন। দেখলুম, তিনি ঠাকুরের ছবি ও অন্যান্য দেব দেবীর ছবিতে ধূপ জ্বেলে দেখালেন ও সন্ধ্যা কোরতে বসলেন।

প্রথমে হাত তালি দিয়ে (ডান হাতের চেটোর উপর বাঁ হাতের চেটো, বাঁ হাতের চেটোর উপর ডান হাতের চেটো) এই রকম ভাবে কয়েক বার উল্টে পাল্টে আওয়াজ কোরে, মুখে হরি হরি হরিবোল—তিনবার, হরিময়, হরিবোল ওঁ তৎসৎ বোললেন। তারপর, শ্রীগুরু শ্রীগুরু, জয় গুরুদেবা গুরুদেব বোলে, জপ কোরে, মেরুদণ্ড সোজা কোরে বোসে ধ্যান কোরলেন।

ঠাকুর মা কালীর কাছে যে রকম প্রার্থনা কোরতেন, (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মধ্যে আছে) সেই গুলো শ্রীম, সুর কোরে টান টুন দিয়ে বোলতে সুরু কোরলেন :—

"মা ০ ০ আমি তোমার শরণা ০ ০ ০ ০ ০ গত, শরণাগত। দেহ সু ০ ০ ০ ০ খ চা ০ ০ ই না ০ মা ০ ০। লোক মান্ত ০ ০ ০ ০ ০ চাই না, অণিমাদি ০ ০ অষ্ট সিদ্ধি চা ০ ০ ই না, কেবল এই কোরো ০ ০ ০ যেন তোমার শ্রী পা ০ ০ দ পদ্মে ০ ০ শুদ্ধ ভক্তি হয়, অমলা ০ ০ ০ অহৈ ০ ০ তুকি ভক্তি। আর যেন, মা ০ ০ ০ তোমার ভুব ০ ০ ন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না ০ ০ হ ০ ই, তোমার মায়ার সংসারে কামিনী কা ০ ০ ঞ্চনের উপর ভালবা ০ সা ০ ০ যেন কখন না ০ ০ ০ হয়। মা ০ ০ তোমা ব ০ ই আমা ০ ০ ০০০ র আর কেউ নাই। আমি ভজন হী ০ ০ ০ ন, সাধ ০ ০ ন হীন, জ্ঞান হীন, ভক্তি হীন, ক্রিয়া হীন, কৃপা কোরে ০ ০ ০ তোমার শ্রীপা ০ ০ দ পদ্মে ০ ০ আমায় ভ ০ ০ ক্তি দাও।

ভক্তগণের আগমন

ইং ১৯১৭ সাল হ'তে শ্রীময়ের কাছে যে সব ভক্তগণকে আসতে দেখতুম তাদের মধ্যে কতক নাম এই :—

জিতেনবাবু (উকিল), ললিত (উকিল), অমৃত, ললিত (ভাটপাড়ার), ললিত (গায়ক), বীরেন (এটর্ণী), দুর্গাপদ গৌরী, ফকির ও কার্ত্তিক (মাষ্টার), হরেন। প্রভৃতি আরও ভক্তগণ আসতেন তাদের নাম জানা নেই। ক্রমে ক্রমে সুখলাল, কার্ত্তিক (ডাক্তার), বিনয়, জিতেন, সাতু, অনঙ্গ, মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ, সুবোধ মহারাজ, মনোরঞ্জন, বলাই, অমূল্য, হিমাংশু (স্নুনে), সীতাপতি মহারাজ, গদাধর,

সুখেন্দু, পূর্ণেন্দু, গুহমহাশয়, সতিনাথ, রাজেন; সুধীর, কেষ্ট, প্রভৃতি আরও বহু ভক্তগন আসতেন তাঁদের নাম জানা নেই।

সাধু দর্শন করান

(সংযোগ)। মাষ্টারমহাশয়ের সাদা স্কুল বাড়ী। গরম কাল, প্রায় ৪টা। একদিন—মষ্টারমহাশয়ের কাছে একটি বুড় ভক্ত লোক, গলায় তুলসীর মালা আছে তিনি এলেন।

মাষ্টারমহাশয়। (কমল)। এঁকে (বুড় ভক্ত লোকটাকে) উদ্বোধন, বলরাম ভবনে সঙ্গে নিয়ে যাও সব সাধু দর্শন কোরিয়ে আন। বুনি তাই করলে।

বুড় ভক্ত। (শরৎমহারাজ)। মাষ্টারমহাশয় পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের দর্শন করতে এলুম। শরৎমহারাজ। বেশ বেশ, খুব ভাল। শরৎমহারাজ। (কমল)। এঁকে উপরে নিয়ে যাও, হরিমহারাজ আছেন। বুড় ভক্ত। (হরিমহারাজ)। আমার কি হবে ঠাকুর কি আমায় কৃপা করবেন? (কান্না)।

হরিমহারাজ। (বুড় ভক্ত)। সে কি, কৃপা কোরবেন বৈকি, তিনি যে অতি আপনার জন। ঠাকুর বোলতেন, চাঁদা মামা সকলের মামা'। তাঁকে (ঠাকুর) আন্তরিক ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন, নিশ্চয়ই দেখা দেবেন, কোন সন্দেহ নেই—।

উভয়ে প্রসাদ গ্রহণ কোরে ৺বলরাম ভবনে যাওয়া হল। বাবুরাম মহারাজের অসুখ। তিনি উপরের বড় লম্বা হল ঘরে শুয়ে ছিলেন। আমরা যেতে তিনি উঠে বোসলেন।

প্রণামান্তে কমল। (বাবুরামমহারাজ)। এঁকে (বুড় ভক্ত) মাষ্টারমহাশয় পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের দর্শন কোরতে এসেছেন। আমরা উদ্বোধনে গিয়েছিলুম।

বাবুরামমহারাজ। বেশ কোরেছ। বুড় ভক্ত। (বাবুরামমহারাজ)। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ঠাকুরের দেখা পাই—(কান্না)।

বাবুরামমহারাজ যেখানটা শুয়ে ছিলেন সেখান থেকে তার ১০।১২ হাত দূরে একটি বড় অর্‌গ্যান বাজনা রাখা ছিল। তার তলায় প্রসাদ, লুচি, পায়স, সন্দেশ এইসব ছিল। বাবুরামমহারাজ দুটো হাত ভূমে রেখে ঘেষ্টে ঘেষ্টে ঐ অর্‌গ্যান বাজনার তলা থেকে প্রসাদ আনতে যেই যাচ্ছিলেন, অমনি বুনি বোললে, মহারাজ, আমি আনছি, আপনি কষ্ট কোরবেন না। বাবুরাম মহারাজ বল্লেন, 'না না, তুমি বস'। তিনি কষ্ট কোরে এনে আমাদের হাতে প্রসাদ দিলেন। আমরা প্রসাদ খেয়ে তাঁকে প্রণাম কোরে চলে আসি। বুনি পথে চিন্তা কোরতে লাগল, বাবুরামমহারাজের কি যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা তা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না। তাঁর স্নেহ, যত্ন, বেলুড় মঠে অনেকেই পেয়েছেন, সবাই জানেন—।

বাবুরামমহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) হুগলী জেলার অন্তর্গত চাঁপা ডাঙ্গা লাইনের শেষভাগে আঁটপুর গ্রামে ঘোষ বংশে জন্ম হয়।—অগ্রহায়ণ, শুক্লানবমী—।

ইহাদের বাড়ীর সম্মুখের মিত্ররা ইহার মাতামহ কুল। কৃষ্ণ মোহন মিত্রের স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও অতিথিশালার

পর্য্যাবেক্ষণের ভার বাবুরামমহারাজের মাতামহের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তুলসীরাম, শান্তিরাম, বাবুরামমহারাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হন।

ডাক্তার বিপিন চন্দ্র ঘোষ বাবুরামমহারাজের খুড়তুতো ভাই ও ঠাকুরের ভক্ত। বাবুরামমহারাজের ভগ্নীপতি ৺বলরামবসু ছিলেন। বাগবাজারে সুবিখ্যাত ৺কৃষ্ণ বসুর বংশে ইহার জন্ম। কটক ও বৃন্দাবনে, বহু স্থানে ইহাদের জমিদারী আছে। 'মাহেশের রথ' ইহাদেরই হইয়া থাকে। বলরাম বাবুর গুরু বা পুরোহিত বংশ রামদয়াল চক্রবর্ত্তী বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকতেন। ইহারা তিন সহোদর ঠাকুরের কাছে কৃপা পাইয়া ছিলেন। স্বামীজির কাছে এসে দেখা কোরতেন। দয়াল বাবু বলেই ডাকা হয়। (মহিমমহারাজের লেখান বইতে ঐ গুলি দেওয়া আছে)।

শ্রীময়ের শিক্ষা দেওয়া

১২-৬-১৯১৭ সাল থেকে বুনি শ্রীময়ের কাছে যাতায়াত করত।

ইংরাজি ১৯১৯ সাল এপ্রেল মাসে, তিনি তাঁর স্কুলে ফ্রী ভর্ত্তি কোরে বই, কাগজ, পয়সা ও প্রত্যহ দু'বেলা করে খেতে দিতেন। নিজে দু'বেলা পড়াতেন আর বোলতেন, 'তুমি যাতে ডবল প্রমোশন পাও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও এই আমার ইচ্ছা। তোমার উপর ঠাকুরের কৃপা আছে তাই তোমায় এত করছি' (ইত্যাদি)। তাঁর পরনের কাপড় জামা পরতেও দিয়েছেন পরতে আপত্তি করাতে তিনি বোলে ছিলেন,

'আমি দিচ্ছি তুমি পর, কোন দোষ হবেনা। আমার কথা শুনতে হয়'। তারপর তিনি বহু বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন যথা, কি কোরে ঠাকুরের পূজার সমস্ত কর্ম্ম কোরতে হয়, কি কোরে ছেলেদের পড়াতে ও শিক্ষা দিতে হয়। কি কোরে গান কোরতে হয় ইত্যাদি।

একদিন—মাথার টেরি কাটা (সিঁতে) দেখে তিনি বোললেন, আবার বাঁকা সিঁতে হয়েছে, ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না পুছে ফেল পুছে ফেল। পুছে ফেলাতে আবার খাঁজ বেরুল, তিনি দেখে স্ব হস্তে পুছে দিলেন।

একদিন—তিনি বোললেন, 'ছাখ ঠাকুর ঘরে যখন যাবে খুব দীন হীন বেশে, কোন রূপ সাজ সজ্জা থাকবে না। তারপর তুমি টেরি কাট, এসেন্স মাখ সে আলাদা কথা। **যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, যে দিন যেমন, সে দিন তেমন এইরূপ কর্ত্তে হয় জেনে রাখ'।**

(সংযোগ)। 18—6—1919—৩রা আষাঢ়, বুধবার, পঞ্চমী ১৩২৬ সাল। মাষ্টার মহাশয়ের ঠকুর বাড়ীতে, ঠাকুরের পূজোর সমস্ত কাজ যোগাড় কোরে রাখতে মষ্টারমহাশয় বল্লেন। কমল ভাই রোজ করে রাখে, আর পুরুৎ এসে পুজা কোরে যান। **ঠাকুরের পাদুকায় (চটি জুতা) তুলসী চন্দন, ফুল দিয়ে পুজো করার সুবিধা ৮ই আষাঢ় পর্য্যন্ত পেয়েছিলুম।**

একদিন—মাষ্টারমহাশয় ঠাকুর ঘরে একটা বাক্স খুলে ঠাকুরের গায়ের জামা দেখিয়ে বোল্লেন, 'ঠাকুর আমায় পরতে

দিয়ে ছিলেন, আমি যত্ন কোরে রেখে দিয়েছি'। তারপর তিনি স্বামীজির হাতের লেখা পোষ্টকাড্ দেখালেন। ইংরাজি লেখা, খুব ভাল হাতের লেখা দেখলুম।

একদিন—সকালে মাষ্টারমহাশয়ের লাল স্কুল বাড়ীর ('Morton Institution' 50, Amherst Street) চার তোলা ছাতের টিনের ঘরে বসে আছি। এমন সময়ে তিনি ও সীতাপতি মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ) এসে আমার একটি ছবি (চেহারা) ছিল দেখে সীতাপতি মহারাজকে বোল্লেন, 'আহা! নারায়ণ মুর্ত্তি, এই মহাত্মার বই চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সীতাপতি মহারাজ বোল্লেন, হ্যাঁ, পাটনা আশ্রমে রয়েছে দেখে এসেছি।

মাষ্টারমহাশয়ের স্কুলে আমাকে কয়েক মাসের জন্য তিনি মাষ্টার পদে নিযুক্ত করেন। যখন ক্লাসে গিয়ে পড়াতুম তখন মাষ্টারমহাশয় বাহিরে বেড়াতে বেড়াতে শুনতেন, আর মুচ্‌কে হাসতেন, খুসী হতেন।

মাষ্টারমহাশয়, ঠাকুর ও স্বামীজির গাওয়া গান গুলো গেয়ে শুনিয়ে বোলতেন, 'তুমি শুনে রাখ, পরে আমায় শোনাতে হবে'। তাঁকে যখন গান গুলো শোনাতুম, তিনি গান শুনে আনন্দ প্রকাশ কোরে বোলতেন, 'আহা! কি গান, এক গানে মাৎ। মাষ্টারমহাশয় ও বহু ভক্তগণকে গান শুনিয়েছি, এ বিষয় অনেকেই জানেন।

একদিন—সকালে দোতলার ঘরে বসে আছি। মাষ্টার

মহাশয় চারতলা থেকে নেবে এসে আমার পার্শ্বে বোসলেন, আর বোল্লেন, 'আহা! তোমার কি গান ঠাকুর বোলতেন; নির্জ্জনে, গোপনে 'জাগ মা কুল কুণ্ডলিনী' গান গেয়ে শোনাতে। গানে ভগবান দর্শন হয়। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এঁরা গানে সিদ্ধ হয়ে ভগবান দর্শন কোরেছেন। মাষ্টার মহাশয় বুনির মুখের দিকে চেয়ে কথা গুলো এমন ভাবে বোললেন, যেন মনে হল আশীর্ব্বাদ কোরছেন।

মাষ্টারমহাশয়ের স্কুল বাড়ীতে "আরাধনা সঙ্গীতালয়" নামক গানের স্কুল খুলে হারমোনিয়ম যোগে ধর্ম্ম সঙ্গীত ভজনাদি শিক্ষা দিতুম ও বাড়ীতে গিয়ে গানের Tutiony কোরতুম। একদিন শ্রীম, বোল্লেন, 'তুমি স্কুল ঘরে গানের ক্লাস কোরে কিছু উপায় কোরছ তা কিছু ঘর ভাড়া সরূপ দাও না'।

বুনি এই কথা শুনে বোলে ছিল, আচ্ছা দোব। তারপর একটা বিশেষ কাজে পাটনায় চলে যায়। পরে কিছু টাকা দেয়। শ্রীম, পাটনায় যে পোষ্টকাড্ লিখে জানান তা এই ঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

Cal. দেবীপক্ষ ১১শী

Sj. 14—10—1929

Kamal K. Mitra.
c/o. Bose Mittra & co.
P.o. Moradpore.
Bankipore
(Patna.)

শ্রীযুক্ত কমল,

তোমার দুই খানি পত্র পাঠাইম। ৺বিজয়ার সম্ভাষণ সকল ভক্তেরা জানিবেন।

স্কুল বাড়ীর ভাড়া প্রায় মাসিক ২৬০৲ Rs. 260/- Per month. Music class এ অন্ততঃ ১৫৲ Rs. 15/- দিতে হবে —নভেম্বর হইতে।

affly.

শ্রীম—

শ্রীমকে শেষ দর্শন

৩১—৫—১৯৩২—১৭ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, একাদশী ১৯৩৯ সাল।

বুনি শ্রীময়ের ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যায় ও শ্রীমকে দর্শন করে। তারপর ঠাকুরের আরতির পর ছাতের উপর শ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তনম, ১০৮ গান করে। শ্রীম, সিতাপতি মহারাজ বলাই, হিমাংশু, অমূল্য প্রভৃতি বহু ভক্তগণ সে দিন উপস্থিত থেকে শ্রীরামনাম শ্রবণ করেন। পরে প্রসাদ ধারণ কোরে একে একে সকলে স্বগৃহে যাত্রা কোরলেন।

শ্রীময়ের অদর্শনের পূর্ব্ব দিনের ঘটনাদি

৫—৬—১৯৩২—২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৩৯ সাল। বুনি সকালে বাড়ীতে শুনল যে মাষ্টারমহাশয় শরীর কাল সকালে ত্যাগ করেছেন আর ভক্তগণ এসে খবর দিয়ে ছিলেন কিন্তু কমলের দেখা পায় নি। কমল পূর্ব্ব দিন দুপুর বেলায় দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল, আর বাড়ীতে শনিবার এসেই অন্যত্রে চলে যায়।

যাইহোক, বুনি শুনেই খালি পায়ে তখনই ঠাকুর বাড়ী যাত্রা করল।

কমল ভক্তদের কাছে শুনল্ যে শ্রীম, গত শুক্রবার দিন সকালে ঠাকুর, বাড়ী হ'তে তাঁর লাল স্কুল বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিচের একটি খালি ঘরে তিনি থাকবেন বলে কিছু জিনিষ ও রেখে ঘরটি তালা চাবি দিয়ে এসেছিলেন। তিনি বোলেছিলেন, 'এ ঘরটি বেশ হাওয়া বাতাস আছে, মনে কোরছি মধ্যে মধ্যে এসে থাকবো'। তিনি বিকালে আবার ঠাকুর বাড়ী হ'তে লাল স্কুল বাড়ীতে যান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরে এসে ঠাকুর বাড়ীতে যেমন রোজ ঠাকুরের আরুতি দর্শন করতেন সে দিনও তাই কোরেছিলেন। ভক্তদের সঙ্গে কথা বোলে নিচে এসে বিশ্রাম করেন। রাত্রে আহার কোরে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পঞ্চম ভাগের প্রুফ্ (proof) সংশোধন করেছিলেন। তারপর, সকল ভক্তগণ যখন স্ব গৃহে চলে যান, তখন ঠাকুর বাড়ীতে কেবল বলাই বাবু ছিলেন।

রাত্রি প্রায় ১০॥ টার সময় শ্রীম, বলাই বাবুকে বলেন, 'দ্যাখ হাতটা বড় আজ বেদনা কোরছে তুমি সেঁক দাও,— ইত্যাদি। তুমি একটি সোডা আন, কিন্তু যদি বমি হয়ে যায় ত শরীর থাকবে না'। তারপর প্রভাস বাবুকে খবর দেওয়াতে তিনি আসলেন ও গিন্নীমা ও এলেন। প্রভাস বাবু বল্লেন, একটা ডাক্তার ডাকি না। তিনি শুনে বোললেন, 'ডাক্তার দরকার নেই তোমরা যা হয় কর'। শ্রীম। (বলাই)।

'দ্যাখ আমার গলাটা ঘড় ঘড় কোরছে, বোধ হয় শ্বাস হয়েছে তুমি আমায় নিচে বিছানা কোরে দাও'। বলাই বাবু দেখলেন, তিনি অনবরত ঘামছেন ও ছট্‌ফট্ কোরছেন। এই ভাবে সারা রাত কেটে যায়।

তারপর ৪—৬—১৯৩২—২১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, অমাবস্যা ১৩৩৯ সাল। তিনি ভোরে বমি করলেন ও **"গুরুদেব মা কোলে তুলে নাও"** এই বোলে ৬টার সময় তিনি গভীর সমাধিস্থ হয়ে তিনি শরীর ত্যাগ করেন।

বুনি এইসব ঘটনা শুনে প্রাণে বড়ই আঘাত পেল। হায় হায়, একি শুনি! তিনি যেন কর্পূরের মত উপে গেলেন। এত শীঘ্র যে তিনি আমাদের ফেলে ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন তা আমরা কেউ স্বপ্নেও জানতে পারিনি।

শ্রীমাষ্টারমহাশয় আমার প্রতি এত কোরেছিলেন কেন? প্রথম দিন সাক্ষাৎ হ'তে কত ভালবেসে, যত্ন কোরে আপনার কোরে নিয়ে ছিলেন। উনি কি আপনার জন ছিলেন? আমার বাপ মা কি আত্মীয়রা কই আমার প্রতি ত কখন কেউ অমন কোরে করেন নি। ওনার ঋণ কি শোধ কোরতে পারব? কৈ তা ত বোলে মনে হয় না। না না, আর ভাবতে পারছি না, বুক ফেটে যাচ্ছে! ধন্য শ্রীম, এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাকে জীবনে মরণে না ভুলি। আপনি যা ভালবাসতেন তাই কোরে, এ জীবন স্বার্থক কোরে আপনার কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারি।

মাষ্টারমহাশয়ের জন্ম :—৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার, শ্রীনাগ পঞ্চমী ১২৬১ সাল। মাষ্টারমহাশয়ের পিতা মধুসূদন গুপ্ত, মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের ভাইয়ের বংশ। মাষ্টার ও অশ্বিনী কুমার দত্ত সহপাঠী ছিলেন। Presidency College এর prof. Tonyর ছাত্র। শ্যাম পুকুরের বিদ্যা-সাগর স্কুলের Branch এর হেড্‌মাষ্টার থাকতে খুব পরিচিত ছিলেন। (মহিমমহারাজের লেখান বইতে আছে)।

শ্রীময়ের চরিত্র

শ্রীমকে দেখলে মনে হ'ত অতিশয় সৌম্য মূর্ত্তি, স্বভাবটি খুব স্থীর নম্র ও কোমল। ঠিক যেন পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা, আবার রসিক ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁর চক্ষু দুইটি সর্ব্বদাই যেন পদ্মপত্রের মত ভাসত। তিনি যখন কারুর সঙ্গে কথা কইতেন, তখন দেখা যেত মধ্যে মধ্যে আড়-চোখে দৃষ্টি করতেন। তিনি ডান হাতের মধ্য ভাগটা মাথার উপর মধ্যে মধ্যে রাখতেন ও মেরুদণ্ড সোজা কোরে বসতেন। শ্রীম, নির্জ্জনে একা থাকতে বড় ভাল বাসতেন। প্রায়ই দেখা যেত তিনি ঘরে খিল দিয়ে একা থাকতেন। তিনি ঠাকুরের কথা কি তীর্থের কথা শুনতে বড় ভালবাসতেন। যদি কেহ ঐ বিষয় কিছু বোলতেন, তিনি তা আগ্রহের সঙ্গে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ কোরতেন। আর মধ্যে মধ্যে তন্ন তন্ন কোরে জিজ্ঞাসা কোরে নিতেন। তিনি শুনে বোলতেন, 'আমি এই সব যে শুনলুম, এখন ধ্যান কোরলে সমস্ত

দেখতে পাব, আমার তীর্থের ফল বা সেখানে যাবার ফল হয়ে যাবে'।

তাঁর কাছে কোন সাধু গেলে তিনি তাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন ও সম্মান কোরতেন। তাকে নিজের কাছে বসিয়ে কথা কহিতেন। আবার তার বিদায় কালে তাকে জলযোগ কোরিয়ে দিতেন। শ্রীম পরের দুঃখ দেখলে সাধ্যমত টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য কোরতেন। এমন বহু ব্যক্তিকে সাহায্য কোরেছেন দেখা গেছে। তাঁর শ্রীমুখে সর্ব্বদাই শ্রীগুরু শ্রীগুরু উচ্চারণ কোরতে শুনেছিলুম। তিনি তাঁর ডান হাতের চারটি আঙ্গুল জোড়া কোরে বুড় আঙ্গুলিটী মধ্য আঙ্গুলের উপর নাড়তে বহুবার দেখেছি; বোধহয় কর জপ করতেন। এইটী তিনি সকল কর্ম্মের মধ্যে বা যে অবস্থাতেই থাকতেন তাঁকে ঐরূপ কোরতে দেখেচি। (এই কয়েকটী সামান্য তাঁর চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপ দেখেছিলুম)।

দশম অধ্যায়। শ্রীরাখাল মহারাজের অসুখ

২৪—৩—১৯২২—১০ই চৈত্র, শুক্রবার একাদশী ১৩৩৮ সাল। রাখাল মহারাজ ৺বলরাম ভবনে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। বুনি সে সময় ছিল না, পাটনায় গিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং কাজে ভর্ত্তি হয়েছিল। রাখাল মহারাজের বিষয় যা শুনেছিল আর বইতে পড়েছিল তাই একটু লিপিবদ্ধ কোরে রেখেছিল।

রাখালমহারাজ। 'সহনং সর্ব্ব দুঃখনাং অপ্রতীকার পূর্ব্বকম'। ঔষধ সেবনে বোলেছিলেন, 'শিবই সত্য ঔষধ মিথ্যা'। তারপর শনিবার দিন সেবকগণকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি দেহ ত্যাগের তিন চারি দিন পূর্ব্বে বোলেছিলেন, কলিকাতা ভারি ঘিঞ্জি, ময়লা, ভুবনেশ্বরের বাতাস বিশুদ্ধ, সেইখানে আমায় নিয়ে চল। ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটী চাই, ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, কৃষ্ণ এসেছ? আমাদের এ কৃষ্ণ কষ্ঠের নয়, এ গোপের কৃষ্ণ কমলে-কৃষ্ণ'।

'আমি ব্রজের রাখাল আমায় নুপূর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণেব হাত ধরে নাচবো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আহা! পীত বসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্র একটি ধরে ভেসে যাচ্ছি। ঠাকুরের পা দুখানি কি সুন্দর! দেখ দেখি একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে, বোলছে আয়'।

ঠাকুর বোলছিলেন শুনতে পাই, "গঙ্গার উপরে একটি পদ্ম দেখলুম তার ভিতর বাল-গোপাল মূর্ত্তি সখা রাখালের হাত ধোরে নৃত্য কোরছেন"।

ইং ১৪—৪—১৯২২—১লা বৈশাখ, শুক্রবার, তৃতীয়া ১৩২৯ সাল। রাত্রি ৮।৪৫ মিনিটে ৺বলরাম ভবনে রাখাল মহারাজ দেহ ত্যাগ কোরে মোক্ষধামে ঠাকুরের কাছে চলে যান।

শ্রীরাখাল মহারাজের চরিত্র

শ্রীরাখাল মহারাজের স্বভাবটী খুব স্থির, নম্র ও কোমল

ছিল। মূর্ত্তিটী আনন্দ মাখান সর্ব্বদাই হাস্য বদন, কৌতুক প্রিয় ও রসিকতায় ভরপুর ছিল। দেখলে মনে হত কি অপূর্ব্ব এক আনন্দে মগন রয়েছেন। কখন আপন মনে হাসছেন কখন গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন। সমস্ত বদন মণ্ডলে এক জ্যোতিঃ বিরাজ করত। তিনি প্রায়ই মুচকে হেসে কথা কইতেন, এবং সেই ঠাট্টা তামাসার ভেতর কত গূঢ় তত্ত্ব ও উপদেশ থাকত। তাঁর কথা গুলি খুব মধু মাখান ছিল কথার সময় মনে হত, ঠিক যেন ৫ বৎসরের বালক, আধ আধ স্বরে বোলছেন।

রাখাল মহারাজ সর্ব্বদাই কর জপ করতেন, সকল কার্য্যের ভেতর দেখতুম তিনি জপ করতেন। তাঁর শ্রীমুখের জিহ্বা (জিভ্) বের কোরে একবার ঠোটের বাঁ দিকে আর একবার ঠোটের ডান দিকে ঘুরাতেন। তাঁর শ্রীমুখে সর্ব্বদাই "জয় মা জগদম্বে, জয় মা করুণাময়ী, জয় মা মহামায়ী" এইগুলি উচ্চারণ করতে শুনেছিলুম।

একদিন—রাখাল মহারাজ উদ্বোধনে উপর সিঁড়ি হতে নিচে নামছেন আর গোলাপ মা সেই সিঁড়ি ধোরে উপরে উঠছেন। এমন সময় গোলাপ মা থতমত খেয়ে নেবে পড়লেন। এই দেখে মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গোলাপ মা অমন কোরে নেবে গেলে কেন? গোলাপ মা বোললেন, না না ও কিছু নয়। তারপর তিনি আমাদের কাছে বোললেন, আমি দেখলুম ঠিক ঠাকুর উপর থেকে নিচে নাবছেন। রাখাল মহারাজের চলন, কথা' ঠাট্টা, তামাসা, হুবাহুব ঠাকুরের মত ছিল।

একদিন—তিনি ৺ভুবনেশ্বর যাত্রাকালে ৺বলরাম ভবন হতে গাড়ীতে উঠছেন এমন সময় বুনি দেখল তিনি বাঁ হাতের মধ্য আঙ্গুলের কাছে ঘ্রান কোরে তারপর গাড়ীতে উঠলেন। এই কয়েকটী সামান্য যা রাখাল মহারাজের চরিত্র দেখেছি। বোধ-কোরি আরও কত তাঁর চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপ ভক্তজন দেখেছেন।

(সংযোগ)। ২৪ পরগণার বসিরহাট সাব্‌ডিভিসনে আরবেলের কাছে ১২৬৮ সালে বসিরহাটের নিকট সিক্‌রা কুলীন গ্রামে, মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথীতে রাখাল মহারাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতা হারান চন্দ্র ঘোষ, বিভব শালী ব্যক্তি এবং জমিদারী কর্ম্মে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। রাখাল মহারাজের অল্প বয়সে মা মারা যায়। পিতা দ্বিতয় বার বিবাহ করেন।

রাখাল মহারাজ স্বামীজির বাড়ী এসে লেখা পড়া করতেন। অল্প দিন ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের নিকট হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা কোরেছিলেন। রাখাল মহারাজকে নরেন্দ্রনাথের পিতা 'গুজরুটি' হাতী বোলে ডাকতেন। কুস্তির আখড়ায় 'গজু' (গজ) বলে ডাকত—।

রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার পিসি ও পিসতুত ভগিনী নরেন্দ্র নাথের মাতামহী ও প্রমীতামহী। মনোমোহন মিত্র রামচন্দ্র দত্তের মাসতুত ভাই আর নিত্যগোপাল মহারাজ ও রামচন্দ্র দত্তের মাসতুত ভাই।

সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালে মনমোহন মিত্রের ছোট ভগ্নী

'বিশ্বেশ্বরী'কে রাখাল মহারাজ বিবাহ করেন। ১৮৮৬ সালে রাখাল মহারাজের একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম ছিল সত্যনারায়ণ নরেন্দ্র নাথের সঙ্গে উহাদের সম্পর্ক ছিল। ৯।১০ বয়সে ছেলেটী মারা যায়। ১৮৮৯ সালে রাখাল মহারাজ বৃন্দাবন ধামে যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী শর্য্যাত্যাগাদি করেন। এবং স্বপ্নে দেখেন রাখাল মহারাজ মারা গেছেন। অল্প দিন পরেই বিশ্বেশ্বরী আত্মহত্যা করেন।

('ব্রহ্মানন্দ অনুধ্যান' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)।

একাদশ অধ্যায়। স্বামিজীর বাড়ী যাওয়া

(সংযোগ)। ইংরাজি ১৯১৭ সাল, বাঙ্গলা ১৩২৪ সাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দের (স্বামীজির) বাড়ী ৩নং গৌর মোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট, (সিমলার কাছে) গিয়ে স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত (বুনি তাঁকে মহিম মহারাজ বলে) এঁর কাছে যাতায়াত করতুম। কখন সকালে, কখন বিকালে, কি সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁকে তামাক সেজে সেজে খাওয়াতুম আর চুপ কোরে বসে তাঁর কথাগুলো শুনতুম। মহিম মহারাজের হাবভাব, কথা, দৃষ্টি, হাসি, গম্ভীরতা, চলন, চা, চুরুট কি তামাক ঘনঘন খাওয়া, থুথু ফেলা, হাত, মুখ নাড়া, হাতের আঙ্গুল নাড়া, প্রভৃতি যা দেখতুম আর মনে মনে ভাবতুম যে, এঁর মত কাহারও এমন ক্রিয়া-কলাপের ভাব কারুর মধ্যে কখন দেখিনি। স্বামীজির যে সব ক্রিয়া-

কলাপাদির পরিচয় বইতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে আর এঁর (মহিমমহারাজের) সঙ্গে হুবাহুব সব মিলে যাচ্ছে—।

বাড়ীতে ঢুকতে বার মহলের সদর দরজা পুরান রয়েছে। পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে ১ হাত উঁচু রোয়াক ও দুটি ঘর আর পশ্চিম মুখ ঘরের ভেতর ঢুকে দক্ষিণমুখেও ঘর আছে। মহিম মহারাজকে পূর্ব্বমুখ ঘরে কয়েকবার থাকতে দেখি। ঐ ঘরে একদিন দেখলুম একটী তক্তাপোষ বা খাট, বিছানা, ২।৩টি বালিশ, মশারী, ২।৩টি চেয়ার, একটি আলমারি তাতে কিছু বই ও কাগজ রয়েছে। রোয়াকের উপর তামাক, টিকে, ৬।৭টি কোলকে, ৩।৪টি হুকো গড়গড়া রয়েছে। পশ্চিমমুখ রোয়াকের উপর একটা পুরান স্প্রীং এর বসবার বড় সেপয়া ও কয়েকটা চেয়ার। তারপর মহিম মহারাজকে পশ্চিমমুখ ঘরে থাকতে দেখি।

বাড়ীর ভেতর মহলে একদিন—দেখি একটি ঠাকুর ঘর। ঐ ঘরে কেবল 'দামূদর' নামে শালগ্রাম আছেন তাঁর নিত্য পূজা হচ্ছে। সামনে কল চৌবাচ্ছা, বড় উঠান, দু'দিকে রোয়াক। এক তোলায় কতকগুলো ঘর ও দোতলায় কতক-গুলো ঘর আছে।

স্বামীজিদের বাড়ী বার মহলে ঢুকে পুর্ব্বমুখ যে ঘর তার পার্শ্বে গলি। ঐ গলিতে ঢুকতে হ'লে রাস্তা দিয়ে পশ্চিমমুখ আস্তে প্রথমে ঐ লম্বা গলি পড়ে, তার পার্শ্বে স্বামীজিদের বাড়ী। ঐ গলিতে দক্ষিণমুখ ঢুকতেই বাঁ দিকে এখন যে বাড়ী আছে ঐ ঘরের মধ্যে স্বামীজির পড়বার ঘর ছিল।

ঘরের মধ্যে কয়েকটা জানালা আছে ঠিক রাস্তার পার্শ্বে হল।

মহিম মহারাজের মুখে শুনেছি, তিনি বলেন যে, ঐ ঘরে আমরা অর্থাৎ স্বামীজি, উনি, রাখাল মহারাজ এঁরা পড়তেন—। ঐ গলির মধ্যে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে দোতলা বারাণ্ডা ওয়ালা বাড়ী আছে সেই ঘরের মধ্যে স্বামীজির জন্ম হয়। পূর্ব্বে ঐ গলির সমস্ত চত্তর বা জায়গাটি বড় রাস্তা পর্য্যন্ত স্বামীজিদের ছিল। পরে, মোকদ্দমা হয়ে আলাদা ভাগ হয়ে পার্টিসনে পাঁচিল দেওয়া হয়। সেই কারণ এখন স্বামীজির জন্ম স্থানের ঘর ও পড়বার ঘর ওসব আলাদা হয়েগেছে।

আর মহিম মহারাজ 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী' বইটিতে এইসব জানিয়েছেন :—

'স্বামীজির পিতা বর্ত্তমান সময়ে স্বামীজিদের প্রকাণ্ড বাড়ী, বহু লোকজন ছিল। পিতৃ বিয়োগের পর অবস্থা অতি অসচ্ছল। (স্বামীজির পিতা ২৪—৩—১৮৮৪—১২৯১ বঙ্গাব্দে শনিবার রাত্রে মারা যান। স্বামীজি তখন বরাহনগরে পাঠ্যাবস্থার বন্ধু শ্রীসাতকড়ি মৈত্রের বাড়ী ছিলেন। খবর দেওয়াতে সেখান হ'তে নিমতলায় যান)। বাড়ীর পূর্ব্বের অবস্থার চিহ্ন এখন আর কিছুই নাই, কেবল দুইখানা পুরান ভাঙ্গা তক্তাপোষ, মাদুর, নরেন্দ্রনাথের পাঠাগারে গৃহের পশ্চিমদিকে ছেঁড়া তুলাবেরোন গদি, ২।১টি বালিশ, পশ্চিমদিকের দেওয়ালেতে একটা কাল মশারী, কড়িকাঠ হ'তে একটি টানা পাখার ছেঁড়া ঝালর ঝুলিতেছে।

ইংরাজি ১৮৮৭ সালের জুন মাসে স্বামীজিদের মাতামহের বাড়ী ৭, রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে আত্মীয়রা আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের দুর্ভাবনায় শিরঃ পীড়া হয়েছিল। নাকে কর্পূরের নাস নিতেন—। বাল্যকালে তিনি সর্ব্বদা নস্য লইতেন এবং উড্‌পেন্সিল দিয়া নস্য নাকে ঠেলিয়া দিতেন। রাত্রে ঘুমন্ত গয়ার ফেলিলে মশারির গায়ে নস্যশুদ্ধ গয়ার লাগিয়া যাইত। ঘুমন্ত রাত্রে উঠিয়া তিনি নাকে নস্য দিয়া আবার শুইতেন।

নরেন্দ্রদাথের বংশে তামাক খাওয়াটা অত্যন্ত প্রবল। যখন তামাক খাবার সুবিধা হইত না তিনি চূণ দোক্তা দিয়া হস্তে মেড়ে খৈয়ানি কোরে, ঠোঁটের ভিতর রাখিতেন।

স্বামীজির প্রণামঃ—জ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞায় বিবেক-দীপ-দীপ্তয়ে।
বিবেকানন্দ পাদায় নরেন্দ্রায় নমো নমোঃ॥
ওঁ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বেদান্তম্বুজ ভাস্করম্।
নমামি যুগকর্ত্তারং আর্ত্তনাথং বীরেশ্বরম্॥

একদিন—মহিম মহারাজ ও ভক্তগণেয় মুখে শুনলুম, যে রবীনবাবু (শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র) ২।৩টি আলমারি, ছোট টেবিল, কয়েকটি জিনিস রাখবার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় আনেন। কারণ মহিম মহারাজ যখন বই লেখাতে সুরু করেন তখন জিনিস-পত্তর কাগজ, বই, রাখবার জন্য রবীনবাবু আনেন আর কিছু সাহায্য ও করেন।

ইংরাজি ১৯৪৬ সালে দেখেছি ভক্তগণ মানস, ফটিক, শরৎ ও কয়েকটি ভক্ত মিলে তাঁদের স্বইচ্ছায় স্বামীজিদের বাড়ী মহাপূণ্য তীর্থক্ষেত্র জ্ঞানে, পূজার স্বরূপ Electric light, fan ও পশ্চিমমুখ ঘরের কিছু মেরামত আর দক্ষিণমুখ ঘরের পার্শ্বে একটি পায়খানা ও কল চৌবাচ্ছা কোরে দিয়েছেন।

শুনেছিলুম, একদিন রবীনবাবু চণ্ডী পাঠাদি করাতে তারপর থেকে ভক্তগণ মিলে স্বামীজিদের বাড়ীর বারমহলে পূর্ব্ব-দিকের রোয়াকে ঠাকুর স্বামীজির ফটো ও 'দামুদর' শালগ্রাম ও ঘট রেখে ৺ দুর্গা মহাষ্টমী পূজার দিনে বরাবর পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোমাদি হয়ে আসছে। রবীনবাবুর নামে সঙ্কল্প হয়ে পূজা হয়। পূজার শেষে প্রসাদ লুচি, রাধাবল্লভী, তরকারি প্রভৃতি বেশ পরিতৃপ্ত ভাবে খাওয়ান হয়। ঐ দিনে প্রায় ২০০ দুইশত ভক্তগণের সমাগম হয়ে থাকে। অতীব দুঃখের বিষয় যে রবীনবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ কোরে মোক্ষধামে ঠাকুরের কাছে চলেগেছেন। ইং 1946 সালে ঐ পূজার দিনে যোগ দেবার সুবিধা ভাগ্যে ঘটে ছিল। এর পূর্ব্বে কলকাতায় না থাকার দরুন কয়েক বৎসর মহিম মহারাজের সঙ্গ করতে ভাগ্যে ঘটে উঠেনি—।

(সংযোগ)। ভক্তগণের আগমন

ইংরাজি ১৯১৭ সাল হ'তে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্বামীজিদের বাড়ী যারা এসে মহিম মহারাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যা বোলতেন তাদের নামগুলি এই :—

ব্রহ্মচারী প্রাণেশ, রাজেনবাবু (ডাক্তার কাঞ্জিলালের বড় ভাই), বসন্ত, ত্রিলোচন, চিরঞ্জীব, আশু, উপেন (উকিল), উপেন (শিক্ষক), উমেশ, রাজারাও, বিহুদত্ত, ব্রহ্মচারী হেমন্ত, প্রভৃতি আরও ভক্তগণ আসতেন তাদের নাম সব জানা ছিল না।

কয়েক বৎসর পর যখন স্বামীজিদের বাড়ী আবার যাতায়াত করতে স্থরু করলুম তখন ক্রমে ক্রমে যে সব ভক্তগণের সঙ্গে মেলামেশা হতে লাগ্‌ল তাদের নামগুলি এই ঃ—

ললিতবাবু (উকিল), শিবুনাগ, ললিত (মাষ্টার), প্যারী (উকিল), ধীরেন, কেষ্ট, বিহু, রঞ্জক, বরেন, রঘু (ধীরেনবাবুর বড় ভাই), প্রহ্লাদ, শচীন, মানস, লক্ষ্মী, শরৎ, হিরণ, ফটিক (ডাক্তার), কেশব, শ্যাম, নির্ম্মল, হরেন নাগ, হরেনবাবুর পুত্রগণ ; স্থবোধ, মাখম (কবিরাজ), সামন্ত, ব্রহ্মচারী শিবু, ফেলু, মহিতোষ, প্রসাদ, লালবেহারী, রাজেন, সন্তোষ, স্থপ্রকাশ, কুশীবাবু (মানসের দাদা) প্রভৃতি আরও ভক্তগণ আসেন তাদের নাম সব জানা নেই।

স্থরেনবাবু (স্থরেন্দ্রনাথ সেন, স্বামীজির সময়কার) ইনি মধ্যে মধ্যে আসেন। স্বামীজিদের পাড়ার মধ্যে বহু ভক্তগণ ও বাড়ীর মেয়েরা এসে মহিম মহারাজের সঙ্গে দেখা কোরতে আসেন। এ ছাড়া দূর বা অন্য জায়গা থেকেও বহু ভক্তগণ ও মেয়েরা এসে তাঁকে দর্শন করেন। সকলের নাম এখন জানা নেই।

(সংযোগ)। **শ্রীমহিম মহারাজ ও কমল**

ইংরাজি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে একদিন স্বামীজিদের বাড়ীতে মহিম মহারাজের কাছে গিয়ে বোললুম ঃ—

কমল। (মহিমমহারাজ)। আমার মামার বাড়ীর তরফ থেকে আপনাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা আছে শুনেছি।

মহিম মহারাজ। (কমল)। তোর দাদা মহাশয়ের নাম কি ?

কমল। শ্রীনন্দলাল পালিত। (কোন্নগরের পালিত)। এখন পটলডাঙ্গায় বাড়ী ; তাঁরা সেখানে আছেন।

মহিম মহারাজ। (কমল)। ওঃ তুই নন্দলালের বড় মেয়ের ছেলে, তাই বল।

কমল। (মহিম মহারাজ)। শুনেছি, দাদামণির খুড়তুত ভাই শ্রীউপেন্দ্র নাথ পালিত এর সঙ্গে স্বামীজির মধ্যম ভগ্নীর মধ্যম কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়। আর ঠাকুরের ভক্ত শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বাড়ী। পূর্ণবাবুর পিতা, রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ, তাঁর ভাই যদুনাথ ঘোষ। আমার জ্যাঠাইমার দাদামহাশয় হতেন।

আপনাদের নং ৭, রামতনু বসুর গলিতে যে ঝিমার বাড়ী ছিল তার কাছে ১৪।৪, জেলে টোলায় ঠাকুমার পিতা ৺ রামকুমার বসুর বাড়ী, ও জায়গাটা কাঁশারী পাড়াও বলে। স্বামীজি অনেকবার গেছেন।

মহিম মহারাজ। (কমল)। হ্যা হ্যাঁ, সব জানি, ও জায়গাটা আগে গয়লাপাড়া ছিল।

কমল। (মহিম মহারাজ)। শ্রীরামকুমার বসুর ভাই ছিলেন, শ্রীদ্বোয়ারকা নাথ বসু ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু। মহেন্দ্রনাথ বসুর বড় ছেলে শ্রীনারাণ চন্দ্র বসুর সঙ্গে বাগবাজারে ৺ বলরাম বসুর শালক তুলসীরাম বাবুর বড় মেয়ে চণ্ডী তার বিবাহ হয়। আমার বাবার মামাতো ভাই।

একদিন—মহিম মহারাজ। (কমল)। **তোর ভেতরটা খুব ভাল, বাইরে একটু চঞ্চল ভাব।** তোর নাক যত বড় বুদ্ধি তত বড়। ছাখ, তুই আমার জন্য তামাক, খাবার যা আনিস তা'বোলে যে আমি সন্তুষ্ট তা নয়, **স্বামীজির ঋণ যাতে শুধতে পারিস তাই কর। আমরা তিন ভাই রুদ্র অংশে জন্মেছি তাই আমাদের এই রকম ভাব।**

মহিম মহারাজের কাছে রোজ কখন সকালে, কখন বিকালে যেতুম। তাঁকে তামাক সেজে দিতুম আর চুপ কোরে বোসে কত কি শুনতুম, দেখতুম আর মনে মনে চিন্তা করতুম। একদিন—বাড়ীর বার মহলের বাইরের রোয়াকে বোসে খাওয়া হয়। মহিম মহারাজ, কমল, প্রাণেশ বাবু, বসন্ত, ত্রিলোচন, বোসে ভাত ও মাংস খাওয়া হচ্ছে এমন সময়ে মুখ হ'তে মাংস চিবিয়ে (একটু শক্ত ছিল) হাড় ও মাংস পাতের পার্শ্বে মেঝেতে ফেলি। এই দেখে মহিম মহারাজ বোল্লেন, 'এই আহাম্মক, মাংস খেতে জানিস না, ওসব ফেললি কেন, তুলে খা'। তাঁর খাওয়ার পাত থেকে কিছু খেতে দিলেন। তিনি তারপর বোল্লেন, 'তোদের বয়সে ছেলেবেলায়

মাংস, হাড়টার চিবিয়ে ছাতু কোরে ফেলতুম'। বকুনি ও ঐ রকম শুনে ভয়ে কুড়িয়ে চেবান মাংস ও হাড় খেয়ে ফেললুম্।

একদিন—উপেন বাবুর (উকিল) বাড়ী মহিম মহারাজের নিমন্ত্রণ হয়। তিনি কমলকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানেও তাঁর পার্শ্বে বোসে খেয়েছিলুম্।

নিমতলা ষ্ট্রীটে প্রাণেশ বাবুদেয় বাড়ী। মহিম মহারাজ সেখানে কয়েক মাস ছিলেন। কমল সেখানেও যেত। প্রাণেশ বাবু, হেম বাবু থাকতেন, মহিম মহারাজ মধ্যে মধ্যে কত ঘটনা বোলতেন, কখন গম্ভীর ভাবে চুপ কোরে থাকতেন—।

মহিম মহারাজ একদিন—বিকালে মাষ্টার মহাশয়ের (সাদা স্কুল বাড়ী, পঞ্চানন ঘোষের লেনের মোড়ের উপর) কাছে যান। সে দিন কমল মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ছিল। বিকালে মহিম মহারাজের সঙ্গে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হয়ে মেছুয়া বাজারে, (এখন কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট) এসে বরাবর ঈশান মুখুর্য্যের বাড়ীর কাছে যেই আসা হল তিনি বোল্লেন, 'এই বাড়ীতে ঠাকুর এসে ছিলেন। এই বাড়ীর পার্শ্বেটা তখন পুকুর ছিল'। কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়ে আবার মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গেলুম্।

শ্রীমহিম মহারাজের পত্র

পাটনায় থাকার সময় মহিম মহারাজ রাজারাওকে পোষকাড্ দিয়ে যে খবরগুলি নিয়ে ছিলেন তা এই :—

Bramha Vadin Club.
16, Hewett Road.
Allahabad, 13—2—1923.

To
B. Raja Rao Esqr.
Under Secretary
All India Congress Committee.
P. O. Moradpore. Patna.

My dear Raja,

Right glad in receiving your P. C. Your 1st. letter never reached me so it is the case with letter of many, many of these letters are lost. Harshadev has gone to Tarakpore no arrangement is made for Almora, neither he has sold the books further he is, nothing to be relied on him, Sailo came to see me twice he is now here, I asked Sailo to take back the books from Harsha.

In Bengali I have attemped to write now. I found no difficuilty in the language, the books are sent to Basanta, within a few days I shall be off from here either to Benaras or anywhere else. Writing to Pranesh now, got no letter from him for many days. How are Thesa Narayan, their mother & aunt give my blessings to them all, my health is good.

Give my love and blessings to our people of Patna, :Kamal Krishna Mitra a boy is now in Patna, give my blessings to him, infrom him about me he will be much attached to you.

Give my love to Homeo Doctor Bhulloo the friend of Dr. Kanjilal.

गम्यतां अर्थ लाभाय क्षेमया विजयाय च
शत्रु पक्ष विनाशाय पुन: आगमनाय च ।

with Blessing & Love

Mohendra Nath Dutt.

21—11—1924

3, Gour Mohan Mukherjee St.

Calcutta.

To

Dr. Sachindra Nath Bose. M. B.

My dear Sachin,

I am introducing to you Sj. Kamal Krishna Mitra, who wants a certificate of leave as he was ill & could not join his office in due time.

Please give him a leave certificate & oblige.

Your with Blessings.

Mohendra Nath Dutt.

শিক্ষাগুরু

একদিন,—মহিম মহারাজ। (কমল)। (ভিজে গামছা দেখিয়ে) ঐ গামছাটার ভেতর যে জল ছিল তা কোথায় গেল?

কমল। (মহিম মহারাজ)। তাত জানি না।

মহিম মহারাজ। (কমল)। ছ্যাখ, যা দেখবি, শুনবি, তা ভাববি, যা ভাবগে যা। ওরে আমি দীক্ষা গুরু নয়, শিক্ষা গুরু।

মহিম মহারাজের সকল কথাদিতে মনে মনে ভাবতুম, উনি (মহিম মহারাজ) কখন কি ভাবে কত বলেন, দেখে শুনে মাথা গুলিয়ে যায়। ওনার স্মরণশক্তি বা মেধা এত প্রবল যে বলা যায় না—।

'স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী' বইতে মহিম মহারাজ মেধা ও শিক্ষাগুরুর বিষয় যা জানিয়েছেন তা এই :—

একদিন—বলরাম বাবুর বাড়ীর উপর দালানে স্বামীজি পায়চারী করছেন। যোগেন মহারাজকে হাস্য করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমাদের এত বুদ্ধি মেধা কেন জানিস, আমরা যে Suicideএর বংশ, আমাদের বংশের অনেকগুলো Suicideএ আত্ম ত্যাগ করেছে। আমাদের একটু পাগলামী ঝিট্‌ আছে কি না তাই তো আমাদের এত বুদ্ধি মেধা। তোদের মতন কি হিসেবি রে, অত হিসেব কর্তেগেলে কি কোন কাজ কর্তে পারা যায়। যা করবার তা একটা করে দিলুম, লাগে তাক্ না লাগেতুক্কা'।

নিরঞ্জন মহারাজ বলেছিলেন, ছ্যাখ, এই নরেনের এতটা বুদ্ধি কেন জানিস, নরেন খুব তামাক খেতে পারে।

বাল্যকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁর সহপাটি হরমোহন মিত্রকে বলিয়াছিলেন—'ছ্যাখ, দর্শন শাস্ত্র গুলি আমার হাতের মুটোর ভেতর রয়েছে; আর পাশ্চাত্য দর্শন গুলও আমার ঠোঁটের আগে রয়েছে।

আমরা কোন থাকের জানিস? আমরা হচ্ছি Teacher class (শিক্ষক শ্রেণীর থাক) জগৎ কে নুতন ভাব দেবার জন্য আমরা আসি'।

সম্ভবতঃ ইং 1891 সালে বৈশাখ মাসে রবিবার প্রাতে সিমলা পাহাড় থেকে এক পত্র আসে যে নরেন্দ্রনাথের এক কনিষ্ঠ ভগ্নী তথায় আত্ম হত্যা করিয়ছে। স্বামীজি তখন আলমোড়ায় আছেন।

অর্জ্জন ও বর্জ্জন

বাল্যকালের একটি খুব নিকট আত্মীয় বা বন্ধু অবিনাশ, এর সঙ্গে একদিন যে সব আলোচনা হয়েছিল তা অল্প কোরে দেওয়া হল সমজে লবার জন্য।

অবিনাশ। (বুনি)। ইদানিং বা আজকাল প্রায়ই দেখা শোনা যাচ্ছে অনেক ছেলে ও মেয়েদের ভেতর English Styleআদি ঢুকে যাচ্ছে বা অর্জ্জন করছে, নয় কি?

বুনি। কি রকম Styleআদি দেখতে, শুনতে পাওয়া যায় অনেক রকম ত আছে, তারা কোনগুলো পছন্দ কোরে

নিচ্ছে? অবিনাশ। যার যেটা ভাল লাগছে সে তাই নিয়ে কাটাচ্ছে, কত বলব, সব দেখে শুনে অবাক হচ্ছি।

বুনি। একটু শোনাও, আমিও ত অবাক হয়ে যেতে পারি।

(রাগতভাবে) অবিনাশ। ভাল প্যাণ্ট, কাপড়, জামাদি পরে কেউ কেউ গট্‌মট্‌ করে মুখে শীষ ও চুরুট দিয়ে প্যাণ্টের পকেটের ভেতর হাত রেখে কত কি ঢংএ কথা বলছে—। কেউ রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছে, হাত, মুখ, মাথা নেড়ে, চেঁচিয়ে কথা বলে, কথার পিঠে মাইরী, শালা, বলে—উচ্চ হাসি হেসে ঢলে পড়ছে, সে কত রকম ঢং বা Style যাই বল—ওসব করে যখন যায় তখন দেখতে পাওনা কি?

আবার ছ্যাখ, যখন হেটে বেড়াতে যাচ্ছে কি সিনেমায় যাচ্ছে, তখন ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের গায়ে যে কোন জায়গায় কত লোকের অঙ্গ স্পর্শ হচ্ছে, তখন কোন কথা কেউ বলে না বা সাবধান হয়ে চলে না। যখন ট্রাম বা মটর বাসে ভিড়ের মধ্যে উঠতে যায় তখন যদি কোন পুরুষের একটু অঙ্গ স্পর্শ কি ধাক্কা লেগে গেল, অমনি কট্‌মট্‌ করে দেখে পরস্পর বলে উঠল Idiot—।

অবিনাশ। তারপর আরও হয়ত দেখে শুনে থাকবে যে, কতক ছেলে ও মেয়েরা মিলে যারা প্রেমের হুড়াহুড়ি, ঢলে গড়াগড়ি, বিচ্ছেদে গলায় দড়ি, কেউ বলে মল, জলে ডুবে মরি, হায়, হায়! কি ঝক্‌মারি—। ঐসব ব্যাপার লেকে, পথ ঘাটে কত ঘটল; কাগজে লিখে কত জানাল।

বুনি। তা সত্যি, অনেক ঘটেছে ও এখনও কত জায়গায় ঘটছে—।

অবিনাশ। যদি কোন পাড়া বা রাস্তা দিয়ে কোন বে-পাড়ার লোকজন যায় ত তাদের টিট্‌কারি দিয়ে বলবে, খুব যে Style দেখিয়ে যাওয়া হচ্ছে—।

রাত্রে কি দিনমানে কোন পাড়া বা রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যাচ্ছে আর শব বাহকেরা বিকট চিৎকার ওবার করে বলছে, 'বলহরি হরিবোল' শব বাহকদের হুঁস নেই যে, যদি কোন বাড়ীতে রুগী অসুখে ভোগে তারা যদি আমাদের চিৎকার শোনে, ত ভয়ে আঁৎকে গিয়ে হাট্‌ফেলও করতে পারে। সাধারণ লোকের ঐরূপ চিৎকার শুনলে, হাট্‌-প্যালপিট করতে থাকে। ঐ রকম চ্যাঁচানকে কি বলতে পারা যায়? আস্তে আস্তে বললে কি দোষ হয়?

আরও ছাখ, রাস্তা দিয়ে যখন পান ও কিছু খাবার জিনিষ ফল কি চীনে বাদাম খেতে খেতে যায়, তখন কেউ কেউ পানের পিচ, থুতু যেখানে সেখানে পচাৎ পচাৎ করে ফেলতে ফেলতে যায়, খোসাগুলোও ফেলতে ফেলতে যায়—।

লোকের বাড়ীর জানালার কাছে, যে যেখানে পেলে অমনি প্রস্রাব করতে বসে যায়। কত পাড়ার মধ্যে ময়লা বা নোংরা করে ছাই, মাছের আঁস, গুয়ের ন্যাকড়া ছড়িয়ে ফেলে, তাতে কত মাছি, পোকা হয়, আর গন্ধে লোকের অসুখ হয়—। আগে পুলিশরা রাস্তায় ঐরকম প্রস্রাব করলে

লোককে ধরত, এখন ধরে তারা ঐ সবের জন্য খুব কড়া নিয়ম করে দিলে ভাল হয় যাতে আর ওরকম সব না হয়। ঐ সব বদ অভ্যাসাদি গুলো কখন কি ইংরাজদের মধ্যে কেউ দেখেছে? কখনই নয়। তারা Decipline, Puntuality কতকগুলো জিনিসের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে, যা আমাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। যে যা শিখছি তা ত সবাই জানে—।

বুনি। ঠিক কথা, ও সব ১৫ বছর আগে ঢের জানিয়েছি। কি বলবে—। হিন্দুস্থানীরা বলে, 'দেশী চিঁড়িয়া বিলাইতি বুলি'। যাদের লজ্জা সরম, ভয়, ভদ্রতা থাকে না তারাই Decipline-আদি ভঙ্গ করে। 'স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লোৎ যায় না ধুলে' মানুষের আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতি ঘোরে—।

কোনগুলো অর্জ্জনীয় আর কোনগুলো বর্জ্জনীয় এ যদি লেখাপড়া শিখে, পাস করে যাঁরা জীবনে প্রতিফলিত না করতে পারে ত তাদের জীবনের মূল্য নেই, তারা মানুষ হয়েও কি মানহুঁষ হচ্ছে না, আর কিছু বলতে পারা যায় কি?

বুনি। যাক, আচ্ছা, Riot এর ব্যাপারটা কেমন হল বল দেখি! আমি সে সময় সিলেটে ছিলুম, কলকাতায় 1—9—46 এলুম।

অবিনাশ। Riot 16th August 1946 হ'তে যা সুরু হয়ে ঘটল তা আর কি জানাব, সে অদ্ভুত ব্যাপার। হিন্দু মুসলমানে মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, লুট, আগুণ দেওয়া, নারীহরণ, শিশু হত্যা—।

'সংগ্রামে মরণং শ্রেয় ন চ জীবেৎ পরাজিত'—।

বুনি। কাগজে ও রেডিওতে যা খবরাখবর শুনলুম ও পড়লুম। কলকাতায় এসেও ঐসব ব্যাপার শুনলুম। নোয়াখালি পাটনা, বাঙ্গলা দেশে বহু ব্যাপারে ক্ষতি হয়েছে নাকি! এমন যে ঘটবে তা কেউ স্বপ্নেও জানত কি? আচ্ছা, হঠাৎ ওরকম কেন ঘটল কারণ কি ছিল?

অবিনাশ। কেউ কেউ বলেন, দেশ স্বাধীন, হবার জন্য হিন্দুরা চেষ্টা করে আসছে আর নানান ব্যাপারে যারা বাঁধা দিয়ে ঘটিয়ে আসছিল, তাদের ভূল, দোষ গুলো কাগজে লিখে প্রমাণ দেখাতে লাগল, যে কাদের দোষে কি হল—। কেউ বলছেন,—জগতে বহু প্রকার পাপের সৃষ্টি হতেছিল তাই ভগবান ওরকম ঘটিয়ে দেখালেন, যে তোমরা পাপ বা অন্যায় কর্ম্ম হ'তে এখনও সাবধান হও—।

বুনি। পাপ বা অন্যায় কর্ম্ম গুলো কি রকম হচ্ছিল?

অবিনাশ। এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছ। জাননা, যে যা পাপের বা অধর্ম্মের কাজ করে আসছিল বা করছে তা তারা সকলেই জানতো বা জানে। যেমন :—লোক, লোককে নানান ব্যাপারে ঠকিয়ে আসছে—। নারীহরণ, সতীত্বনাশ, ভ্রুণ হত্যা প্রভৃতি। বিষাদি খাইয়ে বা হত্যা করে তার সম্পত্তি হস্ত গত করা—।

এইসব ব্যাপারে ভগবানকে জানাই, হে ভগবান, তুমি এমন নিয়ম বা ধারা করে দাও যে, মানুষ জীবনে যদি অন্যায় বা

পাপ কর্ম্ম করতে চায় যেমন; চুরি ডাকাতি, মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা ঠকান, স্বার্থপরতা, ভাবের ঘরে চুরি, হিংসা দ্বেষ, অহঙ্কার। এইগুলোর মধ্যে যে কোনটাই হোক জীবনে ১০ বার যেই পূর্ণ হবে, সে আপনা হ'তেই তখনি যেরকম ভাবেই হোক সে মারা যাবে। ঐগুলোর মধ্যে ৮ কি ৯ বার করলে মরবে না বরং তার জন্য গুরুতর শাস্তি পেতে হবে। আর যদি কেউ নারীহরণ, সতীত্ব নষ্ট, ভ্রূণ হত্যা করতে যায় কিংবা কেউ কাকেও বিষ খাইয়ে কি ছুরিতে, কি গুলি মেরে যে ভাবেই হোক কারুর প্রাণনাশ করতে যেমনি যাবে, অমনি সে আপনা হতেই তখনি মরে পড়ে যাবে।

বুনি। সত্যি, মানুষ যে গুলো অন্যায় বা পাপ কার্য্যাদি করে তার হিসেব নেই। মনেকর, একজন লোক হয়ত দিনে অনেক মিথ্যা কথা বলছে, ঠকাচ্ছে, চুরি করছে কত কি—যতক্ষণ না সে ধরা পড়ছে, ততক্ষণ সে করতে থাকে। কিন্তু তুমি যা বললে, যে ঐ গুলো ১০টা যেই করা পূর্ণ হবে সে তখনিই আপনা হতেই মরে যাবে। আর যে সতীত্ব নষ্টাদি হত্যা যখনি করতে যাবে, তখনি তার আপনা হতেই মৃত্যু হবে। এগুলো যদি সত্যিই ভগবান নিয়মের মধ্যে রেখে, এইবার থেকে সৃষ্টি করে সকলকে জানিয়ে দেন ত খুব ভালই হবে। তা'হলে জগতে আর কোনরূপ অশান্তিআদি দেখা যাবে না। সবাই জানবে ও সাবধানে চলবে নয় কি?

বুনি। আশা করি, ভগবানকে সবাই এই প্রার্থনা

করবে যাতে তিনি ঐ রকম নিয়ম গুলি করে দেন ও সবাই জানতে পারে, যে, প্রত্যেকে স্বাধীন, রাজ্যে, হিংসাদি না হয়—।

তবে মনেহয়, যে গোড়াথেকে পিতা মাতারা ছেলে ও মেয়েদের যেমন শিক্ষা বা আচার ব্যবহারাদি শেখাবেন, দেখাবেন, তারা ঠিক তেমন ভাবে গড়ে উঠবে। পুরাকালে, পিতা মাতারা ছেলে ও মেয়েদের গুরু গৃহে বা ঋষি মুনিদের আশ্রমে কেন রেখে দিতেন জান ? যাতে তারা এক একজন দেব ও দেবী সম হয়ে উঠতে পারে। আর আজকাল সংসারে থেকে শিক্ষার গুণ কি দাঁড়াচ্ছে—।

অবিনাশ। আজকাল ত ঐ রকম ঋষি মুনিদের আশ্রম নেই, যে ছেলে মেয়েদের রেখে সৎ শিক্ষাদি দেওয়াবে।

বুনি। কেন, যদি প্রত্যেক ঘরে ঘরে পিতা মাতারা সংসারটি তপোবনের মত কি ঋষি মুনিদের আশ্রমের মত করে, সংসার করে কাটান, তা'হলে ত হয় অর্থাৎ যেখানেই থাকুক না কেন তারা সেখানেই সৎভাবে থেকে সমস্ত শিক্ষাদি করবে তা'হলেই হল।

ঐ রকম পিতা মাতার গর্ভে যে সব ছেলে ও মেয়েরা জন্মাবে তাদের পিতা মাতারা ঋষি মুনিদের মত শিক্ষা, আচার ব্যবহার সমস্ত শেখাবেন, দেখাবেন। পিতা মাতার উপর ছেলে ও মেয়েদের আচার ব্যবহার, শিক্ষাদি নির্ভর করছে, এর জন্য তাঁরা দায়ী। যদি পিতা মাতারা প্রধান কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব হিসাবে ভেবে নেন, তবেই কার্য্যকর হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

শিক্ষাগুলি এই ঃ—১। পিতা মাতারা ছেলে ও মেয়েদের বাল্যকাল থেকে লেখাপড়া, খেলা, খাওয়া, ঘুমান এইগুলো ঠিক নিয়ম মত করাবেন—।

২। যখন ছেলে ও মেয়েরা ১০।১২ বৎসরে পড়বে তখন থেকে তাদের প্রতি ভাল ভাল গল্প, বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিষয় শোনাবেন। তারপর রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে তাদের শোনাবেন আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করবেন, যে বল দেখি আমি তোমাদের কি বিষয় পড়ে শোনালুম। তারপর, তাদের ঐ সব সৎ গ্রন্থ পড়তে দেবেন। যেমন স্কুল কলেজের বই পড়ে শিখতে হয়, ধারণা করতে হয়। ঠিক তেমন ঐ সব শাস্ত্র পড়ে পিতা মাতার কাছে পাস করতে হবে। মেয়েরা স্কুল, কলেজে ও অন্যান্য বিষয় যা শিক্ষা করবে তা পিতা মাতা, শিক্ষয়িত্রীদের কাছে, অন্য পুরুষের কাছে নয়।

৩। ছেলে ও মেয়েরা যেন কোনরূপ নভেল, নাটক বই না পড়ে—। দেব দেবীর ভজন গান, স্তোত্র ছাড়া অন্য কোন রসের, প্রেমের গান না করে। আর তাদের মধ্যে যেন কোনরূপ হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ভাবেরঘরে চুরি, বাচালাদি না ঢুকে স্থান পায়, এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

৪। যার যে কোন দেব দেবীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকবে সেই দেব দেবীর রোজ ধ্যান, জপ, প্রার্থনা গুলি পিতা মাতা ছেলে মেয়েদের করাতে শেখাবেন। অন্ততঃ

রোজ আধঘণ্টা চুপ করে বসে স্থির হয়ে শিক্ষা করে অভ্যাস করতে হবে। ভাল না লাগলেও তাকে স্থির হয়ে বসে চিন্তা করতে হবে, ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে—।

যাদের দীক্ষা গুরু হবে তারা সেই মত করবে। আর যাদের দীক্ষা গুরু হবে না তারা গায়ত্রী জপ, ধ্যান, চিন্তা করলেই হবে।

ছ্যাখ, ছেলেবেলায় যখন ২।১টা মিথ্যা কথা বোলতুম, বাড়ীর পয়সা চুরি করতুম তারপর শাস্তি পেয়ে পরক্ষণেই মনের সঙ্গে বিচার করতুম, যে মন কেন তুই এমন পরামর্শ দিলি। তারপর জোরে তুই কাণ মোলে, তুই গালে চড় মেরে বোলতুম, আর কখন করবি, বলবি? সেই থেকে সব ঠিক হয়ে গেল।

বাড়ীতে ছোট বোন, ভাইকে মিথ্যা কথার জন্য মেরে বকেছি। কারণ নিজে যখন তেমন নই, কেন ওরা আমার মত হতে পারবে না! আবার ছ্যাখ, তাদের পায়ে হাত দিয়ে ও বাবা, মা, দাদা এঁদের ও পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলেছি, যে অন্যায়ের জন্য তোমাদের মেরেছি যদি অন্যায় ছাড়া তোমাদের মেরে থাকি এ জন্মে কি পূর্ব্ব জন্মে যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাক ত আমায় ক্ষমা কর। আর গুরুজনদের পায়ে ধরে বলেছি, যে আপনাদের যদি কোন ক্ষুদ্র অন্যায় দেখে কত উচিৎ কথা বলে যা বকেছি ও কথা শুনিনি; এছাড়া যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে আপনারা ভাবেন, ত এ জন্মে ও পূর্ব্ব জন্মের জন্য, আমায় ক্ষমা করুন। তারপর শোন ঃ—

৫। পাড়া প্রতিবাসীদের ও রাস্তার সকল লোকজনকে

যারই সঙ্গে দেখা হউক না, ছেলেমেয়েরা তারা যেন পরস্পর ভাবে, যে আমরা এক রক্তের ভাই, বোন ও এক আত্মা—।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্ব আত্মাবশং সুখম্'। 'অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্ব মিদং জগৎ"।

৬। ছেলে ও মেয়েদের ঐ রকম সংসারে ব্রহ্মচারী হয়ে অন্ততঃ ২৫ বৎসর থেকে ঐ সব সৎ বিদ্যা শিক্ষাদি করে পাস করতে হবে। তারপর পিতা মাতারা ছেলে ও মেয়েদের শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের বিবাহ দিবেন, Love marriage নয়।

"স্ব ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পর ধর্ম্ম ভয়াবহ"—।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়'। 'আগে নিজে আত্মজ্ঞান লাভ করে অনাসক্ত বা আসক্তি ত্যাগ করে সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম কর'। আগে ষড়রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম কর, মনকে বশ কর—। 'পার্থিব জগৎ অন্তর্জ্জগতের প্রতিবিম্ব। অন্তর্জ্জগতে যাহা চিন্তা করা যায়, বহির্জ্জগৎ তাহার স্ফুরণ মাত্র'।

এইরূপভাবে, পিতা মাতারা ছেলে মেয়েদের গড়ে তুলবেন, নচেৎ এর জন্য তাঁরা দায়ী। ঐ রকম সমস্ত শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে Compulsory Rule করতে হবে ও মধ্যে মধ্যে Inspection করতে ও করাতে হবে—।

যদি কোন ছেলে মেয়েরা শিক্ষার অবাধ্য হয়, তাদের জন্য Report দেবেন ও আলাদা ব্যবস্থা করে শাস্তি দেওয়া দরকার হবে, কারণ একজনের জন্য দশ জন খারাপ

যাতে না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা ও প্রতিকার করা—।

মনেকর, আমার যদি শত কি হাজার ছেলে ও মেয়ে জন্মাত, ত আমি তাদের শিক্ষার সময় বোলতুম, যে তোমরা আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলে জানাও, যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ঐ সমস্ত সৎ শিক্ষাদি, আত্মজ্ঞান লাভ আগে করবো, তারপর অন্য কিছু। ঐ শিক্ষাদির জন্য পাশ করতে করতে যদি জীবনও যায় ত মঙ্গল তবুও ঐ সমস্ত শিক্ষাদি ব্যতীত আমাদের বেঁচে থাকাও যা আর মরাও তা সমান জানবো।

যেদিন থেকে, এই রকম মনের জোর ভাব নিয়ে সবাই সংসারে ঐ সব কর্ম্মের শিক্ষায় ব্রতী হয়ে রত থাকবেন, সেদিন থেকে ভারতে সবাই আশা করতে পারবেন যে, ভারতে ওরা সবাই এক একজন আদর্শের শ্রেষ্ঠ মানহুঁষে দেব দেবী হচ্ছেন। সাধারণ যেমন মানুষ দেখতে পাওয়া যায় তা এরা সেরকম নয়।

সমাজবাসী ও দেশের পরিচালকগণ সবাই মিলে, আপনার জন ভেবে ঐ সকল শিক্ষার জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে, যাতে সবাই রত্ন সম হয়ে উঠতে পারেন, তারজন্য চেষ্টা করেন ত আশা করা যায়, যে সবাই দেব দেবী সম হয়ে উঠবেন।

(সংযোগ)। **শ্রীমহিম মহারাজের চরিত্র**

মহিমমহারাজের মুখে শুনেছি, তিনি বহু তীর্থে গিয়েছিলেন। পাহাড়ে ভ্রমণ, কঠোর সাধনাদি কোরে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি অনেক বই পড়েছেন, শাস্ত্র, ইতিহাস, ইত্যাদি

অর্থাৎ যে কোন বিষয় যে কেউ কোন বইয়ের মধ্যে কি আছে প্রশ্ন করলে তা বোলে দিতে পারেন—। অনেক পণ্ডিত বা জ্ঞানী দেখেছি কিন্তু এঁর ভেতর যা দেখলুম শুনলুম তার তুলনা হয় না। এ বিষয় সকলেই জানেন—।

মহিম মহারাজ অনেক বই লিখিয়েছেন। তিনি অনর্গল বোলে যেতেন আর ভক্তগণের মধ্যে কেউ কেউ নোট কোরে লিখে রাখতেন। বসন্তবাবু, প্যারীবাবু, বিহু, ধীরেনবাবু প্রভৃতি তাঁর কথিত বিষয় গুলি নোট কোরে লিখে রাখতেন—।

'স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ', প্রভৃতি বহু প্রকার বহু বই লিখিয়েছেন।

স্ব চক্ষে দেখেছি, মহিম মহারাজের মূর্ত্তি কখন সাম্য কখন উগ্র ভাব। সে সময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে বা দেখতে ভয় কোরত—। আবার কখন কখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত সরল স্বভাব ও মধুর কথা ও হাসি। যা দেখেছি তা আর কি বলব, বর্ণনাতীত। তাঁর হাসিটীর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। অনেকের হাসি দেখেছি কিন্তু তাঁর হাসির সঙ্গে আর কারও মিল দেখতে পেলুম না।

যদিও স্বামীজিকে স্বচক্ষে দেখিনি তথাপি মহিম মহারাজকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন স্বামীজির মতন হাবভাব, চলন, কথা, ভঙ্গী সমস্তই স্বামীজির ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

কলকাতায় কখন কালী তলায়, কখন হেহুয়ায় একটা গাছের

তলায় বোসে, মহিম মহারাজ প্রায়ই চুপ কোরে কি গভীর চিন্তা ও ধ্যান জপ করতেন। আবার কখন কখন বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের কাছে একটা দোকানের রোয়াকে বোসে চুপ কোরে গভীর চিন্তা বা জপ করতে দেখেছি। সে সময়ে কোন কথা বল্‌তেন না। আমায় ইসারা কোরে ডাকতেন, তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তাঁর মুখে শুনতুম, কখন কখন 'হে হর শঙ্কর হে হর শঙ্কর—বোলে উঠতেন। এই কয়েকটা যা তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেখেছি এ ছাড়াও বোধকরি, ভক্তগণ আরও বেশী জানেন ও দেখেছেন। এখন তাঁর এত উচ্চ অবস্থা (সাধন বিষয়) তা বলা যায় না, 'যাঁর মহিমা অপার গুণ গাঁও হাজার'—।

দশ বছর সঙ্গ ছাড়া

ইংরাজী ১৯১৭ বাংলা ১৩২৬ সাল হতে শ্রীম, মহিম-মহারাজ ও বাগবাজার, উদ্বোধন, বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণের কাছে যাতায়াত সুরু করতে থাকি। তারপর ইং 21—12—1919—মহিম মহারাজ বোল্লেন যে, 'বৃন্দাবন সেবাশ্রমে গিয়ে কাজ করগে যা'। স্বামীজির শিষ্য নাতু মহারাজ তাঁর সঙ্গে প্রথমে কাশির আশ্রমে এসে ২।৩ দিন থেকে 25—12—1919 বৃন্দাবন ধাম সেবাশ্রমে এলুম। সেখানে তখন বুড়বাবা (স্বামী শ্রীধরানন্দ) ছিলেন। সেবাশ্রমের সমস্ত কাজ করতে হতো। পূজা, ভাড়ারের কাজ, রুগীদের সেবাদি। ইংরাজি 1920 April মাসে পাটনায় যাই।

ইংরাজী 1922 হ'তে 1924 পাটনায় Govt. Printing Press এ কাজ কোরি। পাটনায় আশ্রমে যাতায়াত কোরে বেশ কাটান যেত—।

কলকাতায় এসে ইংরাজী 1925 হতে 1927 পর্য্যন্ত E. B. Ry. T. T. C. থেকে T. T. I. কাজে সমস্ত লাইনে কাজ কোরি। 1928 সালে গানের স্কুল ও Tuition. 1929 এ পাটনা যাওয়া—।

একদিন—মহিম মহারাজ বল্লেন, 'মিলিটারীতে কাজ করগে যা'। 19—1—1942 এ Military তে Havildar clerk এ ভর্ত্তি হয়ে 1—9—1942 Persia-Iraq (পার্শীয়া-ইরাক্ অর্থাৎ মেসোপোটেমিয়া) যাবার জন্য রওনা হয়ে Bombay এসে 6—9—1942 তে 'ELHIND' নামক জাহাজে রওনা হই। সেখানে 15—9—1942 তে পৌঁছাই—।

ইংরাজী 13—1—1946 এ Military হ'তে কলকাতায় এসে 22—4—1946 সিলেট এ একটী কাজ নিয়ে যাই। সেখান হতে 1—9—1946 এ কলকাতায় এসে, কাজ না পাওয়ার দরুণ অনাটন হ'তে থাকে। মহিম মহারাজ কাজের জন্য ভক্তগণকে বলতে থাকেন, শেষে মানস বাবু ভবানিপুরে শ্রীযুক্তবাবু শুধাংসু কুমার মিত্র জমিদার, (৩৪।১, এল্গিন রোড, ভবানীপুর)। তাঁকে বোলে কাজ কোরে দেন। কলকাতায় যখনি ছুটিতে আসতুম বা থাকতুম তাঁদের সঙ্গ করতুম এই ছিল একটা নেশা বা শান্তি পাবার ঝোঁক—।

সমাপ্ত।